বৈষ্ণবের আখড়া

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অজয়ের কূল ধরিয়া পশ্চিমে জয়দেব কেঁদুলী হইতে গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত অঞ্চলটি অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। আকাশের চাঁদকে লজ্জা দিয়া নবদ্বীপে শচীমায়ের কোলে গৌরতনু শিশুর আবির্ভাব যেদিন হয়—সেদিনও মানুষ বুঝিতে পারে নাই শিশুর পদরেখা ধরিয়া নতুনভাব ভাগীরথী উদ্ভুত হইয়া গোটা দেশটা ভাসাইয়া দিবে। কিন্তু অজয়ের কুলের এই অঞ্চলের সাধক কবি তাহার বহুকাল পূর্বে ধ্যান কল্পনায় এ প্লাবন যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—দেখিয়াছিলেন মাটিতে চাঁদ নামিয়া আসিল—জ্যোৎস্নার পৃথিবী সত্য সত্যই ভাসিয়া গেল। নানুরের সাধক কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন—'আজ কে গো মুরলী বাজায়—এত কভু নহে শ্যামরায়।' শুধু তাই নয় বৈষ্ণবভাবের নব অভ্যুত্থানের পর এখানে মহাজন ভক্ত দলে দলে যেন মিছিল করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। অজয়ের দশ কোশের মধ্যে ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর উত্তরে একচক্রা মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান। কাছাকাছি বীরচন্দ্রপুরকে লোকে বলে গুপ্ত বৃন্দাবন; এ অঞ্চলে প্রতি পাঁচখানি গ্রামে একটি করিয়া বৈষ্ণবের আখড়া। মাটির দেওয়াল, খড়ের চালে ছাওয়ানো আখড়া; যদুপতির পাথরে গড়া বিরাট রাজপ্রাসাদ নয়—যে, কাল ভাঙিয়া দিলে আর গড়া যায় না। সে ভাবে ভাঙা পাথরের স্তূপই সরানো অসম্ভব হইয়া উঠে। মাটির আখড়া কাল ভাঙে—জলে গলিয়া পড়ে, ইঁদুরে গোড়ায় গর্ত কাটিয়া তলাটা ফোঁপরা করিয়া দেয় তখন একদিন ধ্বসিয়া পড়ে, ভূমিকম্পে ফাটে—ভাঙে, মানুষ ওই ভাঙা দেওয়ালেই জল ঢালিয়া কাদা করিয়া আবার দেওয়াল দেয়, লোকের কাছে ভিক্ষা করিয়া খড় বাঁশ মাথায় করিয়া আনে, দেওয়ালের উপর চাল তুলিয়া সযত্নে নিজের হাতে রাঙা মাটি দিয়া নিকাইয়া আল্পনা আঁকিয়া মনোমন্দিরের অধীশ্বরকে হাতজোড় করিয়া বলে—আমার মনোমন্দিরে অধিষ্ঠিত হও। (স্বর্গমর্ত্য)

এ দেশের মধ্যে অজয় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটুকুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে! পশ্চিমে জয়দেব কেঁদুলী হইতে কাটোয়ার অজয় ও গঙ্গার সঙ্গম-স্থল পর্যন্ত কানু বিনে গীত নাই। অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। এমনকি যেদিন শান্তিপুর ডুবুডুবু হইয়াছিল নবদ্বীপ ভাসিয়া গিয়াছিল, সেদিনের ও অনেককাল পূর্ব হইতেই এ অঞ্চলটিতে মানুষেরা 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে' যে বাঁশি বাজে

তাহার ধ্বনি শুনিয়াছে। এ অঞ্চলে সুন্দরীরা নয়ন-ফাঁদে শ্যাম শুকপাখী ধরিয়া হৃদয় পিঞ্জরে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে তখন হইতেই জানিত। এ অঞ্চলের অতি সাধারণ মানুষেও জানিত, সুখদুখ দুটি ভাই, সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি, দুখ যায় তারই ঠাঁই।

লোকে কপালে তিলক কাটিত, গলায় তুলসীকাঠের মালা ধারণ করিত; আজও সে তিলক-মালা তাহাদের আছে। পুরুষেরা শিখা রাখিত, আজও রাখে; মেয়েরা চূড়া করিয়া চুল বাঁধিত। এখন নানা ধরনের খোঁপা বাঁধার রেওয়াজ হইয়াছে, কিন্তু স্নানের পর এখনও মেয়েরা দিনান্তে একবারও অন্তত চূড়া করিয়া চুল বাঁধে। আজও রাত্রে বাঁশের বাঁশির সুর শুনিলে এ অঞ্চলের এক সন্তানের জননী যাহারা, তাহারা আর জলগ্রহণ করে না। পুত্র-বিরহ বিধুরা যশোদার কথা তাহাদের মনে পড়িয়া যায়। হলুদমণি পাখি —বাংলাদেশের অন্যত্র তাহারা 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলিয়া ডাকে, এখানে তাহারা সে ডাক ভুলিয়া যায়—'কৃষ্ণ কোথাগো' বলিয়া ডাকে।

অধিকাংশই চাষীর গ্রাম। দশ বিশখানা গ্রামের পরে দুই একখানা ব্রাহ্মণ এবং ভদ্র সম্প্রদায়ের গ্রাম পাওয়া যায়। চাষীর গ্রামে সদ্‌গোপেরাই প্রধান, নবশাখার অন্যান্য জাতিও আছে। সকলেই মালা-তিলক ধারণ করে, হাতজোড় করিয়া কথা বলে, 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করে। ভিখারীরা 'রাধে কৃষ্ণ' বলিয়া দুয়ারে দাঁড়ায়, বৈষ্ণবরা খোল করতাল লইয়া আসে; বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা একতারা-খঞ্জনী লইয়া গান গায়; বাউলেরা একা আসে একতারা বাজাইয়া। মুসলমান ফকিরেরা পর্যন্ত বেহালা লইয়া গান গায়— পুত্র শোকাতুরা যশোদার খেদের গান। সন্ধ্যায় বৈষ্ণব আখড়ায় পদাবলী গান হয়। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সংকীর্তন হয়, ঘরের খড়ো বারান্দায় ঝুলানো এদেশী শালিক পাখি 'রাধাকৃষ্ণ' কৃষ্ণ রাধা গো-পী ভজ বলিয়া ডাকে। লোকে সখ করিয়া মালতী মাধবী ফুলের চারা লাগায়।

প্রতি পুকুরের পাড়েই কদমগাছ আছে। কদমগাছ নাকি লাগাইতে হয়। বর্ষায় কদমগাছগুলি ফুলে ভরিয়া উঠে, সেই দিকে চাহিয়া প্রবীনেরা অকারণে কাঁদে। (রাইকমল)

ঐ দুটো অংশ তারাশংকরের দুটি সতন্ত্র বৈষ্ণব-রচনা থেকে উদ্ধৃত করেছি—স্থান কাল ও পরিবেশ সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা করে দেবার জন্যে।

রাঢ়ের ওই পটভূমিকায় রচিত তারাশংকরের বৈষ্ণব-কাহিনী-গুলি একত্রিত করে এই রচনা সম্ভার। এগুলি স্বপ্নলোকের

কাহিনী নয়। বৈষ্ণব সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র রাঢ় দেশের সাধারণ মানুষের—তারা নিম্নবর্ণের মানুষ হলেও তাদের গার্হস্থ্য জীবন-যাত্রা সামাজিক অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত; তাদের সুখ-দুঃখের জীবন গাথার সংকলন। এগুলির মধ্যে একদিকে রয়েছে নরনারীর রাধাকৃষ্ণ প্রেমের সুর সঙ্গীত—তাদের রসমাধুরীতে ভরপুর, অন্তর্লোকের আনন্দবেদনার বীনাসুর ঝংকার, অন্যদিকে রয়েছে বৈষ্ণবীর বাৎসল্য লীলার লৌকিক আস্বাদন, গোপালের জন্যে মা যশোদার অন্তঃস্থলের আনন্দ-বিলাপ। স্বর্গমর্ত্য উপন্যাসখানি শেষোক্ত শ্রেণীর।

এর সঙ্গে রইল কিছু গানের সংকলন। গানগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে একান্ত করে বৈষ্ণব আখড়ার ধুলোর ছোঁয়া—তাদের আঙ্গিনার মাটির গন্ধ। শোনা যাবে বাউলের একতারা হাতে রাস্তা ধরে গেয়ে চলেছে 'মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদম তলীতে,—পথের মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে—কোন মহাজন পারে বলিতে।'

গানগুলির বেশীর ভাগই রেকর্ডে গীত—কখনও বা ছায়া-ছবির মাধ্যমে—কখনও বা শুধু রেকর্ডে।

এই সংকলন বৈষ্ণবদের জীবন চর্য্যা—তাই এর নাম দিলাম—বৈষ্ণবের আখড়া—

বৈষ্ণবের আখড়া

রাই-কমল

পশ্চিম বাংলার রাঢ় দেশ ।

এ দেশের মধ্যে অজয় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটুকুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পশ্চিমে জয়দেব-কেন্দুলী হইতে কাটোয়ার অজয় ও গঙ্গার সঙ্গম-স্থল পর্যন্ত 'কানু বিনে গীত নাই'। অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। এমনকি যেদিন 'শান্তিপুর ডুবুডুবু' হইয়াছিল, নবদ্বীপ ভাসিয়া গিয়াছিল, সেদিনেরও অনেককাল পূর্ব হইতেই এ অঞ্চলটিতে মানুষেরা "ধীর সমীরে যমুনাতীরে" যে বাঁশি বাজে, তাহার ধ্বনি শুনিয়াছে। এ অঞ্চলে সুন্দরীরা নয়ন-ফাঁদে শ্যাম শুকপাখি ধরিয়া হৃদয়-পিঞ্জরে প্রেমের শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে তখন হইতেই জানিত। এ অঞ্চলের অতি সাধারণ মানুষেও জানিত, 'সুখ দুখ দুটি ভাই, সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি, দুখ যায় তারই ঠাঁই'।

লোকে কপালে তিলক কাটিত, গলায় তুলসীকাঠের মালা ধারণ করিত ; আজও সে তিলক-মালা তাহাদের আছে। পুরুষেরা শিখা রাখিত, আজও রাখে ; মেয়েরা চূড়া করিয়া চুল বাঁধিত। এখন নানা ধরনের খোঁপা বাঁধার রেওয়াজ হইয়াছে, কিন্তু স্নানের পর এখনও মেয়েরা দিনান্তে একবারও অন্তত চূড়া করিয়া চুল বাঁধে। আজও রাত্রে বাঁশের বাঁশির সুর শুনিলে এ অঞ্চলের এক সন্তানের জননী যাহারা, তাহারা আর জলগ্রহণ করে না। পুত্রবিরহবিধুরা যশোদার কথা তাহাদের মনে পড়িয়া যায়। হলুদমণি পাখি—বাংলা দেশের অন্যত্র তাহারা 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলিয়া ডাকে, এখানে আসিয়া তাহারা সে ডাক ভুলিয়া যায়—'কৃষ্ণ কোথা গো' বলিয়া ডাকে।

অধিকাংশই চাষীর গ্রাম। দশ-বিশখানা গ্রামের পরে দুই-একখানা ব্রাহ্মণ এবং ভদ্র সম্প্রদায়ের গ্রাম পাওয়া যায়। চাষীর গ্রামে সদ্‌গোপেরাই প্রধান, নবশাখার অন্যান্য জাতিও আছে। সকলেই

মালা-তিলক ধারণ করে, হাতজোড় করিয়া কথা বলে, 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করে। ভিখারীরা 'রাধে-কৃষ্ণ' বলিয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়; বৈষ্ণবেরা খোল-করতাল লইয়া আসে; বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা একতারা-খঞ্জনী লইয়া গান গায়; বাউলেরা একা আসে একতারা বাজাইয়া। মুসলমান ফকিরেরা পর্যন্ত বেহালা লইয়া গান গায়—পুত্রশোকাতুরা যশোদায় খেদের গান। সন্ধ্যায় বৈষ্ণব-আখড়ায় পদাবলী গান হয়, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সংকীর্তন হয়, ঘরের খ'ড়ো বারান্দায় ঝুলানো এদেশী শালিক পাখি 'রা-ধা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ রা-ধা, গো-পী ভজ' বলিয়া ডাকে। লোকে শখ করিয়া মালতী মাধবী ফুলের চারা লাগায়। প্রতি পুকুরের পাড়েই কদমগাছ আছে। কদমগাছ নাকি লাগাইতে হয়। বর্ষায় কদমগাছগুলি ফুলে ভরিয়া উঠে, সেই দিকে চাহিয়া প্রবীণেরা অকারণে কাঁদে।

সে কাল আর নাই। কালের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মাঠের বুক চিরিয়া রেললাইন পড়িয়াছে। তাহার পাশে পাশে টেলিগ্রাফের তারের খুঁটির সারি। বিদ্যুৎ-শক্তিবহ তারের লাইন। মেঠো পথ পাকা হইয়াছে। তাহার উপর দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে মোটর বাস ছুটিতেছে। নদী বাঁধিয়া খাল কাটা হইয়াছে। লোকে হুঁকা ছাড়িয়া বিড়ি-সিগারেট ধরিয়াছে। কাঁধে গামছা, পরনে খাটো কাপড়ের বদলে বড় বড় গ্রামের ছোকরারা জামা, লম্বা কাপড় পরিয়া সভ্য হইয়াছে। ছ-আনা দশ-আনা ফ্যাশনে চুল ছাঁটিয়াছে। নতুন কালের পাঠশালা হইয়াছে। ভদ্রগৃহস্থঘরের হালচাল বদলাইয়াছে, গোলার ধান ফুরাইয়াছে, গোয়ালের গাই কমিয়াছে, তবুও একশ্রেণীর মানুষ এই ধারাটি ভুলিয়া যায় নাই; 'হরি বলতে যাদের নয়ন ঝরে'—তাদের দুই ভাইকে স্মরণ করিয়া তাহারা আজও কাঁদে। 'সুখ দুখ দুটি ভাই'—এই তত্ত্বটি তাহাদের কাছে আজও অতি সহজ কথা। 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে'—আজও সেখানে বাঁশি বাজে।

এই অঞ্চলে চাষীদের ছোট একখানি গ্রাম। মাটির ঘর, মেটে পথ, পথের দুই ধারে পতিত জায়গায় ভাঁটিফুল ফোটে, কস্তুরীফুল

ফোটে, নয়নতারা অর্থাৎ লাল সাদা ফুল চাপ বাঁধিয়া ফুটিয়া থাকে, অজস্র 'বাবুরি' অর্থাৎ বনতুলসী গাছের জঙ্গল হইতে তুলসীর গন্ধ উঠে। ছোট ছোট ডোবায় মেয়েরা বাসন মাজে, কাপড় কাচে; পাড়ের উপরে বাঁশবনে সকরুণ শব্দ উঠে; কদম, শিরীষ, বকুল, অর্জুন, আম, জাম, কাঁঠাল-বনের ঘনপল্লবের মধ্যে বসিয়া পাখি ডাকে! কোকিল, পাপিয়া, বেনে বউ, বউ কথা কও, ঘুঘু, ফিঙে আরও কত পাখি, কাকেরা বাড়ির উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায়। শড়ক শালিকে পথের ধূলায় ঘরের চালে কিচিমিচি কলরবে ঝগড়া করে। ঘরে চালের কিনারায় ঝুলাইয়া-দেওয়া ঝুড়িতে হাঁড়িতে পায়রারা বকবকম গুঞ্জন তোলে; সুখের ঘরেই নাকি পায়রার বাস—তাই সুখের আশায় মানুষেরা নিজেরাই বাসা বাঁধিয়া দেয়। চাষীরা মাঠে যায়। মেয়েরা ঘরের পাশে শাকের ক্ষেতে জল দেয়, লাউ-কুমড়া-লতার পরিচর্যা করে। ধান শুকায়, ধান তোলে, সিদ্ধ করে, ঢেঁকিতে ভানে। ছেলেরা সকালে কেউ পাঠশালায় যায়, কেউ যায় না, গোরুর সেবা করে। গ্রামখানির উত্তর প্রান্তের ছোট্ট একটি বৈষ্ণবের আখড়া কাহিনীটির কেন্দ্রস্থল। সুনিবিড় ছায়াঘন কুঞ্জভবনের মত আখড়াটির নাম ছিল —হরিদাসের কুঞ্জ। হরিদাস মহান্ত ছিল আখড়াটির প্রতিষ্ঠাতা। আখড়াটির চারিদিক রাঙ-চিতার বেড়া দিয়া ঘেরা। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে আম, জাম, পেয়ারা, নিম, সজিনা গাছের ঘনপল্লবের প্রসন্ন ছায়া আখড়াটির সর্বাঙ্গ জড়াইয়া আছে নিবিড় মমতার মত। পিছনের দিকে কয়-ঝাড় বাঁশ যেন দুলিয়া দুলিয়া আকাশের সঙ্গে কথা কয়। এই আবেষ্টনীর মধ্যে দুই পাশে দুইখানি মেটে ঘর আর তাহারই কোলে রাঙা মাটি দিয়া নিকানো ছোট্ট একটি আঙিনা—সর্বদা সুপরিচ্ছন্ন মার্জনায় তকতক করে। লোকে বলে সিঁদুর পড়িলেও তোলা যায়। ঠিক মাঝ-আঙিনায় একটি চারাগাছে জড়াজড়ি করিয়া উঠিয়াছে দুইটি ফুলের লতা—একটি মালতী, অপরটি মাধবী। শক্ত বাঁশের মাচার উপরে লতা দুইটি লতাইয়া বেড়ায় আর পালাপালি করিয়া ফুল ফোটায় প্রায় গোটা বছর। লতা-বিতানটির নিবিড়

পল্লবদলের মধ্যে অসংখ্য মধুকুলকুলির বাসা। ছোট ছোট পাখিগুলি ফুলে ফুলে মধু খায় আর কলরব করে উদয়কাল হইতে অস্তকাল পর্যন্ত।

আখড়ায় থাকে মা ও মেয়ে—কামিনী ও কমলিনী। পল্লী-বাসীরা দেশের ভাষা অনুযায়ী বলে 'মা-বিটীরা'। বৈষ্ণবের সংসার, চলে ভিক্ষায়। কামিনী খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া আনে। কিশোরী মেয়ে কমলিনী ঘরে থাকে, গৃহকর্ম করে, পাড়ার সঙ্গিনীদের সঙ্গে খেলা করে, গুনগুন করিয়া গান গায়। গান শেখা এখনও তাহার শেষ হয় নাই। তবে গানের দিকে মেয়েটির একটি সহজ দখল ছিল। তাহার বাপ হরিদাস মহান্ত ছিল এ অঞ্চলে একজন প্রতিষ্ঠাবান গায়ক। কমলিনীর মা কামিনীর শিক্ষাও তাহারই কাছে।

কামিনীর গলা ছিল বড় মিঠা। হরিদাস ওই মিঠা গলার জন্যই শখ করিয়া তাহাকে গান শিখাইয়াছিল। কামিনী সলজ্জভাবে আপত্তি করিলে সে বলিয়াছিল, জান, এসব হল গোবিন্দের দান, এই রূপ এই কণ্ঠ—এর অপব্যবহার করতে নাই। এতে তাঁরই পুজো করতে হয়। এই গলা তিনি তোমাকে দিয়েছেন এতে তাঁর নাম-গান হবে বলে।

তারপর আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিল, আরও শিখে রাখ কামিনী, আমার সম্পত্তির মধ্যে তো এইটুকু, ভালমন্দ কিছু হলে এ ভাঙিয়ে তুমি খেতে পারবে।

কথাটা যে অতি বড় নিষ্ঠুর সত্য, সেদিন তাহা কেহ ভাবে নাই। কিন্তু ভবিতব্যের চক্রান্তে পরিহাস সত্য হইল। ছোট মেয়েটিকে কোলে লইয়া কামিনী অনাথ হইল। আখড়াধারী বৈষ্ণবদের পত্যন্তর গ্রহণের প্রথা আছে,—কিন্তু কামিনী তাহা করিল না। হরি বলিয়া দিন যাপনের সংকল্প করিল। হরিদাস অকালে অল্পবয়সে দেহ রাখে। মরণকে উহারা মরণ বলে না, বলে দেহ রাখা। সত্যই আজ কামিনীর ওই গানই সম্বল।

মা-বাপের উভয়ের এই গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে কমলিনীর ছিল। সঙ্গীতে সে যেন একটি স্বচ্ছন্দ অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত ; এবং সে প্রতিষ্ঠা জন্মগত। একবার শুনিলেই গানের সুরখানি সে আপন কণ্ঠে বসাইয়া লইত। মায়ের নিকট পাইয়াছিল সে সুস্বর—তরুণ কণ্ঠটি ছিল তাহার সরল বাঁশের বাঁশির মত সুডৌল, মধুক্ষরা এবং বাপের কাছ হইতে পাইয়াছিল সুর-জ্ঞান ও ছন্দে তালে অধিকার।

গৃহকর্মের মধ্যে সে শাকসব্জি ও মালতী-মাধবীর জোড়ালতার চারাটিতে জল দেয়। রাঙা মাটি দিয়া ঘর-দুয়ার ও আঙিনাটি পরিপাটি মার্জনা করে আর হাসিয়া সারা হয়। চঞ্চলা মেয়েটির মুখে হাসি লাগিয়াই আছে।

ভাগ্যগুণে হরির কৃপায় একটি সহায়ও তাহাদের মিলিয়া গিয়াছে। কোথা হইতে বুড়া বাউল রসিকদাস একতারা হাতে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে এই গ্রামে আসিয়া কামিনীদের আখড়ার পাশেই আখড়া বাঁধিল। কমলিনীর বয়স তখন ছয় কি সাত। কমলিনীই তাহাকে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া নিজেদের আখড়ায় লইয়া আসিয়াছিল। বুড়ার সঙ্গে তাদের দেখা হইয়াছিল পথে। বুড়া বাউল গ্রামে ঢুকিয়া গান করিয়াছিল—

মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলিতে
কোন মহাজন পারে বলিতে ?
আমি পথের মাঝে পথ হারালেম ব্রজে চলিতে।
ওগো ললিতে।
হায় পোড়ামন—
ভুল করিলি চোখ তুলিলি পথের ধুলা থেকে
রাই যে আমার রাঙা পায়ের ছাপ গিয়েছে এঁকে।
আলোর ছটা চোখ ধাঁধালো চন্দ্রাবলীর কুঞ্জগলিতে।

গ্রামের মাতব্বর মণ্ডল চাষী মহেশ্বর নিজের দাওয়ায় হুঁকা টানিতেছিল আর ঢেঁড়ায় শনের দড়ি পাকাইতেছিল। বুড়া বাউলের মিঠা কণ্ঠস্বরের গান শুনিয়া সেই ডাকিয়া বলিল, বলিহারি বলিহারি!

ও বাবাজী! এ যে খাসা গান। বস বস। তামাক ইচ্ছে কর।

বাউল দাওয়ায় চাপিয়া বসিয়া বলিল, ও ক্ষ্যাপা ভাত খাবি? না—পাত পাড়লাম, পাতা সঙ্গেই আছে। বলিয়া সে হুঁকা বাহির করিল। হাসিয়া বলিল, দেন তা হলে। পরানটা তামাক-তামাক করচে।

কল্কে লইয়া বেশ কয়েক টান টানিয়া বলিল, চমৎকার দেশ আপনাদের বাবা। অজয়ের তীর!

মহেশ বলিল, হ্যাঁ, মাটি ভাল। অজয়ের পলিতে সোনা ফলে। বুয়েচ না বাবাজী, আলু যা হয়, সে তোমার ওল বললে ভুল হবে না। ইয়া বড়।

বাউল বলিল, তা হ্যাঁ বাবা, অজয়ের জলের শব্দে রাত বিরেতে এখনও শোনা যায়? বাঁশি! বাঁশির সুর!

মহেশ বলিল, বাঁশি? ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া বলিল, মহতের কথা মহতে বোঝে। মেঘের ডাকে ময়ূর নাচে, গেরস্ত তাকায় ফুটো চালের পানে। বাবুরা সর্ষেফুল দেখে মূর্ছা যায়, আমাদের ক্ষেত্তে সর্ষেফুল দেখে সাত মণ তেলের কথা ভাবি—চোখের সামনে রাধা নাচে। ও বোবার গায়েন কালায় বোঝে, ঢেঁকির নাচন ঘোড়ায় বোঝে; বাঁশি শুনে রাই উদাসী, জটিলে-কুটিলের হৃদকম্প। বুয়েচ বাবা—লোকে বলে বাজত—কেউ বলে আজও বাজে, তা আমি শুনি নি। বাবা, আমি শুনি বর্ষায় অজয়ের জল ডাকে—খাবং খাবং খাবং, জমি খাব, ঘর খাব, গেরাম খাব। আমি তখন বলি—থামং থামং থামং। শীতের সময় দরজা-জানালা বন্ধ করে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে এক ঘুমে রাত কাবার; দিনে ধান কাটি ধান পিটি—ধুপধাপ শব্দে; অজয়ের কথা মনেই থাকে না।

শুনিয়া বাউল হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, বলিহারি বলিহারি। মোড়ল মশায়, আপনার রসের ভাণ্ডার অক্ষয় হোক। আপনি আনন্দময় পুরুষ গো!,

মহেশ মণ্ডল খুশী হইয়া আর একবার তামাক সাজিয়া খাইয়াছিল.

খাওয়াইয়াছিল। এবং এবার সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, বাবাজীর নাম কি ?

বাউলও ওই সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়াছিল, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন—রসময় অনেক দূর, পঙ্করসে ডুবে রইলাম, বাপ-মা নাম দিয়েছেন রসিকদাস।

ঘর কোথা গো ? যাবে কোথা ?

ঘরের ঠিকানা বাউলের নাই বাবা, পথেই ঘুরছি ; যাব ব্রজে তা পথের মাঝে পথ হারিয়েছি।

ঠিক এই সময়েই ওই কমলিনীর সঙ্গে দেখা। মহেশ মোড়লের ছেলে রঞ্জনদের সঙ্গে খেলা সারিয়া সে তখন ঘরে ফিরিতেছিল। কচি মুখে রসকলি ও খাটো চুলে বাঁধা চূড়া ঝুঁটি দেখিয়া বাউল বলিয়াছিল, এ যে দেখি খাসা বোষ্টুমী ! কি নাম গো তোমার ?

কমলিনী বলিয়াছিল, আমি কমল।

বাউল বলিয়াছিল, শুধু কমল ন্যাড়া শোনায়, তুমি রাই-কমল।

মহেশ মোড়ল একটু কৃপণ মানুষ, বেলা দুপহর হইয়া আসিয়াছে, বাউলকে সে নিজে ডাকিয়া বসাইয়াছে; এখন যাইতে দেওয়ার হাঙ্গামাটা অনায়াসে ওই ছোট মেয়েটার ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে কোন প্রতিবাদ হইবে না বুঝিয়া বলিয়া দিল, নিয়ে যা। কমলি, বাবাজীকে তোদের আখড়ায় নিয়ে যা। বেলা হয়েছে। আমাদের আমিষের হেন্‌সেল। তোদের ঘরে নিয়ে যা।

কমল হাত ধরিয়া বলিয়াছিল, এস বাবাজী।

সেই অবধি বুড়া এইখানেই থাকিয়া গিয়াছে। মা-বিটীদের আখড়ার পাশে আর-একটা আখড়া বাঁধিয়াছে। গ্রামের ছেলে-ছোকরাদের তামাক খাইবার আড্ডা। বুড়াদের বড় তামাকের মজলিস। ভাবুকদের কীর্তনের আসর। কামিনী-কমলিনীর ভরসাস্থল।

আধবুড়া বাউল রসিকদাস কমলিনীকে গান শিখাইতে আসে। সে ডাকে – রাই-কমল !

কমলিনী অমনই হাসিয়া সারা, বলে, কি গো বগ-বাবাজী ?

বাউল রসিকদাসের শরীরের গঠনভঙ্গী কেমন অতিরিক্ত লম্বা রকমের। বকের মত লম্বা গলা, অমনই লম্বা হাত-পা। ছোট কমল বড় হইয়া মুখরা হইয়াছে! ওই বাউলই তাহাকে মুখরা করিয়া তুলিয়াছে। সে এখন বাউলেরই নামকরণ করিয়াছে বগ-বাবাজী!

কমলিনীর তাহাকে দেখিলেই হাসি পায়। সে তাহার নাম দিয়াছে—বগ-বাবাজী। রসিকদাস রাগ করে না, সে হাসে।

কমলিনী বলে; মরে যাই বগ-বাবাজীর শখ দেখে। দাড়িতে আবার বিনুনি পাকানো হয়েছে! পাকা চুলে মাথায় আবার রাখাল-চুড়ো। ওখানে একটি কাকের পাখা গোঁজ, ওগো ও বগ-বাবাজী!

বলিয়া আবার সে হাসে।

মা কামিনী রুষ্ট হইয়া উঠে—সে রূঢ় ভাষায় তিরস্কার করে, মর মর মুখপুড়ী, চোদ্দ বছরের ধাড়ী—

রসিক হাসিয়া বাধা দিয়া বলে, না না, বোকো না। ও আনন্দময়ী —রাই-কমল।

সায় পাইয়া কমলিনী জোর দিয়া বলে, বল তো বগ-বাবাজী ?

বলিয়াই মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে এলাইয়া পড়ে।

ঝাঁট দিতে দিতে ঝাঁটাগাছটা উঁচাইয়া মা বলে, ফের! দেখবি ?

বাহিরে বেড়ার ওপাশে পথের উপর হইতে মহেশ মোড়লের ছেলে রঞ্জন ডাকে, কমলি! অমনই কমলি পলায়নের ভান করিয়া ছুটিতে শুরু করে। বলে, মার, তোর নিজের মুখে মার। থাকল তোর গান শেখা, চলল্লাম আমি কুল খেতে।

রাগে গরগর করিতে করিতে মা বলে, বেরো—একেবারে বেরো।

মেয়ে মায়ের তিরস্কার আমলেই আনে না, চলিয়া যায়। মা পিছন পিছন বাহির-দরজা পর্যন্ত আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলে, কমলি, ফিরে আয় বলছি—ফিরে আয়। এত বড় মেয়ে, লোকে বলবে কি—সে জ্ঞান করিস ? বলি, ওগো ও কুলখাগী কমলি!

রসিকদাস হাসে। তাহার হাসি দেখিয়া কামিনীর অঙ্গ জ্বলিয়া

যায়। সে ঝঙ্কার দিয়া বলে, কি যে হাস মহান্ত? তোমার হাসি আসছে তো!

রসিকদাস কোন উত্তর করে না। সে আপন মনে লম্বা দাড়িতে বিনুনি পাকায়। কামিনীও গৃহমার্জনা করিতে করিতে কন্যাকেই তিরস্কার করে। গান শিখাইবার লোকের অভাবে রসিকদাস আপনার আখড়ার পথ ধরে। পথে নিজেই গুনগুন করিয়া গান ধরিয়া দেয়—

ফুটল রাই-কমলিনী বসল কৃষ্ণভ্রমর এসে।
লোকে বলে নানা কথা তাতে তার কি যায় আসে?
কুল তো কমল চায় না বৃন্দে মাঝজলেই সে হাসে ভাসে।

বাউল পথ চলে আর মাথা নাড়ে। এই কিশোর-কিশোরীর লীলার মধ্যে সে দেখে ব্রজের খেলা।

রঞ্জন—মহেশ্বর মোড়লের ছেলে। কমলিনীর চেয়ে সে বৎসর তিন-চারেকের বড়। কমলিনীর সে খেলাঘরের বর—সে তাহার কিল মারিবার গোঁসাই। ধর্মতলার প্রকাণ্ড বটগাছটার তলদেশে এই গ্রামের ছেলেদের পুরুষানুক্রমিক খেলাঘর। গাছটিকে বেষ্টন করিয়া ছোট ছোট খেলাঘরে শিশুকল্পনার গ্রাম এই বসতিসৃষ্টির দিন হইতে নিত্যনিয়মিত গড়িয়া উঠিয়াছে। বটগাছের উঁচু উঁচু শিকড়গুলি হইত তাহাদের তক্তাপোশ। পথের ধুলা গায়ে স্বেচ্ছামত মাখিয়া বালক রঞ্জন আসিয়া সেই তক্তাপোশের উপর বসিয়া বিজ্ঞ চাষীর মত বলিত, বউ, ও বউ, একবার তামাক সাজ তো। আর খানিক বাতাস। আঃ, যে রোদ—আর চাষের যে খাটুনি!

কমলি তখন সাত-আট বছরের। সে প্রগলভা বধূর মত ঝঙ্কার দিয়া উঠিত, আ মরে যাই! গরজ দেখে অঙ্গ আমার জুড়িয়ে গেল! আমার বলে কত কাজ বাকি, সেসব ফেলে আমি এখন তামাক সাজি, বাতাস করি! নবাব নাকি তুমি? তামাক নিজে সেজে নিয়ে খাও।

রঞ্জন হুঙ্কার দিয়া উঠিত, এই দেখ—রোদে-পোড়া চাষা আর আগুন তপ্ত কাল এ দুইই সমান। বুঝে কথা বলিস কিন্তু নইলে দেবো তোর ধুমসো গতর ভেঙে।

অমনিই কমলি খেলা ছাড়িয়া রঞ্জনের কাছে রোষভরে আগাইয়া আসিত। তাহার নাকের কাছে পিঠ উঁচাইয়া দিয়া বলিত, কই, দে—দে দেখি একবার। ওঃ—গতর ভেঙে দেবেন, ও রে আমার কে রে!

খেলাঘরের প্রতিবেশীর দল কৌতুকে খিলখিল করিয়া হাসিত। দারুণ অপমানে রুষিয়া, রঞ্জন কমলির মোটা বিঁড়েখোঁপা ধরিয়া গদাগদ কিল বসাইয়া দিত। টান মারিয়া কমলির চুলের গোছা মুক্ত করিয়া লইত। কয়েকগাছা চুল রঞ্জনের হাতেই থাকিয়া যাইত। তারপর ক্ষিপ্তার মত সে রঞ্জনের চোখে মুখে ধূলা ছিটাইয়া দিয়া রোষ-রোদনে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিত, কেন, কেন, মারবি কেন তুই? আমাকে মারবার তুই কে?

ননদিনী কাদু প্রবীণার মত আসিয়া বলিত, এটি কিন্তু দাদা, তোমার ভারি অন্যায়।

ওপাড়ার ভোলা কমলির প্রতি দরদ দেখাইয়া বলিত, খেলতে এসে মারবি কেন রে রঞ্জন?

রঞ্জনের আর সহ্য হইত না। সে বলিত, নাঃ, মারবে না! পরিবারের মুখ-ঝামটা খেতে হবে সোয়ামী হয়ে?

কমলি ফুলিতে ফুলিতে গর্জিয়া উঠিত, ওরে আমার সোয়ামী রে! বলে যে সেই, ভাত দেওয়ার ভাতার না, কিল মারবার গোঁসাই। যা যা, আমি তোর বউ হব না। তোর সঙ্গে আড়ি—আড়ি—আড়ি।

এমনই করিয়া খেলা ভাঙিত। পরদিন প্রভাতে আবার সেখানে ছেলেদের কলরব জাগিয়া উঠিত। সেদিন প্রথমেই কমলির হাত ধরিত ভোলা। সে বলিত, আজ ভাই তোমাতে আমাতে, বেশ—

কমলি আড়চোখে তাকাইয়া দেখিত, ওপাশে রঞ্জন দাঁড়াইয়া আছে। মাঝের পাড়ার বৈষ্ণবদের মেয়ে পরী আগাইয়া আসিত। রঞ্জনের হাত ধরিয়া বলিত, তোতে আমাতে, বেশ ভাই রঞ্জন।

পরীও কমলির সমবয়সী; কিন্তু কমলির সহিত তাহার যেন একটা শত্রুতা আছে। পরীদের বাড়ি রঞ্জনদের বাড়ির পাশেই। রঞ্জনকে লইয়া কমলির সঙ্গে তাহার খুনসুটি লাগিয়াই আছে। রঞ্জন

বলিত, বেশ।

কমলি ভোলাকে বলিত, আমি ভাই বিধবা। একা খেলব।

দুই-তিন দিন পর একদিন পরীকে খেদাইয়া দিয়া রঞ্জন মাথা নাড়িয়া বলিত, বিয়েই আমি করব না।

ব্যঙ্গভরে ভোলা হাসিয়া বলিত, গোঁসাইঠাকুর গো!

ভোলার হাত ছাড়াইয়া কমলি অগ্রসর হইত। ভোলা বলিত, আবার মার খাবি কমলি?

কমলি বলিত, তা ভাই, মারে তো আর কি করব বল? বর যখন ওকে একবার বলেছি, তখন ঘর ওর করতেই হবে। তা বলে তো দুবার বিয়ে হয় না মেয়েদের! অঁ্যা, না কি বল ভাই?—বলিয়া সে রঞ্জনের খেলাঘরে আসিয়া উঠিত। আসর জাঁকাইয়া বসিয়া সে ফরমাশ করিত পাকা গিন্নীটির মতই, আ আমার কপাল! নুন নাই, বলি তেল নাই, সেসব কি আমি রোজগার করে আনব?

রঞ্জন কথা কহিত না, উদাসভাবে বসিয়া থাকিত। কমলি হাসিয়া বলিত ভোলাকে, সত্যি ভোলা, মোড়ল আমাদের গোঁসাই হয়েছেন। তারপর ফিসফিস করিয়া রঞ্জনের কাছে বলিত, কোন্ গোঁসাই গো? আমাকে কিল মারবার গোঁসাই নাকি?—বলিয়াই খিলখিল হাসি।

রঞ্জনও অমনই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিত। খেলার মধ্যে সকলের অগোচরে রঞ্জন ফিসফিস করিয়া বলিত, আর মারব না বউ, কালীর দিব্যি। কমলি আবার হাসিত।

এসব পুরানো কথা। কিন্তু সে কথা মনে করিয়া এখনও কমলি হাসে। রঞ্জন একটু যেন লজ্জা পায়, পাইবারই কথা। রঞ্জন আজ তরুণ কিশোর। তাহার চোখের কোণে আজ শীতান্তের নবকিশলয়ের মত ঈষৎ রক্তিমাভা দেখা দিয়াছে। সরল কোমল দেহে পেশীগুলি পরিপুষ্টরূপে প্রকট হইয়া দেখা দিতে শুরু করিয়াছে। আর সেই চপলা মুখরা কমলি আজ চৌদ্দ বছরের কমলিনী। আজও দেহে তার ফুল ফোটে নাই কিন্তু তাহার চঞ্চল চরণের ঈষৎ সঙ্কুচিত গতিতে,

রঙের চিক্কণতায়, নয়নের চটুল ভঙ্গিমায়, গালের ফিকা লালিমাভায় মুকুলের বার্তা ঘোষণা করিয়াছে। তবুও তাহার চাপল্যের অন্ত নাই। বয়সের ধর্ম তাহার স্বভাব-ধর্মের কাছে পরাজয় মানিয়াছে। এখন ঈষৎ চাপা চপল সে।

তাই কুলের ভয় দেখানো সত্ত্বেও সে রঞ্জনের সঙ্গে কুল খাইতে যায়, মায়ের ঝাঁটার ভয় উপেক্ষা করিয়াও রসিকদাসকে বলে 'বগ-বাবাজী'। সে চলিয়া যায়—চাপল্যে দেহে উঠে একটা হিল্লোল নদীর নৃত্যপরা স্রোতের মত। কথা বলিতে কথার আগে উপচিয়া পড়ে হাসি ঝরনাধারার ছলছল-ধ্বনির মত।

সেদিন রঞ্জন গাছে চড়িয়া কুল ঝরাইতেছিল,—তলায় ছুটিয়া ছুটিয়া কমলিনী সেগুলি কুড়াইয়া আঁচলে তুলিতেছিল। একটা কুলে কামড় মারিয়া কমলিনী বলিয়া উঠিল, আহা কি মিষ্টি রে!

গাছের উপর হইতে ঝপ করিয়া রঞ্জন ঝাঁপ দিয়া মাটিতে পড়িয়া বলিল, দে, দে ভাই, আমাকে আধখানা দে।

আধ-খাওয়া কুলটা কমলি তাড়াতাড়ি রঞ্জনের মুখে পুরিয়া দিল। কুলটায় পোকা ধরিয়াছিল। বিস্বাদে রঞ্জন টাকরায় টোকা মারিয়া বলিল, বাবাঃ।

কমলি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, কেমন রে?

রঞ্জন তখনও টোকা মারিতেছিল, তবু সে তা স্বীকার করিল না, বলিল, খুব মিষ্টি—তোর এঁটো যে।

হাততালি দিয়া কমলি হাসিতে হাসিতে বলিল, বোল হরিবোল! আমার এঁটো টকো কুল মিষ্টি হয়ে গেল। আমার মুখে চিনি আছে নাকি?

রঞ্জন বলিল, হুঁ, তুইই আমার চিনি।

কমলি কৌতুকে হাসিয়া এলাইয়া পড়িল। রঞ্জনের এই ধারার তোষামোদ তাহার ভারী ভাল লাগে। তারপর বলিল, তোর এঁটো আমার কেমন লাগে জানিস?

কেমন ?

ঝাল—ঠিক লঙ্কার মত। তুই আমার লঙ্কা।

বিষণ্ণভাবে রঞ্জন বলিল, যার যেমন ভালবাসা।

কমলি তাহার বিষণ্ণতা আমলেই আনিল না। কৌতুকভরে সে বাণের পর বাণ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছিল। বলিল, তা তো হল, কিন্তু তুই আমার এঁটো খেলি যে ? তোর যে জাত গেল।

চকিতভাবে এদিক ওদিক দেখিয়া লইয়া রঞ্জন বলিল, কেউ তো দেখে নাই। তারপর অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, গেল তো গেলই। ভেক নিয়ে আমি বোষ্টম হব। তোকে বিয়ে করব।

কমলি বলিয়া উঠিল, যাঃ, তোকে কে বিয়ে করবে ? আকাট চাষা!

রঞ্জন খপ করিয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল, আমাকে বিয়ে করিস তো আমি জাত দিই কমলি।

কমলি বলিল, দূর, ছাড়্।

রঞ্জন বলিল, বল—নইলে ছাড়ব না। কমলির হাতখানা সে আরও জোরে চাপিয়া ধরিল।

কাতরস্বরে কমলি বলিয়া উঠিল, উঃ—উঃ, ঘা—ঘা আছে। অপ্রস্তুত হইয়া রঞ্জন হাত ছাড়িয়া দিল। কমলির কলহাস্যে নির্জনতার স্বপ্নভঙ্গ হইল। সে ছুটিয়া পলায়ন করিতে করিতে বলিয়া গেল, চাষার বুদ্ধির ধার কেমন ? না, ভোঁতা লাঙলের ধার যেমন।

রঞ্জন অনুসরণ করিল না। সে পলায়নপরা কমলির গমনপথের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল—তাহাদের সাদা বলদটা কেমন করিয়া এখানে আসিল ?

পিছন হইতে ডাক আসিল—হ-হ-হ। তাহার বাপ মহেশ্বর মোড়লের গলা। রঞ্জন মুহূর্তে দৌড় দিল।

দুই

রঞ্জনের মা কমলিকে বড় ভালবাসিত। তাহার নাম দিয়াছিল —হাস্যময়ী। রঞ্জনকে দিতে গিয়া আধখানা মণ্ডা ভাঙিয়া সে কমলির হাতে দিত। কিন্তু সেদিন রঞ্জন যখন কমলির এঁটো কুল খাইয়া বাড়ি ফিরিল, তখন সে বলিল, রাক্ষুসী রাক্ষুসী, মায়াবিনী গো, ওরা ছত্রিশ জেতে বোষ্টম—ওদের কাজই এই। মুড়োঝাঁটা মারি আমি হারামজাদীর মুখে।

কুল-খাওয়ার ঘটনাটা দৈবক্রমে খোদ মহেশ্বর মোড়লের—রঞ্জনের বাপের নজরে পড়িয়াছিল। মহেশ্বরের বলদটা অকারণে ছুটিয়া আসে নাই। গরু চরাইতে গিয়াছিল সে ওই কুলগাছটার পাশেই একটা জঙ্গলের আড়ালে। হঠাৎ ব্যাপারটা দেখিয়া অকারণে সে বলদটার পিঠে সজোরে পাচন লাঠির এক ঘা বসাইয়া দিয়াছিল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে সে শিহরিয়া উঠিল। তার স্ত্রীর নিকটে সে সমস্ত প্রকাশ না করিয়া পারিল না। রঞ্জনের মা গালে হাত দিয়া বিষম বিস্ময়ে লম্বা টানা সুরে বলিয়া উঠিল, ওগো মা, কোথায় যাব গো, জাত মান তুই গেল যে! রাক্ষুসী হারামজাদী কি নচ্ছার গো, মুড়োঝাঁটা মার মুখে! আর সে হারামজাদা গেল কোথা? ধরে গোবর খাওয়াও তুমি।

মহেশ্বর বাধা দিয়া বলিল, চুপ চুপ, চেঁচিয়ে গাঁগোল করিস না। জ্ঞাতিতে শুনলে টেনে ছাড়ানো দায় হবে, পতিত করবে। ধমক খাইয়া রঞ্জনের মা তখনকার মত চুপ করিল। কিন্তু রঞ্জন বাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র নথ নাড়িয়া, ঘন ঘন ভুরু তুলিয়া সে বলিল, বলি, ওরে ও মুখপোড়া, তোর রকম কি বল দেখি?

রঞ্জনও সমানে তাল দিয়া বলিল, খেতে দাও বলছি। গাল খেয়ে পেট ভরবে না আমার। গাল খেতে আসি নাই আমি।

ঝঙ্কার দিয়া মা বলিয়া উঠিল, দোব—ছাই দোব মুখে তোমার। কমলির এঁটো কুল খেয়ে পেট ভরে নাই তোমার শরম-নাশা জাত-খেগো!

সাপের মাথায় যেন ঈশের মূল পড়িল। উদ্ধত রঞ্জনের রক্তচক্ষু নত হইয়া মাটির উপর নিবদ্ধ হইয়া গেল। মহেশ্বর মোড়ল আড়ালেই কোথায় ছিল। সে এবার সম্মুখে আসিয়া চাপা গলায় গর্জন করিয়া বলিল, হয়ে মরলি না কেন তুই? মুখ হাসালি আমার তুই! জাত নাশ করলি!

রঞ্জন নীরব হইয়া রহিল। তাহার নীরবতায় বাপের রাগ অকারণে বাড়িয়া গেল, সে বলিল, চুপ করে আছিস যে? কথার জবাব দে।

কিছুক্ষণ পর আবার সে গর্জিয়া উঠিল, তবু কথার জবাব দেয় না। আচ্ছা, আমিও তেমন লোক নই, তা জেনো তুমি। ত্যাজ্যপুত্তুর করব আমি তোমাকে—বাড়ি থেকে দূর করে দোব। কিন্তু জাত আমি দোব না।

তারপর আদেশের সুরে বলিল, খবরদার, আর যাবে না ওদের বাড়ি। মা-বিটীদের ত্রিসীমেনা মাড়াবে না আর। এই বলে দিলাম তোকে—হ্যাঁ?

আস্ফালন করিয়া মহেশ্বর চলিয়া গেল। রঞ্জন নীরবে নত দৃষ্টিতে সেইখানেই বসিয়া রহিল।

ঘুরিয়া ফিরিয়া মা আসিয়া এবার সান্ত্বনা দিয়া বলিল, মাঘ মাসেই বিয়ে দোব তোর। এমন বউ আনব, দেখবি কমলি কোথায় লাগে।

রঞ্জন নীরবেই বসিয়া রহিল। মুড়ি বাহির করিতে করিতে মা ঘর হইতে বলিল, বলে যে সেই—

বেঁচে থাকুক চূড়া বাঁশি
রাই হেন কত মিলবে দাসী!

সুন্দর মেয়ের আবার ভাবনা!

রঞ্জন বলিয়া উঠিল, না।

মায়ের হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গেল। সবিস্ময়ে সে বলিল, কি 'না'?

বিয়ে আমি করব না।

প্রবলতর বিস্ময়ে আশঙ্কায় মা প্রশ্ন করিয়া বলিল, কি করবি তবে ?

রঞ্জন উঠিয়া পড়িল। আঙিনাটা অতিক্রম করিতে করিতে সে বলিয়া গেল, বোষ্টম হব আমি।

বিস্ময়ে হতবাক রঞ্জনের মা কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ পাইয়া ডাকিল স্বামীকে, ওগো মোড়ল, ও মোড়ল !

রঞ্জন আসিয়া উঠিল রসকুঞ্জে। রসিকদাসের আখড়ার ওই নাম। রসকুঞ্জ এ গ্রামের সকলেরই সুপরিচিত স্থান। ছেলেদের সেখানে মিলিত তামাক, বুড়োদের মিলিত গাঁজা। কাহারও মিলিত বিচিত্র আকারের বাঁশের হুঁকা, কাহারও বা সাপের মত আঁকাবাঁকা নল; কাহারও লতাবেষ্টনীর জোড়া ডালের ছড়ি—ঠিক যেন দুইটি সাপে পরস্পরকে জড়াইয়া আছে। এই রকম বহু উদ্ভট সুন্দর সামগ্রী আবিষ্কার করিয়া রসিকদাস সকলের মনোরঞ্জন করিত।

সেদিন রসিকদাস স্নানের পর দাড়ির বিন্যাস করিতেছিল, কাঁচাপাকা দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাইয়া ফাঁস ভাঙিতেছিল। রঞ্জন আসিয়া ডাকিল, মহান্ত !

রসিক বলিল, রাই-কমল-রঞ্জন যে হে ! এস এস।

রঞ্জনকে সে ওই নামে ডাকে। রঞ্জন অনেক কথা মনে মনে ফাঁদিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সব কেমন গোলমাল হইয়া গেল। যেটুকু মনে ছিল, সেটুকুও লজ্জায় বলিতে পারিল না।

রসিকদাসই প্রশ্ন করিল, কি, তামাক খেতে হবে নাকি ? ভাত খেয়েছ ?

রঞ্জন একটা সুযোগ পাইল, সে বলিল, না। তোমার এখানেই খাব।

মহান্ত রসিকতা করিয়া বলিল, জাত যাবে যে হে !

ফস করিয়া রঞ্জন বলিয়া ফেলিল, বোষ্টম হব আমি মহান্ত।

মহান্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। তারপর

উপভোগের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে গুনগুন করিয়া গান ধরিয়া দিল—

জাতি কুল মান সব ঘুচাইয়া চরণে হইনু দাসী

রঞ্জন লজ্জায় রাঙা হইয়া ঈষৎ বিরক্তিভরে কহিল, ধেৎ! ধান ভানতে শিবের গীত! তোমার হল কি মহান্ত?

মৃদু হাসিতে হাসিতে মহান্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, রসিকের রস এসেছে।

আরও বিরক্ত হইয়া রঞ্জন বলিল, তা তুমি কি বলছ বল? আমাকে ভেক দেবে তুমি?

নির্বিকারভাবে রসিকদাস বলিল, রাই-কমল বলে তো দোব।

রুষ্ট হইয়া রঞ্জন বলিল, কেন? কমলি কি তোমার হাকিম নাকি?

হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া রসিক বলিল, হুঁ।

তবু যদি বগ-বাবাজী না বলত সে! রঞ্জন ক্রোধভরে উঠিয়া পড়িল।

রসিকদাস তখনও তেমনই হাসিতেছিল, সে কথা কহিল না। রঞ্জন বলিল, বেশ, চললাম আমি তারই কাছে।

রসিকদাস গুনগুন করিতে করিতে দাড়িতে বিনুনি পাকাইতে আরম্ভ করিল।

কমলি তখন আখড়ায় জোড়া-লতার ছায়াতলে বসিয়া সেই ফুলগুলি বাছিতেছিল, মাঝে মাঝে রঞ্জনকে প্রতারণা করার কৌতুক স্মরণ করিয়া আপনার মনেই সে হাসিয়া উঠিতেছিল। ও-পাড়ার ভোলা আসিয়া কমলির নিকটে বসিয়া বলিল, কমলি!

স্বরখানি তরঙ্গায়িত করিয়া অনাবশ্যক দীর্ঘ উচ্চারণে কমলি উত্তর দিল, কি—।

ভোলা বলিল, এই এলাম একবার।

নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে ভোলার স্বরভঙ্গি অনুকরণ করিয়া কমলি বলিল, বেশ, যাও একবার। সে ব্যঙ্গে ভোলা এতটুকু হইয়া গেল। হাঁটু

দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল। কমলিও কুল বাছা রাখিয়া ভোলার ভঙ্গি অনুকরণ করিয়া বসিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল, বাঁদরের মত বসলি যে উপু হয়ে? ভোলার লজ্জার আর পরিসীমা ছিল না। সে পলায়নের অজুহাত খুঁজিতেছিল। কমলি বলিল, আমার কুলগুলো বেছে দে না ভাই। আমি একটু বসি।

ভোলা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে তাড়াতাড়ি কুল বাছিতে বসিল।

বিচিত্র খেয়ালী চপলা মেয়েটি অকস্মাৎ দুলিয়া দুলিয়া আরম্ভ করিল—

এক যে ছিল রাজা তিনি খান খাজা
তাঁর যে রানী তিনি খান ফেনী
তাঁর যে পুত হাবাগোবা ভূত
মুখে খায় সর গালে খায়—

সঙ্গে সঙ্গে সে বাঁ হাতে চড় উঠাইয়াছিল। কিন্তু ভোলা চট করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। কমলির কলকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল জলতরঙ্গের মত হাসি।

ভোলা বলিল, কমলি! স্বর তাহার কাঁপিতেছিল।

হাতখানি আকর্ষণ করিয়া কমলি বলিল, ছাড় ভোলা, ছাড় বলছি।

ভোলা বলিল, না।

কমলি মুক্ত ডান হাতে এক মুঠা কুল লইয়া ভোলার মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিয়া বসিল। পাকা কুলগুলি ছিতরাইয়া চটচটে শাঁসে ভোলার মুখখানা ভরিয়া গেল। কমলির হাত ছাড়িয়া ভোলা মুখ মুছিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কমলি সেই হাসি হাসিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছিল।

ঠিক এই সময়টিতেই বাহির হইতে ডাক আসিল, চিনি!

ভোলা দুর্বল মানুষ, সে রঞ্জনকে বড় ভয় করিত। ডাক শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে বাহিরের দিকে ছুটিল।

প্রবল কৌতুকে উচ্ছলা কমলি তাহাকে ডাকিল, যাস না ভোলা, যাস না। ভয় কিসের রে?—বলিতে বলিতে সে বাহিরের দরজায় আসিয়া দেখিল, এ মুখে পলাইতেছে ভোলা, বিপরীত মুখে দ্রুতগমনে চলিয়াছে রঞ্জন!

কমলি ডাকিল, লক্ষা, লক্ষা হে!

রঞ্জন উত্তর দিল না, একবার ফিরিয়া চাহিল না পর্যন্ত।

কমলি বুঝিল, রঞ্জন রাগ করিয়াছে, ভোলার সঙ্গে কথা বলিলেই রঞ্জনের মুখ ভার হয়, আজ তো ভোলার সঙ্গে বসিয়া সে হাসিতেছিল! কিন্তু এতটাও তাহার সহ্য হইল না। ভোলাকে ধরিয়া দু ঘা দিলেই তো হইত। তা না, উলটা রাগ করিয়া যাওয়া হইতেছে! সে উচ্চকণ্ঠে বলিল, আচ্ছা—আচ্ছা এই হল। মনে থাকে যেন।

বলিয়াই সে ফিরিল; দুই পা ফিরিয়াই আবার সে দরজার মুখে আগাইয়া আসিয়া বলিল, আমি কারও কেনা বাঁদী নই।

বলিয়াই সে এদিকে মুখ ফিরাইয়া ভোলাকে ডাকিল, ভোলা, ভোলা! কিন্তু পথের বাঁকের অন্তরালে ভোলা তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আখড়ার মধ্যে ফিরিয়া কমলি আবার কুল বাছা শুরু করিল। একটা কুল হাতে লইয়া সে আপন মনেই বলিয়া গেল, ও-রে! চলে গেলি—গেলিই। আমার তাতে বয়েই গেল। একেই বলে, আলুনো রাগ। তা রাগ করলি—করলি, নিজের ঘরে ভাত বেশি করে খাবি।

সে হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসির বদলে চোখে আসিল জল। অভিমানভরে সে পটপট করিয়া কুলের বোঁটা ছাড়াইয়া চলিল।

কতক্ষণ পর কে জানে, কমলির হুঁশ ছিল না।

কামিনী ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া তিক্তস্বরে ভৎর্সনা করিয়া কমলিকে বলিল, ও—মাগো! এখনও উনোনের মুখে কাঠ পড়ে নাই, জলের কলসী ঢনঢন করছে! একি? বলি, হ্যাঁ লো কমলি, তোর রীতকরণের রকম কি বল দেখি?

কমলি অকারণে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল, ঝঙ্কার দিয়া সে বলিল,

পারব না, আমি পারব না। খেতে না হয় নাই দেবে। —বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, শুধুই বকুনি, শুধুই বকুনি! যার তার রাগ আমার ওপর। কেন, আমি কার কি করেছি?

কামিনী আশ্চর্য হইয়া গেল। সে তো এমন কিছু বলে নাই! তবু আদরিণী মেয়েটির কান্না তাহার সহ্য হইল না। মেয়ের পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া সে বলিল, কিছু তো বলি নাই আমি তোকে মা। বলেছি, বুড়ো মানুষ তেতে পুড়ে এলাম, এখন জল আনা, কাঠ যোগাড় করা—

চোখের জল চোখে তখনও ছলছল করিতেছিল, কমলির মুখে অমনই হাসি দেখা দিল। বোধ হয় খানিকটা লজ্জাও পাইল। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া শূন্য কলসীটা কাঁখে তুলিয়া বলিল, জল নিয়ে আসি আমি—এলাম বলে।

মা হাসিল। ফুলের ঘা সয় না তাহার কমলের।

কমলি চলিয়া যাইতেই আসিয়া প্রবেশ করিল মহেশ্বর মোড়ল—রঞ্জনের বাপ, সে যেন এই অবসরটুকুর প্রতীক্ষাতেই কোথাও দাঁড়াইয়া ছিল। একেবারেই সে কামিনীর হাত দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া একান্ত কাকুতিভরে বলিল, কামিনী, তোরও সন্তান আছে। আমার ওই একমাত্র সন্তান। আমার সন্তান আমাকে ফিরে দে কামিনী। তোর ভাল হবে।

হাত ছাড়াইয়া লইয়া সবিস্ময়ে কামিনী প্রশ্ন করিল, কি, হল কি মোড়ল?

সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া সজল চক্ষে মহেশ্বর বলিল, বাড়ি থেকে সে পালিয়ে এসেছে। তার মাকে বলে এসেছে, বোষ্টম হবে।

কামিনী সমস্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, এতদূর তো ভাবি নাই আমি মোড়ল। কিন্তু এখন ছাড়াছাড়ি করলে কি মেয়েরই আমার সুখ হবে? আমাকে কি মা হয়ে সন্তানের বুকে শেল হানতে বল তুমি?

মহেশ্বর বলিল, টাকা দোব আমি, তোমার মেয়েকে কিছু জমি

লিখে দোব আমি কামিনী।

বাধা দিয়া কামিনী বলিল, ছি, আমার মেয়ের কি ইজ্জত নাই মোড়ল?

মোড়ল বলিয়া উঠিল, রাম রাম রাম! সে বললে জিভ খসে পড়বে আমার। কিন্তু ভেবে দেখ কামিনী, সন্তান তো আমারও। ওই একটি সন্তান।

একটু চিন্তা করিয়া কামিনী বলিল, যাও মোড়ল, আমি কমলিকে নিয়ে গাঁ থেকে চলে যাব। তুমি তোমার ছেলেকে বাগিয়ে নিও।

বিষণ্ণভাবে মহেশ্বর বলিল, গাঁ থেকে তো চলে যেতে বলি নাই কামিনী।

কামিনী বলিল, না। মেয়ের চোখের উপর রঞ্জনকে আমি রাখব না মোড়ল। আমি ভিখারী, কিন্তু মেয়ে তো আমার কম আদরের নয়। আর বোষ্টম জাত, পথই তো আমাদের ঘর গো।

সহসা বাহিরে বেড়ার ধারে কি একটা শব্দ হইল। কি যেন সশব্দে পড়িয়া গেল। কামিনী ছুটিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে বলিতেছিল, কে? কমলি?

সত্যই কমলি বেড়ার পাশে সিক্তবস্ত্রে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। তাহার কাঁখের জলভরা মাটির কলসীটা পড়িয়া ভাঙিয়া গিয়াছে।

মহেশ্বর ত্রস্তপদে অপরাধীর মতই যেন পলাইয়া গেল। স্নেহ-কোমলস্বরে কামিনী বলিল, কলসীটা ভেঙে গেল! যাক। আয়, ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেল।

কমলি হাসিয়া বলিল, না, জল আনি।

মা মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, মেয়েটি তাহার সেই মেয়ে কমলিই বটে, কিন্তু হাসিটি তো তাহার নয়! কমলির মুখে এ হাসি তো সাজে না। কামিনীর বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল।

কমলি ঘাটের দিকে ফিরিয়াছিল, কামিনী বলিল, না।

এলাম বলে।

দাঁড়া। আমিও যাব। একটা ঘড়া লইয়া কামিনী বাহির হইয়া

আসিল। পুকুরে অগাধ জল। কমলির অভিমান তাহার চেয়েও বেশি।

পথে যাইতে যাইতে কমলি বলিল, মা!

কি রে?

সেই ভাল মা, চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

কামিনী চমকিয়া উঠিল। কমলি কথাটা শুনিয়াছে। কিন্তু কথার উত্তর দিতে পারিল না। তখন তাহার চোখের কোণে রুদ্ধ অশ্রুর বান ডাকিয়াছে।

কমলি বলিল, রাসে নবদ্বীপে মেলা হয়। চল মা, তার আগেই আমরা চলে যাই। সন্তান হারানোর অনেক দুঃখ মা। নন্দরানীর দুঃখের কথা ভেবে দেখ।

কামিনী অবাক হইয়া গেল। কমলির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল, কমলি যেন অকস্মাৎ কত বড় হইয়া উঠিয়াছে! মনে হইল, সে যেন তাহার সখীর সঙ্গে কথা বলিতেছে। সেও সব ভুলিয়া এই মুহূর্তটিতে অন্তরঙ্গ সখীর মতই প্রশ্ন করিয়া বসিল, তোর কি খুব কষ্ট হবে কমলি?

হাসিয়া কমলি বলিল, দূর!

মা বলিল, লজ্জা করিস না মা।

ধীরভাবে কমলি বলিল, না।

জল লইয়া ফিরিবার পথে কামিনী বলিল, নবদ্বীপে চাঁদের মত চাঁদ খুঁজে তোর বিয়ে দোব আমি। সে যেন এতক্ষণে মনের মত শোধ তুলিবার উপায় পাইয়াছে।

ঘরে কলসী নামাইয়াই চটুল চঞ্চল গতিতে কমলি বাহিরের পথ ধরিল। মা বলিল, কোথায় যাবি আবার?

নবদ্বীপ যেতে হবে, বলে আসি বগ-বাবাজীকে।—বলিয়া সহজভাবেই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কামিনী কিন্তু ওই হাসিতে সান্ত্বনা পাইল না। মেয়ে চলিয়া যাইতেই সে কাঁদিল। বার বার চোখের জল মুছিল।

অন্যায় তাহারই। তাহারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মেয়েকে

এমন ভাবে রঞ্জনের সঙ্গে মাখামাখি করিতে দেওয়া উচিত হয় নাই। এতটা সে ভাবে নাই; কিন্তু ভাবা উচিত ছিল। দুইটি কিশোর আর কিশোরী! বিচিত্র এর রীতি! কেমন করিয়া যে কোথায় বাঁধন পড়ে! পরান ছাড়িলেও এ বাঁধন ছেঁড়ে না!

কমলি বাহির হইতে ডাকিল, মা, এই নাও, বললে বিশ্বাস করে না। তুমি বল, তবে হবে। কমলি বগ-বাবাজীকে লইয়া হাজির করিয়াছে।

কামিনী বলিল, বোসো মহান্ত, বোসো। কথা আছে, শোন। কমলি, যা তো মা, তোর ননদিনীর বাড়ি থেকে খানিকটা নুন নিয়ে আয় তো।

কমলিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, ওই তো ঘরে সের দরুনে নুন রয়েছে।

তুই যা না, ওতে হবে না।

ওতে না হলে মণ দরুনে নুনেও তোমার মরণ হবে না। আমি পারব না।

যাও না মা, একটুখানি বেড়িয়েই এস না হয়। মায়ের কথা শুনলে বুঝি পাপ হয়?

এবার কমল হাসিয়া বলিল, আমার সামনেই বলতে পারতে মা। কমল তোমার শুকোত না। বেশ, আমি যাচ্ছি।

সে চলিল ননদিনীর বাড়ি। ননদিনী কাদু পাড়ার মোড়লদের মেয়ে, কমলির খেলাঘরের পাতানো সেই ননদিনী। কাদু বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান, আদরে বর্ষার দাদুরীর মত সে মুখরা। হয়তো ভুল হইল, শুধু মুখরা বলিলে কাদুর প্রশংসা করা হয়। মেয়েটি মুখরার উপরে অপ্রিয়-সত্য-ভাষিণী। লোকে বলে, নবজাতা কাদুর মুখে তাহার মা নাকি মধুর প্রলেপ দিতে ভুলিয়াছিল। পাড়ার লোকে কাদুকে 'সাত কুঁদুলী'র মধ্যে আসন দিয়াছে। ঘরে বসিয়া অনেকে তাহার মাথা খায়। ননদিনী-পাতানো কমলিনীর সার্থক হইয়াছে। কাদুর ইহারই মধ্যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। গরিবের ছেলে দেখিয়া

বিবাহ দিয়া তাহার বাপ জামাইকে ঘরেই রাখিয়াছে।

পথ হইতেই কাতুর গলা শোনা যাইতেছিল, ও মাগো! একেই বলে যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই। আমি পান খাই, আমার বাপের পয়সায় খাই। তাতে তোমার চোখ টাটায় কেন বল তো?

কমলিনী বুঝিল, এ কোন্দল হইতেছে কাতুর স্বামীর সঙ্গে। মা-বাপের অনুপস্থিতির সুযোগ পাইলেই পনরো বছরের কাতু প্রবীণা গিন্নীর মত কোমর বাঁধিয়া স্বামীর সঙ্গে কোন্দল জুড়িয়া দেয়। সে দুয়ারে ঢুকিয়াই গান ধরিয়া সাড়া দিল—

ননদিনীর কথাগুলি নিমে গিমে মাখা
কালসাপিনীর জিহ্বা যেন বিষে আঁকাবাঁকা।
ও আমার দারুণ ননদিনী—

কাতু কোন্দল ছাড়িয়া খিলখিল শব্দে হাসিয়া উঠিল। কমল বলিল, কুঞ্জে প্রবেশ করতে পারি কুঞ্জেশ্বরি?

কাতু বলিল, মর মর মর, ঢঙ দেখে আর বাঁচি না। আয় আয়।

তারপর তীব্রস্বরে স্বামীকে বলিল, ভারি বেহায়া তুমি। যাও না বাইরে। বউ এসেছে।

কমল প্রবেশ করিয়া বলিল, আহা, থাকুকই না বেচারী, যুগল দেখে চোখ সার্থক করি।

কাতু হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ, এক হাতে কোদাল আর এক হাতে কাস্তে নিয়ে শ্যামকে মানাবে ভাল। বোস বোস ভাই। দিন রাত ব্যাজব্যাজ করছে, মলাম আমি। দাঁড়া, আমি পান নিয়ে আসি। দোক্তা নিবি, দোক্তা?

পান-দোক্তা মুখে পুরিয়া কমল বলিল, বিদায় নিতে এলাম ননদিনী।

সে কি? রাসে কোথাও যাবি বুঝি?

নবদ্বীপ।

কবে ফিরবি?

কমলিনীর চোখ সজল হইয়া উঠিল। সে ম্লানকণ্ঠে বলিল, আর ফিরব না ভাই কাহু।

কাহু বলিয়া উঠিল, সে কি? কি বলছিস তুই বউ, আমি যে বুঝতে পারছি না।

অবরুদ্ধ ক্রন্দনে কমলিনীর ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া শুধু কাঁপিয়া উঠিল। কোন কথা তাহার ফুটিল না।

তাহার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া কাহু বলিল, কি হয়েছে ভাই বউ? আমাকে বলবি না?

ধীরে ধীরে সমস্ত কথা বলিয়া কমলিনী বলিল, এত সব কথা তো কোনদিন ভাবি নাই ভাই কাহু। কিন্তু আজ—

কথা সে শেষ করিতে পারিল না। আবার তাহার ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কাহু যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে নীরবে বসিয়া রহিল। একটু পরে কমলিনী মৃদু হাসিয়া বলিল, সে বলেছে, সে বিয়ে করবে না, জাত দেবে। তা ভাই, মা-বাপের ছেলে মা-বাপের থাক। আমরা এখান থেকে চলে যাই।

কাহু বলিয়া উঠিল, তা মোড়লও কেন বোষ্টম হোক না। বোষ্টম কি ছোট জাত নাকি? না, তারা মানুষ নয়? আমি বলব রঞ্জনদার বাবাকে, আমি ছাড়ব না। ভারি তো, ওঃ।

কমলিনী বলিল, না। বার বার সে ঘাড় নাড়িল—না।

কাহু একটু চিন্তা করিয়া বলিল, এক কাজ কর বউ। হোক না রঞ্জনদাদা বোষ্টম। তখন ছেলের টানে—

বাধা দিয়া কমলিনী বলিল, ছি!

কাহু নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। চোখ তাহার ছলছল করিতেছিল। কমল অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিল, কাহুকে ঠেলা দিয়া বলিয়া উঠিল, ও মা, এ যে নতুন কাণ্ড! বউয়ের শোকে ননদ কাঁদে, মাছের মায়ের কান্না! শোন শোন ভাই, একখানা গান শোন।

মৃদুস্বরে সে গান ধরিল—

ও আমার দারুণ ননদিনী ও তুই পরম সন্ধানী
যেথায় যাব সেথায় যাবি লাগাইবি লেঠা
ছাড়ালে না ছাড়ে যেন শেয়াকুলের কাঁটা।

গানের অর্ধপথে কাহু তাহার হাত ধরিয়া বলিল, আর দেখা হবে না ভাই বউ?

হাসিয়া কমল বলিল, কেন হবে না? এই তো নবদ্বীপ। নন্দাইকে নিয়ে চলে যাবি—কেমন?

কাহু বলিল, তিন বার করে যাব আমি বছরে—রাসে, দোলে, ঝুলনে। আজ কিন্তু তোর কাছে শোব ভাই রাত্রে।

কমলিনী হাসিয়া বলিল, নন্দাই?

কাহু বলিল, মর।

কমল তাহার চিবুকে হাত দিয়া আদর করিয়া বলিল, মরব। কিন্তু "সখি, না পুড়ায়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে—"

কাহু তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাত দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিল, না না। ও গান তুই গাস না। না।

আখড়াতে যখন সে ফিরিল, রসিকদাস তখনও বসিয়াছিল। কমলকে দেখিয়া সে গান ধরিয়াছিল—

গোরার সেরা গোরাচান্দ চল দেখে আসি সখি!

কমল মৃদু হাসিয়া বলিল, গান ভাল লাগছে না বগ-বাবাজী।

রসিকও মৃদু হাসিল। বলিল, তাই তা হলে হবে রাইয়ের মা। চলে চল যত শিগগির হয়। আমরা বোষ্টম, আমাদের প্রভুর চরণতলই ভাল।

রাস্তায় বাহির হইয়া সে চলিতে চলিতে আবার গান ধরিল—

মথুরাতে থাকলে সুখে আসতে তারে বলিস নে গো।
তাতে মরণ হয় যদি মোর সুখের মরণ জানিস সে গো॥

নবদ্বীপে কামিনী বেশ জাঁকিয়া বসিল। স্বামীর আমল হইতে গোপন সঞ্চয় ছিল, তাহা হইতেই সে বাড়িঘর কিনিয়া আখড়া বাঁধিয়া বসিল। আখড়ার জাঁকজমকেরও অভাব ছিল না। বৈষ্ণব মহান্তদের নিমন্ত্রণ হয়, পরম যত্নে সাধু-সেবা হয়; সকাল-সন্ধ্যায় আখড়ায় নাম-গানের আসর জমিয়া উঠে।

বলাইদাস, সুবলচাঁদ ইহারা বয়সে তরুণ। সুবল তাহার উপর সুপুরুষ। সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটি পরম কমনীয় শ্রীতে শান্ত কোমল, মানায় বড় চমৎকার। কথাগুলিও স্নেহশান্ত, নম্র। রসিকদাসের তাহাকে দেখিয়া আশ মেটে না। বাউল বৈরাগী তাহার সহিত সম্পর্কও পাতাইয়া বসিয়াছে। সুবল তাহার সখা—সুবল-সখা বলিয়া ডাকে।

কমলি সেই তেমনই আছে। সেই যেদিন তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া নবদ্বীপে আসে, সেদিন হঠাৎ সে যতটুকু বড় হইয়া গিয়াছিল, ততটুকু বাড়িয়াই সে আর বাড়ে নাই।

অবসর সময়ে রসিকদাস কমলকে বলে, এ যে চাঁদের হাট বসিয়ে দিলে গো রাই-কমল! আহা-হা—কি সুন্দর রূপ গো! গোরাচাঁদের দেশের রূপই আলাদা।

কমলিনী বলিল, তা হলে গঙ্গাতীরের রূপে তুমি মজেছ বল। এইবার ভাল দেখে একটি বোষ্টুমী করে ফেলগে বাবাজী।

বলিয়াই সে মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। কমলের পরিহাসে রস-পাগল রসিকের একটু লজ্জা হইল। সে সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল, রাধে রাধে! রাধারানীর জাত কৃষ্ণপূজার ফুল—কি যে বল তুমি রাই-কমল!

হাসিতে হাসিতেই উচ্ছলভাবে কমলিনী বলিল, প্রসাদী মালা গলায় পরা চলে গো। পায়ে না মাড়ালেই হল।

রসিক বলিল, আমি বাউল দরবেশ রাই-কমল। বৃন্দে হল আমাদের গুরু। মালা আমাদের মাথায় থাকে গো। এখন তোমার

কথা বল।

কি জিজ্ঞাসা করছ, বল ?

নবদ্বীপ কেমন ? রসিক একটু হাসিল। সে প্রত্যাশা করিয়াছিল, কমলের মুখে রক্তাভা দেখিবে।

কিন্তু কমলিনী মাথা নাড়িয়া সর্বদেহে অস্বীকারের ভঙ্গি ফুটাইয়া বলিল, এমন ভাল আর কি মহান্ত ? মহান্ত সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কমলিনী আবার বলিল, তবে মা-গঙ্গা ভাল।

প্রবল বিস্ময়ে রসিকদাস বলিল, এমন সোনার গোরায় তোমার মন উঠল না রাই-কমল ? হাসিয়া কমলিনী বলিল, না, বগ-বাবাজী। তবে হ্যাঁ, ওই রূপের মানুষটি যদি পেতাম তা হলে পায়ে বিকতাম, তবে মন উঠত।

রসিক এবার ছাড়িল না, রহস্য করিয়া সে বলিল, বল কি ? রাই-কমল-রঞ্জনকে ভুলে, অ্যাঁ ?

হাসিয়াই কমল উত্তর দিল, তা সোনার মোহর পেলে রূপোর আধুলি ভোলে না কে, বল ?

তবে রাই-কমল, আধুলি-টাকার তফাতের লোকও তো রয়েছে। টাকাটা নিয়ে আধুলিটা ভোল না কেন ?

সাধে কি তোমাকে বগ-বাবাজী বলি! চুনোপুঁটির ওপরেও তোমার লোভ। দুটো আধুলিতে একটা টাকা। বত্রিশটা আধুলিতে একটা মোহরের দাম হয়, কিন্তু বত্রিশটা গালালেও রূপোতে সোনার রঙ ধরে না। ওটুকু তফাতে আমার মন ওঠে না। এত লোভ আমার নাই।

কামিনী বোধ হয় নিকটেই কোথাও গোপনে বসিয়া কন্যার মনের কথা শুনিতেছিল। সে আর থাকিতে পারিল না, সম্মুখে আসিয়া বলিয়া উঠিল, তা বলে টাকা-আধুলির উলটো কদরও কেউ করে না মা। তোমার সবই আদিখ্যেতা, হ্যাঁ।

কমলিনী বাসর-ঘরের কনের মত ধরা পড়িয়া হাসিয়া সারা হইল। সে-হাসিতে মায়ের রাগ আরও বাড়িয়া গেল। কামিনী

রাগ করিয়াই বলিয়া উঠিল, মরণ! এতে হাসির কি পেলি শুনি? হাসছিস যে শুধু?

কমলিনীর হাসি বাড়িয়াই চলিল। মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে সে বলিল, মরণ তোমার। আড়ি পেতে আবার মেয়ের মনের কথা শোনা হচ্ছিল! তারপর উচ্ছল হাস্যধারা সংবরণ করিয়া মৃদু শান্ত হাসি হাসিয়া সে বলিল, তা শুনেছিস যখন, তখন শোন। ঢেঁপো-হাঁদা টাকার মালা না পরে যদি কেউ প্রমাণী আধুলির মালাই গলায় দেয়, তাতে নিন্দের কি আছে? ওখানে দরের কথা চলে না বাহাত্তুরে বুড়ী—ও হল রুচির কথা।

অবাক হইয়া কামিনী মুখরা মেয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর তাহার যেন চমক ভাঙিল, বলিল, তবে তোর মনের কথাটাই শুনি?

কমলিনী বলিল, বললাম তো, আবার কি বলব?

মা বলিল, কতকাল আর আমার গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকবি তুই? বিয়ে তুই কেন করবি না?

তা আবার কখন বললাম আমি?

কেন তবে সুবলকে মালাচন্দন করবি না?

দূর!—কেমনধারা মেয়ের মতন কথা, মেয়েলী ঢঙ। দূর দূর! মুখে কাপড় দিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মা বলিল, বেশ, তবে বলাইদাস—

ঠোঁট উলটাইয়া কমল বলিয়া উঠিল, মর—মর। রুচিতে তোর ধন্যি যাই। ওই আমড়ার আঁটির মত রাঙা রাঙা চোখ! ওকে বিয়ে করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল।

রাগ করিয়া কামিনী উঠিয়া গেল। সমস্ত দিন সে আর মেয়ের সঙ্গে কথা কহিল না। কমলিনী সেটুকু বুঝিল। সন্ধ্যার সময়ে সে আসিয়া মায়ের গা ঘেঁষিয়া বসিতেই মা হাত-দুই ছিটকাইয়া সরিয়া গেল। বলিল, কচি খুকীর মত গা ঘেঁষে বসা কেন আবার?

কমল কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিল। তারপর অনুপেক্ষণীয়

গম্ভীর স্বরে মাকে বলিল, দেহ দিয়ে কি গোবিন্দের পূজো করা হয় না মা ?

মা চকিতভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিল। কমল অসঙ্কোচপূর্ণ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, মালা কি মানুষের গলাতেই দিতে হবে ?

ওদিকের দাওয়ার উপর ছিল রসিকদাস বসিয়া, সে বলিয়া উঠিল, তাই হয় গো রাই-কমল, তাই হয়। মানুষের মধ্যে দিয়েই তাঁর পূজো করতে হয়। জান, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

কমল কঠিন স্বরে বলিল, মিছে কথা। ও হচ্ছে মানুষের নিজের ফন্দির কথা। ভগবানের পূজো চায় সে নিজে।

কামিনী বলিল, ও কথা থাক না কমল। কিন্তু মা, মা তো তোর অমর নয়—আর ভিখারীর সম্বলও আর কিছু নাই যে, তোকে দিয়ে যাব। যা ছিল, তাও ফুরল। কি করে তোর দিন চলবে ?

হাসিয়া কমল বলিয়া উঠিল, হরি বলে। নেহাত বোকার মত কথাটা বললি মা। তোর যেমন করে দিন চলছে তেমনিই করে আমারও চলবে। হরি বলে পাঁচটা দোর ঘুরলেই একটা পেট চলে যাবে আমার !

মা বলিল, তুই তো জানিস না কমল পথের কথা। সাপকে এড়িয়ে পথ চলা যায় মা, কিন্তু পাপকে এড়িয়ে পথ চলা যায় না।

কমল উত্তর দিল, লখিন্দরকে বাসর-ঘরে—লোহার বাসর-ঘরে সাপে খেয়েছিল মা। পথে নয়। ও পথই বল আর ঘরই বল, পাপ এড়িয়ে কোথাও চলা যায় না। আমায় আর ওসব কথা বলিস না মা। সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

কামিনী রসিকদাসকে বলিল, কি করি আমি মহান্ত ?

রসিক আপন মনে গান ভাঁজিতেছিল, কোনও উত্তর দিল না।

মানুষের নাকি আশার শেষ নাই। সংসারে চুনিয়া চুনিয়া সে শুধু সংগ্রহ করে আশাপ্রদ ঘটনাগুলি। বাকিগুলি ইচ্ছা করিয়া সে ভুলিতে চায়, ভুলিয়াও যায়। এমনই ঘটনার পর ঘটনা সাজাইয়া সে গড়িয়া

তোলে কল্পনার আশা-দেউল। কামিনীর আশা নিঃশেষে শেষ হয় নাই।

সুবলকে লইয়া খানিকটা জটিলতা ঘনাইয়া আসিতেছিল। তাহা দেখিয়াই কমলের মায়ের একটা আশ্বাসপূর্ণ প্রত্যাশা জাগিয়াছিল। যতই নিন্দা সুবলের সে করুক, তাহাকে দেখিলে কমল প্রফুল্ল হইয়া উঠে। আগে বাড়াইয়া হাসিমুখে তাহাকে সম্ভাষণ করে, সুবল-সাঙ্গাতী, শোন।

রসিক মুগ্ধভাবে বলিয়া উঠে, সুবল-সখা, গোরারূপে তোমায় মানায় না ভাই। রঙটি তোমার কালো হলেই যেন ভাল হত।

সুবল লজ্জা পায়। সে মাথাটা নত করিয়া রাঙা হইয়া উঠে। উত্তর দেয় কমল, সপ্রতিভ মেয়েটির মুখে কিছুই বাধে না। অবলীলা-ক্রমে ধারালো বাঁকা ছুরির মত উত্তর দেয়, সমাজে খেতে বসে নিজের যে জিনিসটার ওপর লোভ হয়, লোকে সেই জিনিসটা পাশের পাতে দিতে সুপারিশ করে। কালো রূপটা তোমার হলেই ভাল হত বগ-বাবাজী। রাই-কমলকে পাশে মানাত ভাল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই উদ্দাম হাসির তরঙ্গে সে নিজেই যেন মুখরিত হইয়া উঠে। তরুণ অবয়বের প্রতি অঙ্গটি তাহার সুপ্রত্যক্ষ কম্পনে কাঁপে, মনে হয়, প্রতিটি অঙ্গ যেন নাচিতেছে।

রসিকদাস লজ্জিত হইয়া বলে, রাধে রাধে! আমরা হলাম বাউল রাই-কমল। ব্রজের শুক আমরা। লীলার গান গাওয়াই আমাদের কাজ গো।

কমল হাসিতে হাসিতে বলে, আমি না হয় সারীই হতাম শুকের।

রসিকদাস পলাইয়া যায়। বলে, রণে ভঙ্গ দিলাম আমি। পিঠে বাণ মারা ধর্মকাজ হবে না রাই-কমল।

মাও কাজের অজুহাতে সরিয়া যায়। হাসি গল্প গান করিয়া সুবল চলিয়া যায়। পথে পিছন হইতে কে তাহাকে ডাকে, শোন শোন, ওহে সুবল-সখা!

সুবল পিছন ফিরিয়া দেখে, রসিকদাস। রসিক নিকটে আসিয়া

বলে, কি বললে রাই-কমল ?

সুবল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কি আবার বলবে ? কিসের কি ?

রসিক বলিয়া উঠে, কমল ঠিক বলে, মেয়ে গড়তে গড়তে বিধাতা তোমাকে ভুলে পুরুষ গড়ে ফেলেছে। মালা—মালা—বলি, কমল-মালা গলায় উঠবে তোমার ? কিছু বুঝতে পারছ ?

সুবল লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠে, মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া থাকে।

রসিক যেন রুষ্ট হয়। বলে, কি তুমি হে ?

লজ্জিত সুবলকে দেখিয়া আবার মায়াও হয়। কিছুক্ষণ পর সান্ত্বনা দিয়া বলে, খেয়ে তো ফেলবে না রাই-কমল তোমাকে। সে তো আর বাঘ-ভালুক নয়। তার মতটা জান না একদিন।

মৃদুস্বরে সুবল বলে, কাল জানব।

রসিক খুশি হইয়া বলে, মালা-চন্দনের দিন তোমার মালা আমি গাঁথব কিন্তু।

হাসিয়া সুবল বলে, বেশ !

পরদিন ঠিক সেই স্থানটিতে রসিক অপেক্ষা করিয়া থাকে। সুবল আসিতেই হাসিতে হাসিতে বলে, মালা গাঁথি সুবল-সখা ?

সুবল নীরব। রসিকদাস বলে, কথা কও না যে হে ? কি হল।

সুবল বলে, কমলের মা ছিল ওদিকের ঘরে—

রসিক বলে, কি বিপদ ! তোমার জন্যে সে কি বনে যাবে ? তোমার কোনও ভয় নাই, কামিনী নিজে আমায় তোমাকে বলতে বলে দিয়েছে। সে নিজে দিনে দশ বার করে মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছে যে, কেন তুই সুবলকে বিয়ে করবি না ? কাল কিন্তু এর শেষ করতে হবে। বুঝলে ?

সুবল ঘাড় নাড়িয়া জানায়, সে বুঝিয়াছে।

পরদিন কামিনীও কোথায় গিয়াছিল ! কমলিনী একা বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। সুবল আসিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সে সাহস সঞ্চয় করিয়া রসিকতা করিয়া বলিয়া ফেলিল, রাই-কমলিনী বিমলিনী কেন গো ?

কমল ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া মৃদু হাসির সহিত বলিল, গোষ্ঠের বেলা যায় সে সখা। তাই ভাবছি, সুন্দর সুবল-সখা আমার বাছনি বুকে এল না কেন ? শ্যামের কাছে আমি যাব কেমন করে ?

তরুণ সুবলের মনে মোহ ছিল। তাহার উপর রসিকদাসের গতকালের উৎসাহ সে-মোহের মূলে ভরসার জলসিঞ্চন করিয়াছে। কমলের কথাগুলির অর্থের মধ্যেও সে তাই অনুকূল ইঙ্গিত অনুভব করিল। যে মোহ এতদিন তাহার মনের কুঁড়ির ভিতরের গন্ধের মত সুপ্ত ছিল, আজ সে-মোহ বিকশিত পুষ্পের গন্ধের মত তাহার সর্বাঙ্গ ভরিয়া যেন প্রকাশিত হইয়া পড়িল। স্বপ্নভরা চোখে কমলের দিকে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সে আবিষ্টের মত কমলিনীর হাতখানি ধরিতে হাত বাড়াইল। সে-হাত তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

মৃণালের মত লীলায়িত ভঙ্গিতে দেহখানি বাঁকাইয়া সরিয়া আসিয়া কমলিনী বলিল, ছি! এই কি সুবল-সখার কাণ্ড! তোমার মনে পাপ!

অকল্পিত আকস্মিক আঘাত সুবলের কাছে। রসিকদাসের কথা সে ধ্রুব বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। মুহূর্তে দারুণ লজ্জায় শান্ত লাজুক বৈষ্ণবটির সর্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া গেল। মুখ হইয়া গেল বিবর্ণ পাংশু।

বিচিত্র চরিত্র এই চঞ্চলা কিশোরীটির। এইবার সে নিজেই সুবলের হাত ধরিয়া বলিল, এস সখা, বোসো। দাঁড়াও, একটা কিছু নিয়ে আসি পাতবার জন্য।

কমলিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই সুবল পলাইয়া আসিয়া বাঁচিল। লজ্জার ধিক্কারের আর তাহার সীমা ছিল না। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। পিছন হইতে কমলিনী ডাকিল, যে চলে যায়, সে আমার মাথা খায়—মাথা খায়।

সুবলকে ফিরিতে হইল। চটুলা চঞ্চলা মেয়েটি তখনই হাসিয়া অনুযোগ করিল, চলে যাচ্ছ যে ?

সুবল মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাত দুইটি ধরিয়া কমলিনী বলিল, তুমি আমার সত্যি সুবল-সখা—বেশ !

এবার কণ্ঠস্বরে ছিল সকরুণ একটি আন্তরিকতা, আত্মীয়তা।

সুবল এতক্ষণে মুখ তুলিয়া অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, বেশ। কিন্তু তোমার চোখ ছলছল করছে কেন রাই-কমল?

সাদা হাসিটি হাসিয়া কমলিনী বলিল, এই হাসছি আমি ভাই।

সেদিন ফিরিবার পথে সুবল রসিকদাসকে বলিল, ও কথা আমাকে বলবেন না।

রসিক বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুবল বলিল, মানুষে ওর মন ওঠে না মহান্ত।

কামিনী সমস্ত শুনিয়া আজ আবার বলিয়া বসিল, আমি কি করব মহান্ত?

রসিক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, বরং মনে তাহার গান গুঞ্জন করিয়া উঠিল—

কাঞ্চন-বরনী, কে বটে সে ধনী, ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে, চপলা চমকে, নীল শাড়ি শোভে গায়॥
... ...
চণ্ডীদাস কহে, ভেব না ভেব না, ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি সে তাহার সরবস ধন তোমারি সে আছে ধনী॥

কামিনী কিন্তু অনেক ভাবিয়া সান্ত্বনা আবিষ্কার করে। তাহার কমল এখনও ফোটে নাই।

চার

দিনে দিনে মাস কাটিয়া গেল। মাসে মাসে বৎসর পূর্ণ হইল। কামিনী একাগ্র চোখে মেয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিল, এইবার তাহার মনে হইল, কমলকোরক দিনে দিনে ক্রমশ পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। কমল আজ পূর্ণ যুবতী। পূর্ণতার গাম্ভীর্যে সেই চাপা চাপল্যটুকু যেন ঈষৎ ভারাক্রান্ত। আপনার দিকে চাহিয়া কমলিনী আপনি আপনাকে একটু মন্থর করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্বভাবের চটুলতাও ভোলা যায় না। মৃণালের বৃন্তে কমলদলের মত মধ্যে মধ্যে সে দুলিয়া

ছুলিয়া উঠে। সে চটুল-লজ্জার রূপ অপূর্ব! রসিকদাস সে রূপ দেখিয়া বিভোর হইয়া পড়ে। মাঝে মাঝে সে গুনগুন করিয়া গান ধরিয়া দেয়—

চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায় রে—অবনী বহিয়া যায়।

কমল ভ্রূকুটি করিয়া বলে, বলি—বয়স হল কত?

রসিক একগাল হাসিয়া উত্তর দিল, ভোমরা বয়েস মানে না রাই-কমল! আমরণ ফুলের রূপের বন্দনা গেয়েই বেড়ায়।

কমল ঝঙ্কার দিয়া উঠে, বেশ, তুমি থাম মহান্ত।

আজ পরম কৌতুকে হাসিয়া উঠে রসিকদাস। তাহার সে হাসি আর থামিতে চায় না। রোষভরে কমল আবার বলে, থাম বলছি মহান্ত।

রসিকের হাসি মিলায় না। সে বলে, আমি না হয় থামছি। কিন্তু তুমি 'মহান্ত' নামটি ছাড় দেখি।

কমলিনীর লাজরক্ত রোষদৃপ্ত অধরে হাসির রেখা দেখা দিল। চাপা হাসিতে মুখ ভরিয়া সকৌতুকে সে বলিল, কেন, তুমি মহান্ত নও নাকি?

খুব জোরে মাথা নাড়িয়া মহান্ত বলিল, না।

তবে তুমি কে?

রসিক বলিল, আমি রাই-কমলের বগ-বাবাজী।

এবার কমল মুখে কাপড় চাপা দেয়। মুখের চাপা কাপড় ঠেলিয়া তরুণীকণ্ঠের অবাধ্য হাসি জলকলধ্বনির মত বাহির হইয়া আসে। সঙ্গে সঙ্গে অবাধ্য বাউল গানটির পাদপূরণ করে—

ঈষৎ হাসিয়া তরঙ্গ-হিল্লোলে
মদন মূরছা যায় রে—মদন মূরছা যায়।

কামিনীর দুইটি ইচ্ছা ছিল—কমলের বিবাহ এবং নবদ্বীপের পুণ্যভূমি গৌরচন্দ্রের চরণচ্ছায়ায়, গঙ্গার কোলে চিরদিনের মত চোখ বুজিয়া শেষশয্যা পাতা।

ইদানীং সে মেয়ের বিবাহের আশা ছাড়িয়া দিয়া কামনা করিত শুধু নবদ্বীপচন্দ্রের চরণাশ্রয়। তাহার সে ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল না, হঠাৎ সে মারা গেল। নবদ্বীপেই দেহ রাখিল। হয় নাই বেশি কিছু। সামান্য জ্বর, তাও বেশি দিন নয়—চার দিন।

কামিনী সেটা বুঝিতে পারিয়াছিল। শেষের দিন সে বলিল, মরণে আমার দুঃখ নাই মহান্ত। গোরাচাঁদের চরণে মা-গঙ্গার কোলে এ আমার সুখের মরণ। তবে—

রসিক বাধা দিয়া বলিল, মিছে ভাবছ কেন রাইয়ের মা, কি এমন হয়েছে তোমার?

ঈষৎ হাসিয়া কামিনী বলিল, হয়েছে সবই। মহান্ত, তোমরা বুঝতে পারছ না, আমি কিন্তু মরণের সাড়া পাচ্ছি। আমার কি মনে হচ্ছে জান? আমি যেন তোমাদের হতে দূরে—অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। কথা বলছ তোমরা, আমি যেন শুনছি অনেক দূর হতে। শোন, মরণে আমার আক্ষেপ নাই, শুধু মেয়ের ভাবনা আমার মহান্ত। কমলির আমার কি হবে মহান্ত?

চোখের জলে রসিকের বুক ভাসিয়া গেল। সে বলিল, ভেবো না তুমি রাইয়ের মা। তাই যদি হয়, তবে তোমার কমলের ভার আমি নিলাম।

কামিনীর মুখে হাসি দেখা দিল। সে বলিল, সে আমি জানি মহান্ত। কই, কই, কমলি আমার কই?

পাশেই কমলিনী বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছিল। মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া সে অবরুদ্ধ স্বরে ডাকিল, মা!

অবশ হস্ত মেয়ের মাথায় রাখিয়া কামিনী হাসিতে হাসিতেই বলিল, কাঁদিস কেন রে বুড়ো মেয়ে? মা কি চিরদিন কারও থাকে?

কমলিনী তবুও কাঁদিল। বহুকষ্টে অবশ হস্তখানির একটি স্পর্শ মেয়ের এলানো চুলের উপর টানিয়া দিয়া মা বলিল, শোন, কাঁদিস না। যাবার সময় নিশ্চিন্ত কর।

কমলি বলিল, বল!

শোন, যে লতা গাছে জড়ায় না, সে চিরদিন ধুলোয় গড়াগড়ি যায়। জানোয়ারে মুড়ে খায় তার—

কমল বাধা দিয়া বলিল, কষ্ট হচ্ছে মা তোমার?

না। তা ছাড়া, মানুষের মুখে বড় বিষ, ওরে কলঙ্কের বিষে রাধার সোনার অঙ্গ পুড়ে গিয়েছিল। না। সে তুই সইতে পারবি না। আমায় কথা দে তুই।

সে হাঁপাইতেছিল।

কমল বলিল, কেন মা? দেবতার হাতে দিয়ে যেতে কি তোর মন সরছে না?

দরদর ধারে কামিনীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বার বার ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল, না। কমলি, আমায় নিশ্চিন্ত কর। বল, কথা দে।

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া এবার কমল বলিল, বিয়ে করব মা।

কামিনী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ!

তারপর সে দুইটি কথা কহিয়াছিল। এক সময় বলিল, বাপ-মায়ের ছেলে কেড়ে নিস না যেন।

হাসিয়া কমল বলিল, না মা।

মহান্ত তখন নাম আরম্ভ করিয়াছে, জয় রাধে রাধে—

কামিনী বলিল, গোবিন্দ গোবিন্দ!

ওই শেষ কথা।

পাঁচ

ফুল ঝড়িয়া যায় আবার ফোটে। কালের তালে তালে ঘুম-পাড়ানিয়া গানের মত বিস্মরণীর গান গাহিয়া মানুষের দুঃখের স্মৃতি ভুলাইয়া দিতেছেন মা-বসুমতী। কমলিনীও দিনে দিনে মায়ের শোক কতকটা ভুলিল। দিনের সঙ্গে সঙ্গে সে চোখের জল মুছিল, তারপর আবার হাসিল, আবার কীর্তন গাহিল। বাউল রসিক যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল! সেও সঙ্গে সঙ্গে হাসিল। ব্যথাতুর শিশু বেদনার

উপশমে কান্না ভুলিয়া হাসিলে মায়ের বুকে যে হাসি দেখা দেয়, রসিকের মুখে তেমনই হাসি দেখা দিল।

রসিক ভিক্ষা করিয়া আনে, কমল রাঁধে-বাড়ে। দিন এমনই করিয়া চলিতেছিল, মাস তিনেক পর একদিন রসিক বলিল, রাই-কমল, একটা কথা বলছিলাম।

তার কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গিতে যেন একটা কুণ্ঠা ছিল। এটুকু কমলের বড় ভাল লাগিল। চটুল রসিকতায় বাউলকে আরও সে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল।

বলিল, বল?

রসিক বলিল, বলছিলাম কি—

কমল বলিয়া উঠিল, কি বলছিলে?

রসিক আরও কুণ্ঠিতভাবে বলিল, তা হলে—

কমলিনীর হাসি স্ফুট হইয়া উঠিল, বলিল, তা হলে? কি তা হলে বল না গো? বগ-বাবাজীর গলায় কি কাঁটা আটকাল নাকি?

বিব্রত রসিক অকারণে গলাটা খাঁকি দিয়া ঝাড়িয়া লইল। বলিল, না—তা—

স্বভাবগত কলহাস্যে সমস্ত মুখরিত করিয়া কমল বলিল, তবে গলা ঝাড়লে যে?

রসিক এবার বলিয়া ফেলিল, তোমার মালাচন্দনের কথা। আমি —ধর, আমার—

কথাটা শুনিবামাত্র চঞ্চল কমলিনী এক মুহূর্তে স্থির হইয়া গিয়াছিল। একদৃষ্টে সে রসিকের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। কথাটার শেষের দিকে রসিকদাসের কুণ্ঠা দেখিয়া তবুও তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—ম্লান হাসি, বলি, তোমার?

রসিক বলিল, আমি বাউল। তা ছাড়া আমার কাছে থাকলে লোকেও মন্দ—

সে আর বলিতে পারিল না। কমল আবার ঈষৎ ম্লান হাসিয়া বলিল, গলার কাঁটাটা ঝেড়ে ফেলতে পারলে না? আচ্ছা, এ বেলাটা

সবুর কর মহান্ত, ও বেলায়—

কথাটা শেষ করিল না, তাহার পূর্বেই ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। সারাটা দিন বাহির হইল না।

রসিকদাসও সারাটা দিন বাহিরে মাথায় হাত দিয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার কিছু আগে কমল ঘর হইতে বাহির হইল।

রসিক বসিয়া ছিল পূর্বমুখে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল। সন্ধ্যার অস্তমান সূর্যের স্বর্ণাভা কমলের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু আজ তবু পদাবলীর কোন কলি মনে পড়িল না। অপরাধীর মতই রসিক বলিল, রাই-কমল!

বিচিত্র হাসি হাসিয়া কমল বলিল, মালার জন্যে যে ফুল চাই মহান্ত।

সবিস্ময়ে রসিক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমল বলিল, আজই আমার মালাচন্দন হবে মহান্ত। ফুল চাই। আয়োজন চাই।

পরম আনন্দে উঠিয়া রসিক বলিল, সুবল-সখাকে ডেকে আনি আমি।

বাধা দিয়া কমল বলিল, পরে। এখন থাক। আগে ফুল নিয়ে এস তুমি।

রসিক বালকের মত আনন্দ বিহ্বল হইয়া চলিয়া গেল। কতক্ষণ পরে সিক্তবস্ত্রে কতকগুলি পদ্মফুল লইয়া সে ফিরিল। বলিল, রাই-কমল, কমলফুলই এনেছি আমি।

আরও বোধ হয় কিছু বলিবার ছিল। কিন্তু কমলিনীর রূপ দেখিয়া সে-কথা আর রসিকদাস উচ্চারণ করিতে পারিল না। কমলের চুলের রাশি ছিল এলানো। পরনে টকটকে রাঙাপাড় তসরের শাড়ি একখানি। নাকে ক্ষীণ রেখায় আঁকা শুক্ল-প্রতিপদের চন্দ্রকলার মত রসকলিটি যেন উঁকি মারিয়া হাসিতেছিল। কপালে সন্ধ্যার গোধূলি-তারার মত শুভ্র টিপ একটি। গলায় তুলসীকাঠের মালা, হাতে দুই

গাছি রাঙা রুলি। অঙ্গে আর কোন আভরণ নাই; কিন্তু তাই যেন ভাল।

কমলিনী হাসিল।

রসিক বলিল, একটু খুঁত হয়েছে রাই-কমল। নীলাম্বরী পরলেই ভাল হত।

কমল বলিল, সে বাসরে পরব। নীল কালো বিয়ের সময় পরতে নেই যে। এখন তুমি কাপড়টা ছাড় দেখি। ওই দেখ, কাপড় রেখেছি।

রসিক দেখিল, কমলিনীর শখ করিয়া সেদিনের কেনা সেই নূতন শান্তিপুরে ধুতিখানি রহিয়াছে। পরমানন্দে কাপড়খানা সে পরিধান করিয়া বলিল, শিরোপা যে মজুরির চেয়েও দামী গো! তারপর, এইবার হুকুম কর, সুবল-সখাকে ডাকি।

চন্দন ঘষা শেষ করিয়া কমল বলিল, পরে। আগে মালা দুগাছা গেঁথে ফেলি, এস। তুমি একগাছা গাঁথ, আমি এক গাছা গাঁথি।

রসিকের আজ আর আনন্দ যেন ধরিতেছিল না। সে তাড়াতাড়ি মালা গাঁথিতে বসিয়া গেল। বলিল, খুব ভাল হবে রাই-কমল। সুবল-সখা আসবামাত্র মালা পরিয়ে দেবে। সে অবাক হয়ে যাবে।

কমলের হাতের মালা শেষ হইয়া আসিল। সে তাগিদ দিল মহান্তকে, বলি, আর দেরি কত? আমার শেষ হল যে।

রসিক রসিকতা করিয়া উত্তর দিল, রাই, ধৈর্য্যং—

তারপর সুতার গিঁঠ বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, আমার মালাও তৈরি গো।

কমলিনী আপন হাতের মালাগাছি রসিকের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, গোবিন্দ সাক্ষী।

রসিকের মুখ হইয়া গিয়াছিল বিবর্ণ পাংশু। কমল তাহাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া বলিল, এইবার তোমার মালা আমায় দাও।

এতক্ষণে রসিকের কথা সরিল। সে আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া

উঠিল, কি করলে রাই-কমল ?

কমল সুন্দর হাসি হাসিয়া বলিল, মালার প্রসাদ দেবে না আমায় ?

বলিয়া চন্দন লইয়া রসিকের জরাজীর্ণ পাণ্ডুর ললাট চর্চিত করিয়া দিল।

রসিকের চোখের দৃষ্টি ক্রমশ পরিবর্তিত হইতেছিল। এক রহস্যময় দৃষ্টিতে কমলের মুখপানে চাহিয়া সে হাসিল। তারপর আপন হাতের খসিয়া-পড়া মালাগাছি তুলিয়া লইয়া কমলের গলায় পরাইয়া দিল। তাহার সুন্দর মসৃণ তরুণ ললাটে সুন্দর ছাঁদে আঁকিয়া দিল সুবঙ্কিম রেখায় চন্দনবিন্দুর অলকা-তিলকার সারি। আঁকিতে আঁকিতে সে গাহিতেছিল—

কৃষ্ণপূজার কমল আমি রেখে দিব মাথায় করে।

কমল লীলাকৌতুকে বলিয়া উঠিল, কত দেরী তোমার ? বাসর সাজাতে হবে যে।

রসিক বলিল, না গো সখি, না। বাসর সাজাব আমি। আমাদের লীলা হবে উলটো—এ লীলায় তুমি কাঁদাবে, আমি কাঁদব।

কমল বলিল, চল, এখন গৌরাঙ্গ-মন্দিরে চল। মহান্তের কাছে যাই। যেগুলো করতে হবে, সেগুলো করা চাই তো !

রসিকদাসই বাসর সাজাইল। কমল দেখিল, বাসর সাজানো হইয়াছে—একদিকে টাটকা ফুলে, অন্য দিকে শুকনো ফুলে। কমল মুখ তুলিয়া মহান্তের দিকে চাহিল। রসিক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তুমি আর আমি।

কমল বলিল, তার চেয়ে আভারে সাজালে না কেন ? তাহার কণ্ঠস্বর যেন কাঁপিতেছিল।

রসিক অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়া বলিল, না না, শুকনো ফুল ফেলে দিই।

কমল বাধা দিল। সে শুষ্ক ফুলশয্যার উপর বসিয়া বলিল, এ

শয্যে আমার। তোমার শুকনো শয্যে হবে না, তোমার হবে টাটকা শয্যে।

কথা শেষ করিয়াই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ একটা অননুভূত তীব্রতায় জীর্ণদেহ প্রৌঢ়ের বক্ষপঞ্জরের অভ্যন্তরটা গুরগুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষীণ কম্পনের রেশে সর্ব্বদেহ কাঁপিতেছিল।

প্রৌঢ় বাউল কয় পা পিছাইয়া গেল, কম্পিত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, থাক রাই-কমল, থাক।

কমল সমান হাসি হাসিয়া কহিল, তা কি হয় গো? এ যে নিয়ম। আর আমার বিয়ের সাধ-আহ্লাদ তো একটা আছে।

ধীরে ধীরে আপনাকে দৃঢ় করিয়া লইয়া মহান্ত বিকশিত কোমল কুসুম-শয্যার উপর গিয়া বসিল। তারপর কমলের হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, রাই-কমল, আধুলির বদলে শেষে আধলার মালা গলায় গাঁথলে?

বাউল বিচিত্র হাসি হাসিল।

কমল হাসিল। বলিল, সোনায় তামায় বড় ধাঁধা লাগে গো। সোনা বলেই তো গলায় গাঁথলাম। তামা যদি হয়, তবুও জানব, ওই আমার সোনা। সোনা-তামায় তফাৎ তো মনের ভুল। এ তো শুধু আমার রইল। কদর করব আমি। পরের সঙ্গে দর করতে হাটে তো যাচ্ছি না।

ঘরের কোণে কমল ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়াছিল। প্রদীপটা জ্বলিতেছিলও বেশ উজ্জ্বলভাবে। রসিক কমলের মুখখানি পরিপূর্ণ আলোর ধারার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। কমল হাসিল।

রসিকের দেখিয়া যেন আর তৃপ্তি হয় না—আশা মেটে না। কমল বলিল, ছাড়।

সে কেমন ভয় পাইয়া গেল। জীর্ণ বাউলের বার্ধক্যমলিন চোখের কি তীব্র জ্বলজ্বলে একাগ্র দৃষ্টি!

সে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু রসিক সহসা উন্মত্তের মত

প্রবল আকর্ষণে কমলের পুষ্পিত দেহখানিকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। কমল ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ওই শীর্ণ বাহুতে যেন মত্ত হস্তীর শক্তি! কঙ্কাল যেন ফাঁসির দড়ির মত দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে!

কমলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে আর্তস্বরে প্রার্থনা করিল, মহান্ত! মহান্ত!

উন্মত্ত বাউল যেন অন্ধ বধির হইয়া গিয়াছে।

ছয়

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া কমল দেখিল, মহান্ত দাওয়ার উপর বসিয়া আছে।

কখন যে সে শয্যাত্যাগ করিয়াছে, কমল তাহা জানিতে পারে নাই। কিন্তু মহান্তের মূর্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। রক্ত-মাংসের মানুষটা যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। নিশ্চল মূক—নিষ্পলক শূন্য দৃষ্টি তাহার। চোখের কোলে কোলে দুইটি গভীর কালো রেখা দেখা দিয়াছে। শুষ্ক নদীর ভাঙন-ধরা তটরেখার মত বিগত-বন্যার বার্তা যেন তাহাতে পরিস্ফুট।

সবই কমল বুঝিল। আপনাকেই একান্তভাবে অপরাধী করিয়া কমল লজ্জায় দুঃখে এতটুকু হইয়া গেল। কতবার সান্ত্বনার কথা কহিতে গিয়াও সে পারিল না। সমস্ত প্রভাতটা সে আড়ালে আড়ালে ফিরিল।

রসিকদাসই আগে কথা কহিল। সে ডাকিল, কমল!

ডাকটা কমলের কানে কেমন যেন ঠেকিল—যেন খাটো-খাটো, কণ্ঠস্বরও যেন হিম-কঠিন। কমল তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল নতমুখে।

রসিক তাহার মুখপানে চাহিয়া কাতরভাবে বলিল, কমল, আমি মানুষ।

কমল উত্তর দিল, কেউই পাথর নয়। তবে তুমি আজ পাথর

হয়েছ দেখছি।

মহান্তের কণ্ঠস্বরে বাদল যেন ঝরিয়া পড়িল। সে বলিল, অহল্যার মত পাষাণই বুঝি হলাম কমল।

কতকালের গৃহিণীর মত কমল আপনার আঁচল দিয়া মহান্তের সজল চোখ মুছাইয়া দিল। তারপর বলিল, মালা তো ফুলেরই মালা মহান্ত, তাতেও তোমার যদি গলায় ফাঁসি লাগে, তবে তুমি ছিঁড়ে ফেল।

মহান্ত ধীর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। সে পারব না। আবার সে ঘাড় নাড়িল—না।

হাসিয়া কমল বলিল, আমার জন্যে ভাবছ? আমার জন্যে তুমি ভেবো না। গোবিন্দ তোমার একার নয়। তার হাতে ছেড়ে দিতেও কি তুমি পারবে না?

রসিক বলিল, না কমল, সে আর আমি পারব না—দেবতার পায়ে নয়, মানুষের হাতেও নয়। আমার ভিতর বাহির তুমিময় হয়ে গিয়েছে! তুমি ছাড়া আমি বাঁচব না। জান কমল, কাল রাত্রে পালাবার চেষ্টা করেছিলাম, পারি নাই। পা উঠেছে, কিন্তু চোখ ফেরাতে পারি নাই।

কমল ম্লানমুখে কহিল, কিন্তু আমি যে দুঃখে লজ্জায় মরে যাচ্ছি মহান্ত। তোমার এতদিনের ভজন-পূজন সব আমার জন্যে পণ্ড হল।

উন্মত্তের মত কমলের হাত দুইটি আপনার বুকে চাপিয়া ধরিয়া মহান্ত বলিল, যাক—যাক যাক। সংসারে আমি কিছু চাই না। শুধু তুমি যেন আমায় ছেড়ো না কমল।

প্রবল আকর্ষণে সে কমলকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।

কমল বলিল, ছাড়। ওঠ, উঠে স্নান কর। গোরাচাঁদের পূজো করে এস।

মহান্ত অকস্মাৎ হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আজন্ম-কুমার বৈরাগীর বুকের ক্ষুধা এতদিন ঘুমন্ত জনের ক্ষুধার

মত অবিচলিত ছিল। আজ আহার্য সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে জাগাইয়া তোলায় সে-ক্ষুধা অজগরের গ্রাস বিস্তার করিয়া মাথা তুলিল। সে অজগর বাউলের-আজন্ম সাধনায় অর্জিত বৈরাগ্যকে অসহায় বনকুরঙ্গের মত জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহাকে পিষিয়া মারিয়া সে তাহাকে নিঃশেষে গ্রাস করিবে। রসিকদাস শিহরিয়া উঠিল। সে যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার রসের উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। শুক-সারীর দ্বন্দ্বের গান আর জমে না। গোষ্ঠ-বিহারের সুদাম-সুবলের সখা-সংবাদ আর সে গায় না। হাসে না, কাঁদেও না, সে এক অদ্ভুত অবস্থা। মধ্যে মধ্যে একা, অথবা নিশীথ-রাত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া হাতজোড় করিয়া ডাকে; হে গোবিন্দ! হে গোবিন্দ!

ধীরে ধীরে দুইটি নরনারীর জীবন কেমন একটা স্পন্দনহীন গুমটে অসহনীয় হইয়া উঠিল। কমলেরও যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। একদিন সে বলিয়া ফেলিল, এ তো আর ভাল লাগে না মহান্ত।

মহান্ত চমকিয়া উঠিল। বিবর্ণ মুখে স্পন্দনহীন দৃষ্টিতে সে কমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমল বলিল, ঘর যে বিষ হয়ে উঠল! চল, কোথাও যাই।

গৃহত্যাগের নামে রসিক যেন একটু জীবন্ত হইয়া উঠিল। সেও বলিয়া উঠিল, তাই চল. তাই চল কমল। কোথায় যাবে বল দেখি?

বৃন্দাবন।

রসিকদাস শিহরিয়া উঠিল। বলিল, না না না। অন্য কোথাও চল, ব্রজের চাঁদকে এ মুখ আমি দেখাতে পারব না।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার সে কহিল, জান কমল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত গোরাচাঁদের মন্দিরে যাই নাই।

কমলের মরিতে ইচ্ছা করিল। আপনার পানে চাহিতেও যেন তাহার ঘৃণা বোধ হইতেছিল। সে মহান্তকেই প্রশ্ন করিল, আমার মাঝে কি এতই পাপ আছে মহান্ত?

রসিক সে-কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। একান্ত অপরাধীর মত নতমস্তকে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। কমল চোখ

মুছিতে মুছিতে আবার বলিল, বেশ, কোথাও গিয়ে কাজ নাই। চল, পথে পথেই ঘুরব আমরা।

আঃ! রসিক যেন বাঁচিয়া গেল। পথে—পথে—পথে—পথে! সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তাই চল রাই-কমল, তাই চল। আজই চল। তাহার মনে হইল, পথের ধূলার মধ্যেই কোথায় আছে যেন মুক্তি। ঘর নয় কুঞ্জ নয়, বিশ্রাম নয় অভিসার নয়, শুধু চলা।—চল, আজই চল।

কমল হাসিয়া বলিল, 'ওঠ' বলতেই কাঁধের ঝুলি! ঘর-দোরের একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো?

বাধা দিয়া রসিক বলিল, থাক থাক, পড়ে থাক ঘর-দোর! ঘর যখন আর বাঁধব না, তখন ঘর বিক্রি করে, ঘর সঙ্গে নিয়ে কি হবে? সখি, বৈরাগী বাউল—হতে হয় হারায়ে দু কুল।

কমল আর আপত্তি করিল না। সে বলিল, যা খুশি তোমার তাই কর মহান্ত।

পরাজিত বন্দী বৈরাগী মুক্তির আশায় কাঁধে ঝোলা লইয়া মাথায় বাঁধিল নামাবলী; দাড়িতে আজ আবার বিনুনি পাকাইতে পাকাইতে অভিসারের গান ধরিল।

দীর্ঘদিন পর ঘর ছাড়িয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া অকস্মাৎ রসিক হইয়া উঠিল যেন পিঞ্জরমুক্ত পাখি—প্রগাঢ় নীলিমার মধ্যে সঞ্চরমান, মুখর। রসিক পায়ে পরিয়াছে নূপুর; হাতের একতারাটিতে উঠিতেছিল অবিরাম ঝঙ্কার, সে নিজে গাহিয়া চলিয়াছিল গানের পর গান। দ্বিপ্রহরের সময় একখানা বর্ধিষ্ণু গ্রামের বাজারের মুখে পথের পাশে পুকুরের বাঁধা ঘাট দেখিয়া পথবিহারী নরনারী দুইটি ঘর পাতিল।

রসিক গাছতলা পরিষ্কার করিয়া উনান পাতিল, কাঠকুটা ভাঙিয়া সংগ্রহ করিল। তারপর ডাকিল, এস গো ঘরের লক্ষ্মী।

কমল স্নানান্তে আসিয়া বসিয়া একটু হাসিল। রান্নার ব্যবস্থায় বসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিল, ঝুলির ভাঁড়ারে যেন নুন নাই গো ঘরের কর্তা!

মহান্ত নুন আনিতে গেল। নুনের ঠোঙা হাতে ফিরিয়া দেখিল, কমলকে ঘিরিয়া দর্শকদের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে।

পরম কৌতুকে রসিকদাস দর্শকদের পিছনে দাঁড়াইল। দৃষ্টি পড়িল তাহার কমলের পানে। হাঁ, দেখিবার মত রূপ বটে। ভিজা এলোচুলের প্রান্তদেশ একটি গিঁট দিয়া ভাঁজ করিয়া মাথার উপর তোলা। আগুনের আঁচে সুন্দর মুখখানি সিন্দুরের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। নাকে রসকলি, কপালে তিলক জ্বলজ্বল করিতেছে। দর্শকদের সে দোষ দিতে পারিল না। দর্শকদের দল কিন্তু দেখিয়াই নিরস্ত ছিল না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ হইতেছিল।

প্রশ্নের কিন্তু জবাব ছিল না। কমল নীরবে মর্যাদাভরে গরবিনীর মত বসিয়া ছিল। কোন দিকেই তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

একজন বার বার প্রশ্ন করিতেছিল, কি নাম গো বোষ্টুমীর? কোথা বাড়ি?

পিছন হইতে রসিক উত্তর দিল, নাম রাই-কমল। বাস রসকুঞ্জে।

কথার শব্দে পিছন ফিরিয়া সকলে একবার রসিকের দিকে চাহিল। কে একজন প্রশ্ন করিল, ও আবার কে হে?

রসিক কমলের পাশে আসিয়া সেই লতার লাঠিটা মাটিতে ঠুকিয়া বলিল, আজ্ঞে, আমার নাম খেঁটে-হাতে আয়ান ঘোষ গো প্রভু। বোষ্টুমীর বোষ্টম গো আমি।

দর্শকের দল খসিতে শুরু করিল।

কৌতুকে মহান্ত হাসিয়াই সারা হইল। নির্জীব বৈরাগী আজ মুক্ত বায়ুর স্পর্শে যেন বাঁচিয়া উঠিয়াছে। আপনার মনে গুনগুন করিতে করিতে সে ডাকিয়া উঠিল, রাই-কমল।

কমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, তবু ভাল। কতদিন পরে আজ 'রাই-কমল' বলে ডাকলে!

ঘর-ছাড়ার কোন আনন্দে বৈরাগী আজ মাতোয়ারা, কে জানে! রসিকের শুষ্ক রসসাগর যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। স্মিতহাস্যে কৌতুকোচ্ছল চোখে সে বলিয়া উঠিল, তাই ভাল, তাই ভাল রাই-কমল,

আজ মানই তুমি কর। গেরস্থের দোরে দোরে আজ আমি মানের পালা গাইব।

কমল হাসিল। হাসিয়া বলিল, গান তুমি গাইতে পার মহান্ত, কিন্তু মান তো ভাঙাতে পারবে না। নারীর সঙ্গ বাউল-বৈরাগীর পাপ, লজ্জা—সে তো তুমি ভুলতে পারবে না।

খুব জোরের সহিত বাউল বলিয়া উঠিল, খুব পারব গো রাই-মানিনী, খুব পারব। পাপ-লজ্জা ঘরের বস্তু, ঘরেই ফেলে এসেছি। তাই তো আজ আবার তুমি আমার রাই-কমল—কৃষ্ণপূজার কমল-মালা।

পথে পথে চলে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী। গৃহস্থের দুয়ারে হাত পাতিয়া দাঁড়ায়। পথের পর পথ, গ্রামের পর গ্রাম পিছনে পড়িয়া থাকে। গঙ্গা অনেক পিছনে পড়িয়াছে। অজয়ের তীরে তীরে পথ।

চলিতে চলিতে মাস-দুই পরে একদিন কমল পথের উপর চমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। কহিল, এ কোথায় এলাম মহান্ত?

রসিক চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া শুধু বলিল, রাই-কমল!

মায়ার টানে, না, পথের ফেরে কে জানে, পথের মানুষ দুইটি এ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে?

ওই দূরে অজয়ের তীর। ঘন শরবন চলিয়া গিয়াছে কূলে কূলে। এই তো বনওয়ারীলালের রাসমঞ্চ।

বনওয়ারীলাল এখানকার প্রাচীন জমিদারের গোবিন্দ-বিগ্রহ। এই অঞ্চলে অজয়ের কূলে কূলে বনওয়ারীলালের লীলাক্ষেত্র তৈয়ারি করিয়া গিয়াছেন বনওয়ারীদেবের সেবাইত—রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, ঝুলন-কুঞ্জ। এখান হইতে ওই অনতিদূরে তাহাদের গ্রাম। ওই তো!

উভয়েই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

কমল বলিল, ফেরো মহান্ত।

রসিক ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, না রাই-কমল! মা যখন টেনেছেন, গোবিন্দ যখন এনেছেন, তখন মায়ের কোলে ত্রিরাত্রি বাস না করে ফিরব না।

তাহারা আসিয়া দাঁড়াইল রসকুঞ্জের দুয়ারে। দুয়ার বলিলে ভুল হইবে, রসকুঞ্জের ধ্বসিয়া-পড়া ভিটার প্রান্তে। মনের কোণে মমতা কোথায় লুকাইয়া ছিল, নয়ন-পথে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করিল। চোখে জল আসিল।

কমলদের আখড়ার অবস্থাও তাই। তবে অটুট আছে শুধু জোড়ালতার কুঞ্জটি, আর চারিপাশে ঘন বেষ্টনীটি। কুঞ্জতলের রাঙা মাটিতে নিকানো সেকালের সেই সুপরিচ্ছন্ন অঙ্গনটির উপর জাগিয়া উঠিয়াছে সবুজ ঘাসের আস্তরণ। পথবাসী মানুষ দুইটি সেই ছায়াতলে বসিয়া পড়িল। অনির্বচনীয় নিবিড় একটি মমতার মোহ তাহাদের মন ও চৈতন্যকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নির্বাক হইয়া বসিয়া উভয়ে চির-পরিচিত পারিপার্শ্বিকের সহিত আজ আবার যেন নূতন করিয়া পরিচয় করিয়া লইতেছে।

কতক্ষণ পর কমল বলিয়া উঠিল, বড় মায়া হচ্ছে মহান্ত। ফেলে যাবার কথা মনে করতেও কষ্ট হচ্ছে, মন যে থাকতে চাইছে।

রসিক তখন গান ধরিয়া দিয়াছে—

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইল
দেখা না হইত পরান গেলে।

কমল তাহার সঙ্গে যোগ দিল। চোখ তাহার সজল হইয়া উঠিল। গানের শেষে মহান্ত বলিল, আর যাব না রাই-কমল। বাতাসে মাটিতে আমাকেও যেন জড়িয়ে ধরছে।

কমল নীরবে আমগাছটির দিকে চাহিয়াছিল।

রসিক আবার বলিল, আমাকে কিন্তু রসকুঞ্জে থাকতে দিতে হবে।

তিক্ত হাসি হাসিয়া কমল বলিল, তাই হবে গো, তাই হবে, তোমার কুঞ্জেই তুমি থাকবে। ভয় নাই, ধ্যান তোমার ভাঙবে না।

মহান্ত বলিল, না গো না, আসব আমি। শাওনের বাদল রাতে ঝুলনায় তোমায় দোল দিতে আসব। রাসের রাতে ফুলের গয়না নিয়ে তোমার দরবারে আসব আমি। ফাল্গুনের পূর্ণিমায় আসব ফাগ-কুমকুম নিয়ে।

তীব্র ব্যঙ্গভরে হাসিয়া কমল বলিয়া উঠিল, একটি লীলা যে বাকি থাকল ঠাকুর—গিরি-গোবর্ধনধারণ।

রসিক অপ্রতিভ হইল না। কহিল, ভুল করলে যে রাই-কমল। আমি তো সে হয়ে আসব না তোমার দরবারে রাই-মানিনী। আমি হব তোমার বৃন্দে, তোমার ললিতা, তোমার মালাকর, তোমার কুঞ্জদ্বারের দ্বারী। কাঁটা দিনের কথা ভুলে যাও—হারিয়ে ফেল, মুছে দাও জলের আলপনার মত।

কমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, মালা কি সত্যিই ফাঁসি হয়ে গলায় লেগেছে মহান্ত যে ছিঁড়তেই হবে?

দূর, দূর, বাজে বকে সময় মাটি। বলি ওগো বোষ্টুমী, পেটের কথা ভাব। চল, দোরে দোরে ছুটো মেগে আসি।

মহান্ত একতারায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

ম্লান হাসি হাসিয়া কমল বলিল, চল। কিন্তু শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায় মহান্ত?

পথ চলিতে চলিতে কমল সহসা বলিয়া উঠিল, মহান্ত, আর একদিন এই কথাটাই তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, আজ আবার জিজ্ঞেস করি—আমার মাঝে কি এতই পাপ আছে?

মহান্ত পথ চলিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে হাতে বাজিতেছিল একতারা, পায়ে তালে তালে বাজিতেছিল নূপুর। একতারা নীরব হইয়া গেল, পায়ের নূপুর বাজিয়া উঠিল বেতালা। মহান্ত কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

হঠাৎ কমল দাঁড়াইল।

রসিকদাস বলিল, দাঁড়ালে যে?

কমল আপনার অঙ্গের পানে চাহিল। চিকণ উজ্জ্বল ত্বক রৌদ্রের ছটায় ঝলমল করিতেছে নিখাদ সোনার মত। বুকের নিশ্বাসে তো কই কালি নাই—কোন গন্ধ নাই? তবে? মন তাহার বলিয়া উঠিল, কোথায় পাপ? কিসের পাপ? সে আর মহান্তকে প্রশ্ন করিল না।

মহান্ত বলিল, কান্থর বাড়ি আগে যাই চল।

কমল বলিল, না। তা হলে সে আর ছাড়বে না। সমস্ত গাঁ ফিরে শেষে তার বাড়ি যাব।

প্রথম গৃহস্থের দুয়ারে আসিয়া কমলই কহিল, বাজাও মহান্ত, একতারায় সুর দাও।

দুয়ারে দুয়ারে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী গান গাহিয়া ভিক্ষা মাগিয়া ফেরে। গ্রামের জন তাহাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করে। মহান্ত গানেই উত্তর দেয়—

বল বল তোমার কুশল শুনি,
তোমার কুশলে কুশল মানি।

মেয়েরা কিন্তু ছাড়ে না। তাহারা তাহাদের কুশল শুনিয়া তবে ছাড়ে। কমলকে দেখিয়া স্মিতমুখে তাহারা বলিয়া উঠে, এ যে লক্ষ্মী-ঠাকুরুনটি হয়েছিস কমলি—অ্যাঁ!

নিজেরা দেখিয়া তৃপ্ত হয় না, তাহাদের গৃহের মধ্যে কেহ থাকিলে তাহাকেও তাহারা ডাকে, দেখে যাও গো মাসী। আমাদের সেই কমলি এসেছে, দেখে যাও।

মাসী আসিয়া কমলকে দেখিয়া বলে, নবদ্বীপের জলের গুণ আছে। কমলের মুখ লজ্জিত স্মিতহাস্যে ভরিয়া উঠে। উত্তর দেয় রসিকদাস। সে বলিয়া উঠে, সে যে গোরাচাঁদের দেশ, রূপের সায়র গো। কৌতুকচপল পল্লীর মেয়েরা পরিহাস করিতে ছাড়ে না। তাহারা বলিয়া উঠে, তা বটে। তোমারও চেহারার জলুস হয়েছে দেখছি।

কথার শেষে তাহারা মুখে কাপড় দিয়া হাসে।

রসিকদাস কিন্তু অপ্রস্তুত হয় না। স্মিতমুখে সে জবাব দেয়, কাল যে কলি গো, নইলে শুকনো গাছেও ফুল ফুটত।

মুখের চাপা কাপড় ভেদ করিয়া এবার তরুণী-কণ্ঠের অবাধ্য হাসি উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে।

রসিকের কাছে পরাজয় মানিয়া এবার আবার তাহারা কমলকে লইয়া পড়ে। জিজ্ঞাসা করে, কমলি, এখনও সোঁদা আছিস নাকি? তোর বোষ্টম কই লো?

রসিকদাসকে এবার লজ্জায় নীরব হইতে হয়। কমলই জবাব দেয় স্মিতমুখে, এই যে আমার মহান্ত।

মেয়েদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটিতেই তাহারা কলস্বরে হাসিয়া উঠে। কেহ কেহ বলিয়া উঠে, কাল কলি হলে কি হবে মহান্ত, নামের গুণ যায় নাই। শুকনো গাছেও ফুল ফুটেছে।

মহান্ত অকারণে ব্যস্ত হইয়া উঠে। বলে, ভিক্ষে দাও গো। পাঁচ-দোর ঘুরতে হবে আমাদের।

রঞ্জনদের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া মহান্ত বলিল, রাই-কমল, আজ আর থাক। দুটো পেট এতেই চলে যাবে।

কমল বলিল, বাঃ, তাই কি হয়? আমার লঙ্কার বাড়ি না গেলে বলবে কি?

এতটুকু দ্বিধার লেশ সে কণ্ঠস্বরে ছিল না। মহান্ত সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল। আনন্দোজ্জ্বল মুখ, সম্মুখপথে নিবদ্ধ দৃষ্টি কমলের। দুয়ারের পর দুয়ারে ভিক্ষা সারিয়া রঞ্জনদের দুয়ারে আসিয়া কমল বলিয়া উঠিল, মহান্ত, একি?

রঞ্জনদের বাড়িঘর সমস্ত একটা ধ্বংসস্তূপের মত পড়িয়া আছে।

মহান্ত ডাকিল, রাই-কমল!

কমল মুখ ফিরাইল, হাসিয়া বলিল, বল?

মহান্ত বলিল, ফিরি চল।

কমল হাসিয়া বলিল, চল।

পথে দাঁড়াইয়া ছিল একটি মেয়ে। সঙ্গে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। সে অকস্মাৎ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, মাথা খাব তোমার, নাকে ঝামা ঘষে দোব। এত দেমাক তোর কিসের লা? আমাকে হেনস্তা—কেন, কেন, শুনি?

কমল বলিল, কাদু!

কাদু আবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, কাদু কিসের লা? বল ননদিনী। তারপর সহসা স্নেহকোমল স্বরে অনুযোগ করিয়া বলিল, এই

দুপুর-রোদে কম্মভোগ দেখ দেখি। বলি, আমি কি আজ খেতে দিতে পারতাম না? আয় আয়, জল খাবি আয়। এস গো মহান্ত। না, তুমি বুঝি আবার দাদা হয়েছ। বলিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সাত

কান্থ সমারোহের সহিত জলখাবারের আয়োজন করিয়াছিল। দাওয়ায় বসাইয়া সে নিজে পাখার বাতাস দিতে বসিল।

তারপর মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, শেষকালে এঁদো-পুকুরে ডুবে মলি ভাই বউ। ওই বগ-বাবাজী—বুড়ো খগের গলায় মালা দিলি?

কমল মুখ তুলিল, ঠোঁট দুইটি তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

সবিস্ময়ে কান্থ বলিল, বউ!

লঙ্কা—আমার লঙ্কার বাড়ি! কান্নার আবেগে কমলের কথা শেষ হইল না। চোখের কোল দুটি তখন পরিপূর্ণ অশ্রুভারে উথলিয়া উঠিয়াছে।

দারুণ ঘৃণার সহিত কান্থ বলিয়া উঠিল, তাঁর নাম আমার কাছে করিস না। ছি-ছি-ছি!

কমল কিছু বুঝিতে পারিল না। কান্থ আবার বলিল, পরীকে মনে আছে তোর? পরী বিধবা হল তোরা এখান থেকে যাবার কিছুদিন পরেই। সেই পরীকে নিয়ে রঞ্জন দেশান্তরী হল। রঞ্জনের বাবা, রঞ্জনের মা লজ্জায় ঘেন্নায় কাশী চলে গেল। সেইখানেই তারা মরেছে।

কমল মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। চোখের সম্মুখে তাহার মাটি যেন পাক খাইয়া ঘুরিতেছিল। তাহার বুকের মধ্যে তুফান বহিতেছিল। হায়, এত বড় বঞ্চনায় সে বাঁচিবে কি করিয়া?

কান্থ বলিল, তার জন্যে দুঃখ করিস না বউ। সে যে তোর মোহ

এড়িয়েছে, সেই তোর ভাগ্যি। তার বাপ-মায়ের মৃত্যুর পর সে এখানে একবার এসেছিল বিষয় বিক্রি করতে। কি বললে আমাকে জানিস ?

কমল মাটির দিকে চাহিয়া ছিল—মাটির দিকেই চাহিয়া রহিল। কানু বলিল, দেখলাম, রঞ্জন বোষ্টম হয়েছে! আমি একদিন ডেকে বললাম, আচ্ছা রঞ্জনদা, বোষ্টমই যদি হলে, তবে কমলকে দেশান্তরী করলে কেন? তাকে তুমি ভুললে কি করে? আমায় উত্তর দিলে, কানু, পরী খুব ভাল মেয়ে, তুমি জান না! আর সে ছেলেবেলার খেলাধূলার কথা ছেড়ে দাও। বয়সের সঙ্গে তফাত হলেই সব ভুলে যেতে হয়।—ও কি, ও কি ভাই, কিছুই যে খেলি না! না না, একটা মণ্ডা অন্তত খা।

হাসিবার চেষ্টা করিয়া কমল বলিল, রুচছে না ভাই ননদিনী, ননদিনীর দেওয়া মিষ্টি মুখে রুচছে না। তেতো নয়, বিষ নয়, ননদিনীর হাতের মিষ্টি কি মুখে ভাল লাগে! যে খবর দিয়েছিস, তাতেই পেট ভরেছে। তারপর গম্ভীরভাবে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আজ থাক ভাই। পালাচ্ছি না তো। কত খাওয়াবি খাওয়াস পরে।

কানু তাহার বুকের তুফানের সন্ধান পাইয়াছিল। সে আর জেদ করিল না। কমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভিক্ষার ঝুলিটি মেলিয়া ধরিল। রহস্যের ভানে সে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

ভিক্ষার ঝুলিটি প্রসারিত করিয়া সে বলিল, ভিক্ষে পাই ননদিনী-ঠাকরুন।

কানুর কিন্তু চোখে জল আসিল। সে বেদনাভরেই কহিল, শেষ-ভিক্ষে তো দিয়েছি বউ, ননদিনীর কাজ তো করেছি।

কমল হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসি এত ব্যর্থ, এত মেকি যে, তাহার নিজের চোখেই জল আসিল।

কানু বলিল, আমার কাছে লুকোচ্ছিস বউ? তা লুকোতে পারিস। আমাকে তা হলে তুই পর ভাবিস!

কমল তাহার হাত দুইটি ধরিয়া শুধু বলিল, কানু!

মুখরা কাহুর মুখে ম্লান সকরুণ হাসিটি বিচিত্র শোভায় ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, তা হলে তুই আর আমার কাছে তোর দুঃখ লুকোতে চেষ্টা করতিস না। মা হ'স নাই তুই বউ, নইলে বুঝতে পারতিস, খাঁটি ভালবাসায় মানুষের কাছে মানুষের কিছু গোপন থাকে না। কথা-না-ফোটা ছেলে কাঁদে। মা বুঝতে পারে, কোনটা তার ক্ষিদের কান্না, কোনটা রোগের কান্না, কোনটা রাগের কান্না। চোখের জল তোর গাল বেয়ে ঝরল না, কিন্তু আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, সে-জলে বুকের ভেতর তোর সায়র হয়ে গেল।

কমল নতমস্তকে এ তিরস্কার মাথা পাতিয়া লইল। এতক্ষণে চোখের জল মুক্তধারায় পায়ের তলার মাটি সুসিক্ত করিয়া তুলিল।

রসিকদাস বাহিরে বসিয়া পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ করিতেছিল। সে আবার বাহির হইতে সাড়া দিয়া উঠিল, ননদ-ভাজে এত গলাগলি কিসের গো ?

কমল তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, যাই আমি ননদিনী।

কাহু বলিল, আজ এইখানে রান্নাবান্না কর।

না, আজ নয়। বহুদিন পরে ভিটের কোলে ফিরে এলাম ভাই। আজ ভিটের মাটিতেই পাতা পেড়ে খাব।

কাহু আর আপত্তি করিল না।

লতামণ্ডপের তলদেশটিতে কমল সে-দিনের মত গৃহস্থালী পাতিল। মহান্ত মুদীর দোকানে কয়টা জিনিস আনিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া দেখিল, ইটের উনান তৈয়ারি করিয়া ঝরা পাতার ইন্ধনে কমল ফুঁ পাড়িতেছে। মুখখানি রক্ত-রাঙা, চোখের জলে নিটোল গাল দুইটি চকচক করিতেছে।

মহান্ত যেন কেমন হইয়া গেল। কমলের বুকের উচ্ছ্বাসের সংবাদ তাহারও অজ্ঞাত ছিল না। একটা প্রবচন আছে, 'ছেলে কোলে মরে জলে ফেলব ; তবু না পোষ্যপুত্র দিব'। বৈরাগীর অন্তরের স্বামিত্বটুকু

এমনই একটি ঈর্ষার আগুনে জ্বলিয়া মরিতেছিল। তাহার জিহ্বাগ্রে কয়টা কঠিন কথা আসিয়া পড়িল। সে বলিয়া ফেলিল, বলি, ও চোখের জল ধোঁয়ার, না, মায়ার গো রাই-কমল?

মুহূর্তে আহত ফণিনীর মত উগ্র ভঙ্গীতে কমল মুখ তুলিয়া মহান্তের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিল। কিন্তু বিচিত্র রাই-কমল, দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিতে তীব্রতা তাহার কোথায় মিলাইয়া গেল! ছলছল চোখে, সকরুণ হাসি হাসিয়া কমল ধীরে ধীরে কহিল, মায়াই বটে মহান্ত।

মহান্ত বিষণ্ণ হাসি হাসিল, কোন উত্তর দিল না। কতক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমাকে বিদায় দাও তুমি।

কমল স্থিরদৃষ্টি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল, তারপর আবার মুখ নামাইয়া কাজে মন দিল।

মহান্ত কমলের হাত ধরিয়া অতি কোমল কণ্ঠে কহিল, রাই-কমল!

কমল হাতখানা টানিয়া লইল। বিদ্যুৎ-ঝলকের মত প্রখর হাসি কমলের অধরে জাগিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। সে বলিল, আমার মধ্যে পাপ আছে মহান্ত।

অতি সুন্দর হাসি হাসিয়া মহান্ত বলিল, না না কমল। পাপ তোমার নয়, পাপ আমার। আমাকে বিদায় দাও তুমি।

কমল বলিল, না। আবার সে নীরবে উনানের ধূমায়মান আগুনে ফুঁ পাড়িতে লাগিল। সেই দিকে চোখ ফিরাইয়া মহান্ত এক সময় আপন মনেই গাহতে লাগিল—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।

গান থামাইয়া মহান্ত ডাকিল, রাই-কমল!

কমল সে আহ্বান গ্রাহ্য করিল না। মহান্ত হাসিমুখেই বলিল, বৈষ্ণবী, একটা প্রাণের কথা শোন—

সখি, সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।

আট

এই ঘর ভাঙিয়া বাউল ও বৈষ্ণবী একদিন পথে বাহির হইয়াছিল, সঙ্কল্প ছিল, আর কখনও ফিরিবে না। আবার পথের ফেরে সেইখানে ফিরিয়া দুইটা দিন থাকিবার জন্য গাছতলায় সংসার পাতিয়াছিল। সে সংসার আর তাহারা ভাঙিতে পারিল না। কমল যেন বাসা বাঁধিতে বসিল। রসিকদাসও বলিল না, চল, বেরিয়ে পড়ি। কয়েক মাস না যাইতে ভাঙা ঘর পরম যত্নে তাহারা আবার গড়িয়া তুলিল। মায়ের কোলের মমতার জন্য, না, পথের বুকেও সুখ পাইল না বলিয়া, সে-কথা তাহারাও হয়তো বেশ বুঝিল না।

পাশাপাশি দুইখানি আখড়া আবার গড়িয়া উঠিল। নীড় রচনার সমারোহের মধ্যে দিনকয়েক বেশ আনন্দেই কাটিয়া গেল। মহান্ত কাটিল মাটি, কমল বহিল জল, মহান্ত দিল দেওয়াল, কমল আগাইয়া দিল কাদার তাল। মহান্ত ছাইল চাল, কমল লেপিল রাঙা মাটি। মহান্ত বসাইল দুয়ার জানালা, কমল দুয়ার জানালার পাশে পাশে রচনা করিল খড়ি ও গিরিমাটির আলপনা। নীড় সম্পূর্ণ হইল, সে নীড়ের দুয়ারে আবার অতিথি দেখা দিল। সেই পুরানো বন্ধু—ভোলা, বিনোদ, পঞ্চানন্দ। সন্ধ্যায় কীর্তনের আসর বসে! তাহারা আনন্দ করিয়া চলিয়া যায়! কমল রাঁধিয়া বাড়িয়া ডাকে, মহান্ত।

মহান্ত তখন চলিয়া গিয়াছে। রসকুঞ্জে আসিয়া কমল বলিল, না খেয়ে যে চলে এলে?

কণ্ঠস্বরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ক্রোধ ও অভিমান।

রসিক হাসিয়া বলিল, শরীর ভাল নাই কমল।

কমলের কণ্ঠস্বরের ভঙ্গী পরিবর্তিত হইয়া গেল। সে আশঙ্কাভরে জিজ্ঞাসা করিল, কি হল গো? জ্বর-টর হবে না তো? কই, দেখি, গা দেখি?

কিন্তু নিত্যনিয়মিত ব্যাধি হইলে, সে ব্যাধির স্বরূপের সহিত মানুষের পরিচয় হইয়া যায়।

কয়দিন পর কমল সেদিন বলিল, দেহেই হোক আর মনেই হোক মহান্ত, ব্যাধি পুষে রাখা ভাল নয়। ব্যাধি তুমি দূর কর।

রসিকদাস শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কমল বলিল, সেদিন তুমি বলেছিলে, বিদায় দাও। সেদিন পারি নাই। আমার যা হবে হোক মহান্ত, তোমাকে আমি বিদায় দিচ্ছি।

রসিক চমকিয়া উঠিল, বলিল, এ কথা কেন বলছ কমল?

ক্লিষ্ট হাসি হাসিয়া কমল বলিল, ব্যাধি তো তোমার আমি মহান্ত। ব্যাধিকে বিদায় করাই ভাল।

রসিক মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পর সে ডাকিল, কমল, রাই-কমল!

জনহীন প্রাঙ্গণ নিথর পড়িয়া, কমল বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে! কথাটি বলিয়া সে আর অপেক্ষা করে নাই।

পরদিন হইতে রসিকদাস যেন উৎসব জুড়িয়া দিল। মুখে তাহার হাসির মহোৎসব—আখড়ায় মানের মহোৎসব! ভোলা আসিলে মহান্ত আহ্বান করে, এস ভোলানাথ, গাঁজা তৈরি। ভোলা পরমানন্দে বলে, লাগাও মহান্ত দম লাগাও।

কলরবের স্পর্শ পাইয়া কমল মুখর হইয়া উঠে। ভোলার তৎপরতা দেখিয়া তাহার হাসি উচ্ছল হইয়া ভাঙিয়া পড়ে। পঞ্চানন আসিলে সে বলিয়া উঠে, তুমি নাম-গান কর পঞ্চানন।—বলিয়া সে নিজেই গান ধরিয়া দেয় বাউলের সুরে—

গাঁজা খেয়ে বিভোর ভোলা—
পঞ্চাননে গায় হরিনাম—পঞ্চানন—ভোলা—

ভোলা ধরে খোল, মহান্ত করতাল লইয়া দোহারকি করে। দেখিতে দেখিতে কীর্তন জমিয়া উঠে। এমনই করিয়া আবার দিনকয়েক বেশ কাটিয়া গেল। সেদিন কমল ভোলাকে বলিল, ভোলা দুখানা কাঠ কেটে দে না ভাই।

ভোলা কুড়ুল লইয়া মাতিয়া উঠিল। কাঠ কাটিয়া ভোলা বলিল, মজুরি দাও কমল।

এখন ফুলের সময় নয় রে ভোলা, নইলে ফুলের ঢেলা ছুঁড়ে মজুরি দিতাম। কথাটা শেষ করিয়া কমল খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল, মনে পড়ে তোর ?

ভোলাও হাসিল। বলিল, খুব।

রাত্রিতে নামকীর্তনের আসর ভাঙিয়া গেল। সকলে চলিয়া গেলে ভোলা তামাক সাজিতে বসিল। মহান্ত খাওয়া শেষ করিয়া উঠিল। ভোলা তখনও তামাক টানিতেছিল।

মহান্ত বলিল, ভোলানাথ, এস।—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ভোলা পরম ঔদাস্যভরে বলিল, বসি আর একটু !

কিছুক্ষণ পর মহান্ত আবার ফিরিয়া আসিল, আমার কল্‌কেটা ? কল্‌কে লইয়া মহান্ত কমলকে বলিল, রাত অনেক হল রাই-কমল।

উত্তর হইল, জানি মহান্ত।

মহান্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমন উত্তর সে প্রত্যাশা করে নাই।

কমল এবার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, ফুল মাথায় তোলবার আগে তাতে পোকা আছে কি না বেছে নিতে হয় মহান্ত। নইলে শিরে দংশন যদি হয়, তাতে আর ফুলেরই বা কি দোষ, পোকারই বা কি দোষ।

ফুল তো—কথাটা বলিতে গিয়া মহান্ত থামিয়া গেল। আবার সঙ্গে সঙ্গেই একমুখ হাসিয়া সে বলিল, গোবিন্দের নির্মাল্য রাই-কমল, তাতে কীটই থাক আর কাঁটাই থাক, মাথা ভিন্ন রাখবার আর ঠাঁই নাই আমার।

কমল বলিল, কালি মাখিয়ে সাদা ঢাকা যায় মহান্ত, কিন্তু কালি মাখিয়ে আলো ঢাকা যায় না। ফুল তুমি নিজে মাথায় তোল নাই, সে কথা একশো বার সত্যি। আজ তোমায় জোড়-হাত করে বলছি, আমায় রেহাই দাও।

মহান্ত কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ভোলা গাঁজা খাইয়া বম হইয়া বসিয়াছিল। কমল ভোলাকে কহিল, বাড়ি যা ভাই ভোলা।

ওদিকে রুদ্ধ ঘরের মধ্যে মহান্ত প্রৌঢ় বাউল অন্তরবাসী গোবিন্দের পায়ে মাথা কুটিতেছিল, গলার মালা আমার মাথায় তুলে দাও প্রভু, মাথায় তুলে দাও।

কিছুক্ষণ পরে উন্মত্তের মত নির্জন ঘরখানি মুখরিত করিয়া বলিয়া উঠিল, না না, আমায় রূপ দাও। শ্যামসুন্দর, আমায় সুন্দর করে দাও। আমার সাধনা-পুণ্য সব নাও।

উন্মত্ততার মধ্যে এই একান্ত কামনা জানাইয়া সে শয়ন করিল।

প্রভাতে তখন তাহার সে উন্মত্ততা শান্ত হইয়া আসিয়াছে কিন্তু দুরাশার মোহ যেন কাটে নাই, প্রভাতের আলোকে আপনার অঙ্গপানে সে চাহিয়া দেখিল। তাহার সেই কুরূপ তাহার একান্ত প্রত্যাশিত দৃষ্টিকে উপহাস করিল।

পরদিন সমস্ত দিনটা সে কমলের আখড়া দিয়া গেল না। কি তাহার মনে হইল, কে জানে, বাহির করিয়া বসিল বাউলের পথ-সম্বল বড় ঝুলিটা। কয়টা স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে রঙিন কাপড়ের তালি দিতে বসিল।

ভোলা আসিয়া ডাকিল, কমল ডাকছে মহান্ত. এখনই চল।

মহান্ত গাঁজার পুরিয়া বাহির করিয়া দিয়া বলিল, তোয়ের কর।

কমলের আজ্ঞাপালনের তাগিদ ভোলানাথ ভুলিয়া গেল। গাঁজা খাইয়া সে কথা তাহার মনে পড়িল। সে ডাকিল. এস।

কাঁধে ঝোলাটা ফেলিয়া মহান্ত উঠিল। কিন্তু পথে বাহির হইয়া বিপরীত মুখ ধরিয়া সে বলিল, কমলকে বলো, আমি ভিক্ষায় বেরুলাম।

ভোলা অবাক হইয়া বলিল, যাঃ গেল, গাঁজাখোরের রকমই এই।

সন্ধ্যায় আখড়াটা সেদিন কেমন ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। প্রদীপের আলোকে আড্ডার লোক কয়টি বসিয়া গল্প করিতেছিল। কমল ঘরের মধ্যে শুইয়া আছে। কীর্তনের আসর আজ বসে নাই। রসিকদাস আসিয়া বলিল, একি ভোলানাথ, কীর্তনের আসর খালি যে?

ভোলা বলিল, বোষ্টমীর অসুখ। মাথা ধরেছে।

বোষ্টম তো আছে, এস এস।

রসিকদাস মৃদঙ্গটা পাড়িয়া বসিল। কিন্তু তবুও আসর জমিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই আসর শেষ হইয়া গেলে মহান্ত আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, রাই-কমল!

কমল নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল—কোন উত্তর করিল না। বিছানার পাশে বসিয়া মহান্ত আবার ডাকিল, কমল! রাই-কমল!

আমার মাথা ধরেছে মহান্ত।

কমলের ললাটখানি স্পর্শ করিয়া মহান্ত বলিল, মাথায় হাত বুলিয়ে দোব রাই-কমল?

রুদ্ধস্বরে কমল বলিয়া উঠিল, না না না। তোমার পায়ে পড়ি মহান্ত। আমায় রেহাই দাও।

বহুক্ষণ নীরবতার পর মহান্ত ধীরে ধীরে বলিল, পারছি না রাই-কমল। আজ গোবিন্দের মুখ মনে করে পথে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদূর না যেতেই গোবিন্দের মুখ ভুলে গেলাম। মনে পড়ল তোমার কমল-মুখ। হাজার চেষ্টা করেও শ্রীমুখ মনে আর এল না।

কমল বলিল, এত বড় পাপ আমার মধ্যে আছে যে, আমার মুখ মনে করলে গোবিন্দের মুখ মনে পড়ে না মহান্ত?

মহান্ত নতমুখে বসিয়া রহিল। কমল বলিয়া গেল, তোমার আগুনে তুমি কতটা পুড়লে তা জানি না মহান্ত; কিন্তু পুড়ে মলাম আমি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মহান্ত উঠিয়া চলিয়া গেল।

কমল উঠিল পরদিন সকালে। সঙ্কল্প লইয়া শয্যাত্যাগ করিল, মহান্তের হাতেই আজ নিঃশেষে নিজেকে তুলিয়া দিবে। আর সে পারে না; এ আর তাহার সহ্য হইতেছে না। দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিতেই তাহার নজর পড়িল, রঙিন কাপড়ে বাঁধা ছোট্ট একটি পোঁটলা দরজার পাশেই কেহ যেন রাখিয়া দিয়া গিয়াছে। একটু ইতস্তত করিয়া সেটি তুলিয়া লইয়া সে খুলিয়া ফেলিল। লাল পদ্মের পাপড়ির শুকনো একগাছি মালা। মালাগাছি হাতে করিয়া সে

নীরবে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বেলা অগ্রসর হইয়া চলিল। ভোলা আসিয়া তামাকের সরঞ্জাম পাড়িয়া বসিল। তামাক সাজিতে সাজিতে সে প্রশ্ন করিল, কই, মহান্ত গেল কোথা? আখড়ায় তো নাই।

কমল বলিল, জানি না।

তামাক খাইয়া ভোলা উঠিয়া গেল, আসর জমিল না। স্নানের সময় কাহু আসিয়া ডাকিল, বউ!

সচকিতের মত উঠিয়া কমল বলিল, চল যাই।

ঘড়া-গামছা লইয়া সে কাহুর সঙ্গে চলিল। কাহু প্রশ্ন করিল, ওটা আবার কি বউ, রঙিন কাপড়ে জড়ানো?

কমল বলিল, মালা। জলে বিসর্জন দিয়ে আসব ভাই।

কাহু বিস্মিতের মত কমলের মুখের উপর চাহিয়া রহিল। কথাটা সে বুঝিতে পারিল না। কমল বলিল, মহান্ত কাল রাত্রে চলে গেছে ননদিনী। এ মালা আমি তার গলায় দিয়েছিলাম।

কাহু বলিল, ছিঃ, মহান্তকে আমি ভাল মানুষ মনে করতাম। তার—

কমল বাধা দিল, কহিল, না না। তুই জানিস না ননদিনী, তুই জানিস্ না। চোখে তাহার জল আসিল। চোখ মুছিয়া আবার বলিল, তা ছাড়া সে আমার গুরু, তার নিন্দে আমায় শুনতে নাই।

নীরবে পথ চলিতে চলিতে কমল আবার বলিল, তোর সংসারের লক্ষ্মীর কৌটো যদি কেউ সিঁদ কেটে চুরি করে কাহু, তবে সে ঘরে সংসার পাততে কি সাহস হয়, না মন চায়?

কাহু বলিয়া উঠিল, ওসব কি অলুক্ষণে কথা বলিস তুই বউ—ছিঃ!

কমল হাসিয়া বলিল, বাউলের সংসারের গৃহদেবতা চুরি গিয়েছে ননদিনী।

আবার কিছুক্ষণ পর সে বলিল, সে থাক, তার শ্যামকে সে ফিরে পাক।

নয়

ইহার পর কমল যেন আর-এক কমল হইয়া উঠিল। মহান্ত চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান সে করিল না। কাহাকেও করিতেও বলিল না! কেহ তাহাকে বারেকের জন্য বিষণ্ণ হইয়া থাকিতে দেখিল না। রাত্রে ঘুমাইয়া কাঁদে কি না, সে কথা ভগবান জানেন। সকালে উঠে কিন্তু সে হাসিমুখ লইয়া, সে হাসি অহরহই তাহার মুখে লাগিয়া থাকে। সামান্য কারণে হাসিতে গানে উল্লাসে সে যেন উথলিয়া উঠিল। দেহলাবণ্যের মার্জনবিন্যাস আরও বাড়িয়া উঠিল। কোঁকড়া কোঁকড়া ফুলো ফুলো একপিঠ চুল তাহার। সে-চুল সে পরিপাটি বিন্যাস করিয়া রাখালচূড়া বাঁধে। ঈষৎ বাঁকা নাকটির সুবঙ্কিম মধ্যস্থলেই শুভ্র তিলক-মাটি দিয়া একটি সূক্ষ্ম রসকলি আঁকে। তাহারই ঠিক উপরে কালো রেখা দুইটির মধ্যস্থলে সযত্নে তিলক-মাটিরই একটি টিপ পরে। গলায় থাকে তুকন্ঠি মিহি তুলসীকাঠের মালা। দেখিয়া দেখিয়া ভোলা বলে, শোভা কি মালার গুণে, শোভা হয় গলার গুণে।

ঘাড়টি দুলাইয়া কমল মৃদু মৃদু হাসে।

আখড়ার সেই উৎসব-সমারোহ যেন বাড়িয়া গিয়াছে।

ভোলা আসে, বিনোদ আসে, পঞ্চানন আসে, আরও অনেকে আসে। দিনে দিনে তাহাদের দলবৃদ্ধি হয়। কিশোর যাহারা তাহাদের কেহ আখড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিলে কমল তাহার হাত ধরিয়া লইয়া যায়। প্রৌঢ়রা কেহ দুই-চারদিন আখড়ার সুমুখ দিয়া আনাগোনা করিলে পঞ্চম দিনে কমল তাহাকে ডাকে, এস মোড়ল, পায়ের ধুলো দিয়ে যাও। সন্ধ্যায় কমল গান ধরে, অপর সকলে দোহারকি করে। প্রহরখানেক রাত্রে আখড়া ভাঙে। কমল বলে, এইবার বাড়ি যাও সব ভাই। সবাই উঠি উঠি করে, কিন্তু কেহই যাইতে চায় না। কমল একে একে হাত ধরিয়া আখড়ার বাহিরে পথের উপর আনিয়া বলে কাল সকালেই ঠিক এসো যেন। বাড়ি

ফিরিয়া কমল ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। কিছুক্ষণ পরে ভোলা ডাকে, কমলি! কমলি! কাহারও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। কোন কোন দিন সাড়া মিলে ঘরের মধ্য হইতে। কমল বলে, তুই আবার ফিরে এসেছিস?

ভোলা বলে, একবার তামাক খাব ভাই, দেশলাইটা দে।

উত্তর আসে, বাড়িতে—বাড়িতে তামাক খেগে যা। বউ সেজে দেবে।

ভোলা ডাকে, কমল!

কমল বলিয়া উঠে, দেখছিস বঁটি, আমায় বিরক্ত করবি তো নাক কেটে দোব। যা বলছি, বাড়ি যা। তোর বউয়ের, তোর মায়ের গাল খেতে পারব না আমি।

সত্যই ভোলার মা, শুধু ভোলার মা কেন, গ্রামের গৃহস্থজন সকলেই কমলকে গালাগালি দেয়। বলে, ছি! এই কি রীতিকরণ? রঞ্জনকে দেশছাড়া করলে, মহান্তকে তাড়ালে, আবার কার মাথা খায় দেখ। যাকে দশে বলে ছি, তার জীবনে কাজ কি?

সমস্তই কমলের কানে পৌঁছায়, লোক স্বল্প দূরত্ব রাখিয়া সমস্তই তাহাকে শুনাইয়া বলে। এ ঘাটে কমল স্নান করে, কথা হয় পাশের ঘাটে। কমল পথ চলে, পিছনে থাকিয়া লোকে কথা বলে। কমল পিছনে থাকিলে তাহার আগে থাকিয়া লোকে ওই কথা বলিয়া পথ চলে।

কমলের হাসিমুখ আরও খানিকটা হাসিতে ভরিয়া উঠে। সেদিন ভোলার মা তাহাকে ডাকিয়াই বলিল, মর মর তুই মর।

কমল হাসিল, বলিল, মনুষ্যজন্ম বহু ভাগ্যে হয়েছে, সাধ করে কি মরতে পারি, না মরতে আছে?

ভোলার মা স্তম্ভিত হইয়া গেল। কমল কথা না বাড়াইয়া হাসিমুখেই চলিয়া গেল।

ভোলার মা পিছন হইতে আবার ডাকিল, শোন, শোন।

কমল বলিল, মাখন মোড়লের নতুন জামাই এসেছে খুড়ীমা—

জামাই দেখতে যাচ্ছি, পরে শুনব।

মাখন মোড়লের বাড়িতে নূতন জামাইয়ের আসর হাসিতে গানে রসিকতায় গুলজার করিয়া দিয়া হঠাৎ সন্ধ্যার মুখে সে উঠিয়া পড়ে।

জামাই বলে, সে কি, এর মধ্যে যাবে কি ঠাকুরঝি? এই সন্ধ্যে লাগল।

কমল হাসিয়া বলে, আমার যে আয়ান ঘোষের একটি দল আছে ভাই শ্যামচাঁদ। ফিরতে দেরি হলে ঘর-দোর ভেঙে তছনছ করে দেবে হয়তো।

ব্যাপারটা চরমে উঠিল একদিন। গ্রামের নগদী আসিয়া বলিল, পান আছে বোষ্টুমী? গোটা পান চাইলে গোমস্তা। জমিদার এসেছেন, পান আনতে ভুল হয়েছে। গোটা পান দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াও, তাহার কি মনে হইল, সে পানের বাটা লইয়া পান সাজিতে বসিল। একখানি ঝকঝকে রেকাবিতে পানের খিলিগুলি সাজাইয়া পাশে একটু চুন, কিছু কাটা সুপারি রাখিয়া হাসিমুখে সে কাছারিতে গিয়া হাজির হইল। রেকাবিটি সামনে নামাইয়া রাখিয়া গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিল। জমিদার সবিস্ময়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে কমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কমল হাসিয়া বলিল, আমি আপনার প্রজা—কমলিনী বোষ্টুমী। নগদী গেল গোটা পানের জন্যে। পান কি পুরুষমানুষে সাজতে পারে! তাই সেজে আনলাম।

জমিদার একটি পান তুলিয়া মুখে দিয়া বলিলেন, বাঃ! কেয়ার গন্ধ উঠছে দেখছি!

কমল হাসিয়া বলিল, আপনার পান এলে পাঠিয়ে দেবেন, আমি সেজে দোব।

সে জমিদারকে আবার একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতেছিল। জমিদার বলিলেন, পান সেজে তুমি দিয়ে যাবে কিন্তু।

কমল হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আমি?

হ্যাঁ। তোমার পান যেমন মিষ্টি, হাসি তার চেয়েও মিষ্টি। গানও নাকি তুমি খুব ভাল গাও শুনেছি।

বৈষ্ণবী তাহার ঘোমটা ঈষৎ একটু বাড়াইয়া দিয়া বলিল, ভিখিরীর ওই তো সম্বল প্রভু। জমিদারকে সে গান শুনাইল।

আশ্চর্যের কথা, সেইদিন সন্ধ্যায় তাহার আখড়ায় কেহ আসিল না। ভোলাও না।

কমল ঠাকুরঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া বসিল।

দিন কয়েক পর।

জমিদার চলিয়া গিয়াছেন ভোররাত্রে। সকালবেলাতেই গ্রামখানা উচ্চ চীৎকারে মুখরিত হইয়া উঠিল। কোথাও কলহ বাধিয়াছে।

কলহ বাধিয়াছে কাতুর সঙ্গে ভোলার মায়ের। কাতু অনেক দিন হইতেই কমলের সম্পর্কে লোকে কটু কথা বলে শুনিয়া আসিতেছিল, শুনিয়া সে জ্বলিয়া যাইত। কমল তাহাকে বলিত, ছি! লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে নাই। আজ জমিদার চলিয়া যাইতেই লোকে ওই পান দেওয়া এবং গান গাওয়া লইয়া নানা কথা কহিতে শুরু করিয়াছে ভোরবেলাতেই। ঘাটে কাতু সেই কথা লইয়া ঝগড়া বাধাইয়াছে। সে আর সহ্য করিতে পারে নাই।

একা ভোলার মা নয়, বিনোদ-পঞ্চাননের মাও ছিল। আরও ছিল দুই-চারিজন স্পষ্টভাষিণী প্রতিবেশিনী। কিন্তু কাতুর জিহ্বা ও কণ্ঠের তীব্রতার কাছে তাহাদিগকে হার মানিতে হইল। সত্য সত্যই এ যেন লঙ্কাকাণ্ড, কি কুরুক্ষেত্র! কিন্তু কাতুর এক নিক্ষেপে 'লক্ষ বাণ ধায় চারিভিতে'।

কমল আসিয়া কাতুকে টানিয়া লইয়া গেল আপনার বাড়ি। কহিল, ছি!

কাতু উগ্রভাবেই বলিল, ছিঃ? 'ছি' কেন শুনি? যে চোখ সংসারে খারাপ বই দেখে না, তার মাথা খাব না? তাদের জিভ খসে যাবে না?

কমল হাসিল। বলিল, বলুক না।

না। বলবে কেন? কেন বলবে শুনি? কোন চোখখাগীর—?

সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া কমল বলিল, আমার মাথা খাবি।

কানু বলিল, তোর মাথা খাব না ভেবেছিস? তোর মাথাও খাব। জাঁতি দিয়ে তোর চুলের রাশ কাটব, ঝামা দিয়ে নাকের রসকলি তুলব, তবে আমার নাম ননদিনী।

কমল হাসিয়া বলিল, তাই আন। পরের সঙ্গে কেন বাপু?

কানু ও-কথায় কান দিল না। কানু কমলের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া মুগ্ধনেত্রে দেখিতে দেখিতে বলিল, দেখ দেখি, এই রূপে চোখ-খাগীরা কু দেখে? পোড়ামুখীদের কালো হাঁড়িমুখ, না, পোড়াকাঠ?

কমল ননদিনীর গালে একটি টোকা মারিয়া বলিল, আবার? তারপর সে মৃদুকণ্ঠে গান ধরিয়া দিল—

> ননদিনীর কথাগুলি নিমে গিমে মাখা,
> কালসাপিনী-জিহ্বা যেন বিষে আঁখাবাঁকা।
> আমার দারুণ ননদিনী—

কানু একটু হাসিল। কমল বলিল, ছিঃ কানু, মানুষকে কি ওই সব বলে?

কানু বলিল, তবে কি বলব, শুনি? শ্রীমতী কি বলিতে বলেন, শুনি?

কমল আবার মধুস্বরে গাহিল—

> ননদিনী ব'লো নগরে
> ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।

কানু বলিল, তবে আর গালাগালি দিই কি সাধ করে বউ? ওরা যে তা বিশ্বাস করবে না। বলে, তাই নাকি হয়?

কথাটা হইতেছে এই—কমল এবার সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, আর মানুষ নয়, এ রূপে সে এবার শ্যামসুন্দরের পূজা করিবে! বহু ইতিকথা তো সে শুনিয়াছে! তাই সে রাত্রে আখড়া ভাঙিয়া গেলে মালতী

বা মাধবীর মালা গাঁথে, সুশোভিত কাঠের সিংহাসনে স্থাপিত কৃষ্ণ-মূর্তির পটখানির গলায় পরাইয়া দেয়। অনিমেষে পটের দিকে চাহিয়া থাকে—যদি সে মূর্তি হাসে। মাথার উপর ঘৃতদীপ ধরিয়া সে পটের আরতি করে। তাই রাত্রে আখড়া ভাঙিবার পর ভোলা যখন ডাকিত, 'কমল', পূজারত কমলের সে কথা কানে যাইত না বা উত্তর দিবার অবসর থাকিত না। পূজায় বসিবার পূর্বে হইলে বলিত, তোর নাক কেটে দোব ভোলা।

এটুকু জানিত শুধু ননদিনী কাহু।

আজ কাহুর কথার উত্তরে কমল বলিল, আমার একটি কথা রাখতে হবে বউ।

কাহু বুঝিয়াছিল, কথাটা কি। সে হাসিয়া বলিল, রাখব। কিন্তু আমারও একটা কথা রাখতে হবে তোকে।

কমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, ছেলেবয়সের সাথী-সখার দল—কি করে বলব কাহু, যে এসো না তোমরা ?

কাহু তাহার হাত ধরিয়া বলিল, তোর কলঙ্ক আমার সহ্য হয় না বউ। তাহার ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছিল।

বহুক্ষণ পর কমল বলিল, তাই হবে ননদিনী। সেই ভাল। পটের পায়ে ডুবতে হলে ভাল করে ডোবাই ভাল। সঙ্গী সাথী ডেকে হাত বাড়িয়ে তুলতে বলা হয় কেন ? তাই হবে।

কাহু বলিল, ননদিনীর জিভও কাটা গেল বউ আজ থেকে।

এর পর কমলের জীবনে এক নূতন অধ্যায়।

পটের পূজায় সে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করিল। কমলের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ননদিনী পর্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িল। সে একদিন বলিল, একটা কথা বলব বউ ?

কি ?

রাগ করবি না তো ?

কমল কোন উত্তর দিল না, শুধু হাসিল। কাহু উত্তর পাইয়াছিল, সে ভরসা করিয়া বলিল, এ পথ ছাড় ভাই বউ ; তুই পাগল হয়ে যাবি।

কমলের মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। সে বলিল, আমার আশার ঘর তুই ভেঙে দিস না ভাই।

কানু কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর কহিল, ভগবান বড় নিষ্ঠুর ভাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কমল বলিল, অতি নিষ্ঠুর ননদিনী, অতি নিষ্ঠুর।

ছবির পূজায় দীর্ঘ দুইটি বৎসর তাহার কাটিয়া গেল, কিন্তু মূক ছবি মূকই রহিয়া গেল। কোনদিন তো সে হাসিল না, স্বপ্নেও কোনদিন সে দেখা দিল না! কল্পনায় একটি কিশোর মূর্তি মনে করিতে গেলে ফুটিয়া উঠে চঞ্চল কিশোর সখার রূপ। কমল শিহরিয়া উঠে। সহসা আজ তাহার মনে হইল, পট না হাসুক, কিন্তু যুগান্তরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা-করা বিগ্রহ তো আছে।

কানু বলিল, তুই মালা-চন্দন কর ভাই বউ। তোদের তো আছে।

কমল বলিল, না, আমার আশা আজও যায় নাই ননদিনী। আমি মন্দিরে মন্দিরে তাকে খুঁজে দেখব।

কানু আর কিছু বলিতে পারিল না।

ইহার পর হইতে কমল গ্রামে গ্রামান্তরে তীর্থে তীর্থে বিগ্রহ-মূর্তির দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। প্রাণ-ঢালা গানের নৈবেদ্যে সে দেবতার পূজা করিত, প্রাণের আবেদন শুনাইত, অপলক নেত্রে বিগ্রহ-মূর্তির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, যদি ঈষৎবিকশিত চোরাহাসিটি পলকের অন্ধকারে চোখ এড়াইয়া মিলাইয়া যায়।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে চোখ জলে ভরিয়া আসে। তখন আর সে পলক না ফেলিয়া পারে না। চোখের জল তাহার গণ্ডদেশ বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে।

দশ

এমনই করিয়া কাটিয়া গেল কতদিন—পরিপূর্ণ দুইটি বৎসর।

পৌষ-সংক্রান্তির পূর্বদিন স্নানের সময় ননদিনী কমলের দুয়ার খোলা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। এ দিনে তো পোড়ারমুখী বউ কখনও ঘরে থাকে না! সংক্রান্তির দিন গঙ্গাস্নান করিয়া বনওয়ারীবাদে বনওয়ারীলালের দরবারে তাহার যাওয়া চাই-ই। কানুর আশঙ্কা হইল। কমলের অসুখ করিল নাকি? সে আগড় ঠেলিয়া আখড়ায় প্রবেশ করিয়া ডাকিল, বউ!

কমল তখন স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। ঘরের ভিতর হইতে সে উত্তর দিল, যাই।

কানু প্রশ্ন করিল, তোর শরীর ভাল তো?

কলসী কাঁখে লইয়া কমল বাহিরে আসিল। খোলা হাতখানি কানুর মুখের কাছে নাড়া দিয়া বলিল, বলি, ও ওলো ননদী, আজকে হঠাৎ হলি যে তুই এমন দরদী? হঠাৎ শরীরের খবর যে?

তবে যে বড় বনওয়ারীলালের দরবারে যাস নাই? নাগরের ডাক হেলা করে বেলা খোয়াচ্ছিস যে?

যাব না।

কেন?

মান করেছি।

মান! কানু একান্ত দুঃখের সহিতই হাসিল। তারপর বলিল, মান ভাঙাবে কে কমল?

কমল স্বপ্নপ্রবণ চোখে আকাশপানে চাহিয়া রহিল। কানু বলিল, বউ, মিছে দেহপাত করিস না। ও হবার নয়।

কমল, বোধ হয় কোন স্বপ্ন-কল্পনা করিতে করিতেই পথ চলিতেছিল কোন উত্তর না দিয়া এতক্ষণে স্থির দৃষ্টি কানুর মুখের উপর রাখিয়া চাহিয়া রহিল। কানু বলিল, এমন করে চেয়ে থাকিস না ভাই। তোর

ওই চাউনিকে আমার বড় ভয় করে।

কমল তবু হাসিল না! স্নান করিতে করিতে কাহু হাসিয়া বলিল, তার চেয়ে বউ, আমায় তোর শ্যাম মনে কর। আমি তোকে বুকে করে রাখব।

কমলের নগ্ন সুন্দর বুকে সে আঙুলের একটি টোকা মারিল। সে তখন দুই হাতের আঘাতে আঘাতে জলের হিল্লোল তুলিতে তুলিতে গাহিতেছিল, 'সাগরে যাইব কামনা করিব সাধিব মনেরই সাধা'। ফিরিবার পথে কমল অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, তাই ভাল ননদিনী।

কি?

তোকেই আমার শ্যাম করব!

মর।

সন্ধ্যেতে আসিস ভাই। একলা আজ থাকতে পারব না।

তুই যাস ভাই! ছেলেপিলের খাওয়া-দাওয়া, চ্যাঁ-ভ্যাঁ, সন্ধ্যেতে আমার আসা হবে না।

আচ্ছা, যাব। নন্দাই কিছু বলবে না তো?

খিলখিল করিয়া হাসিয়া কাহু বলিল, তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখব নয়তো রাম মোড়লের মজলিসে তামাক খেতে পাঠিয়ে দোব।

কমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু দ্বিপ্রহর না যাইতেই কমল ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল জয়দেবের কথা। জয়দেবের শ্যামচাঁদের দরবারে সে কখনও তো যায় নাই! জয়দেবের শ্যাম প্রেমের ঠাকুর। জয়দেবের কাহিনী মনে করিয়া সে আশান্বিত হইয়া উঠিল। ননদিনীকে চাবি দিয়া তুলসীমন্দিরে প্রদীপ দিবার কথা বলিবার তাহার অবসর হইল না।

বহুদূর পথ, ক্রোশ পঁচিশেকের কম নয়। কমল স্থির করিল, দিনরাত্রি চলিয়াও সে আগামী কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনরূপে পৌঁছিবেই।

কমল একাই পথ ধরিল। গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ

অতিক্রম করিয়া সে চলিয়াছিল। পথে যাত্রীর দল পাইবে, সে আশা করিয়াছিল। কিন্তু যাত্রীরা সব পূর্বেই চলিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার মুখে একখানা গ্রাম পার হইবার সময় সে শুনিল, সম্মুখে একখানা মাঠ পার হইয়াই আর একখানি গ্রাম, তারপরই জয়দেবের আশ্রম।

মাঠখানা একটু বিস্তীর্ণ। ক্রোশ দুই হইবে। কমল মাঠের বুকে নামিয়া পড়িল। সদ্য-ফসল-কাটা শুভ্র ক্ষেতগুলিকে বেড়িয়া বেড়িয়া পায়ে-চলা পথের নিশানা ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। শুক্লপক্ষের রাত্রি। দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত স্তর-মেঘের মেলা আকাশ ছাইয়া থাকিলেও মেঘের আড়ালের দশমীর চাঁদের জ্যোৎস্নার আভায় ধরিত্রীর বক্ষ অস্পষ্ট উজ্জ্বল। সে অস্পষ্টতায় দেখা বেশ যায়, কিন্তু ভাল চেনা যায় না। কমল সন্তর্পণে পথ চলিয়াছিল। শীর্ণ পথ লতার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া কত দিকে শাখা-প্রশাখা মেলিয়াছে।

অল্প অল্প বাতাস বহিতেছিল। শীত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কমল কাপড়খানাকেই বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইল। হাসিও আসিল তাহার। কানু শুনিলে তাহাকে নিশ্চয় রাই-উন্মাদিনী বলিয়া ঠাট্টা করিবে। আর পাগল হইতে বাকিই বা রহিয়াছে কোথায়? কিন্তু পাগল হইয়াও তো আকাশে ফুল ফোটানো গেল না! কমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিল, এই শেষ। ইহার পর আর সে আকাশে ফুল ফুটাইবার কল্পনা করিবে না। কমল একবার দাঁড়াইল। চারিদিক বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া মনে মনে কথা কহিতে কহিতে আবার চলিল। চারিদিকের গ্রামের বনশোভা ঘষা কালো ছবির মত দেখা যাইতেছিল। মাথার উপরে কাটা কাটা মেঘের মধ্য দিয়া আলো-আঁধারির খেলা খেলিতে খেলিতে চাঁদও চলিয়াছিল এই একাকিনী যাত্রিনীর সঙ্গে।

কিন্তু পথ যে ফুরায় না! পথ ভুল হইল না তো?—চারিদিকেই তো পথ!

কমল থমকিয়া দাঁড়াইল। আকাশে চাহিয়া দেখিল, চাঁদ প্রায় মাথার উপরে আসিয়াছে। রাত্রি তবে তো অনেক হইয়াছে। চারিপাশে চাহিয়া দেখিল, গ্রাম সেই দূরে, ছবির মত মনে হইতেছে —যত দূরে ছিল তত দূরেই আছে, এতটুকু নিকটবর্তী হয় নাই। মধ্য-প্রান্তরের মধ্যে সে শুধু একা দাঁড়াইয়া। কমলের কান্না পাইল।

এই সীমাহারা প্রান্তরে একা সে পথ ভুলিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে! কেন এমন ভুল সে করিল, কেন সে সন্ধ্যার মুখে একা এই বিস্তীর্ণ মাঠে নামিল? কে তাহাকে পথ দেখাইবে?

দেহ-মন যেন তাহার ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া কমল কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কতক্ষণ সেই ভাবে বসিয়া ছিল কে জানে! হঠাৎ তাহার কানে কোন পথচারীর কণ্ঠস্বর আসিয়া পৌঁছিল। পথিক যেন গান গাহিতে গাহিতে পথ চলিয়াছে। কমল উঠিয়া পড়িল। স্বর লক্ষ্য করিয়া পাগলের মত ছুটিয়া চলিল। অদূরে ছায়ার মত মানুষের কায়া যেন দেখা যাইতেছে।

সে আর্তস্বরে ডাকিল, কে গো?

আবার ডাকিল, ওগো, কে গো তুমি? একটু দাঁড়াও। পথিক দাঁড়াইল।

কমল ডাকিয়া বলিল, একটু দাঁড়াও গো। পথ হারিয়েছি আমি।

পথিক এবার শব্দ লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি? সে সেই দিকেই হাঁটিতে শুরু করিল। আলপথের একটি বাঁকের উপরে দুইজনের মুখোমুখি দেখা হইল। কমল দেখিল, পথিক যুবা। শুধু যুবা নয়, রূপও আছে তাহার।

মেঘের একটা স্তর ছাড়াইয়া আকাশের চাঁদ তখন পরিপূর্ণ ভাবে উঠিয়াছে। অকস্মাৎ পুরুষটি বিস্ময়-ভরা কণ্ঠস্বরে বলিয়া উঠিল, কমল? চিনি?

কমলও বুঝি চিনিয়াছিল, সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রঞ্জন—তাহার লক্ষ্য।

কমলের মনে একটি গোপন আশঙ্কা জাগিয়াছিল। একবার মনে হইল, এ সেই। তাহার শ্যামচাঁদ, রঞ্জনের রূপ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন অনেক গল্প সে শুনিয়াছে। যেখানে যে শ্যাম-বিগ্রহের দরবারে সে চলিয়াছে, সেই শ্যামই তো জয়দেব গোস্বামীর রূপ ধরিয়া পদ্মাবতীকে ছলনা করিয়া কবির অসমাপ্ত গান সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। স্থিরদৃষ্টিতে সে রঞ্জনের দিকে চাহিয়া রহিল।

রঞ্জন আবার ডাকিল, কমল! রাই-কমল!

সে তাহার হাত ধরিয়া ডাকিল এবার। রাই-কমলের চেতনা ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণ পর আপনাকে সংযত করিয়া বুঝিল সত্যসত্যই এ রঞ্জন। অস্পষ্ট ছায়ালোকের মধ্যে ক্ষেতের বুকে তাহার পদদেহের দীর্ঘ ছায়াখানি বাঁকাভাবে পড়িয়া আছে। দেবতার ছায়া এড়ে না! রঞ্জন—এ সেই রঞ্জন। দেবতা নয়, মানুষ।

আশ্চর্য! তবুও তাহার বুক বিপুল আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

রঞ্জনই আবার কথা বলিল, তুমি এখানে এত রাত্রে কেমন করে তলে কমল?

কমল তখনও তাহাকে দেখিতেছিল। রঞ্জনের বৈষ্ণবের বেশ। তকহার মনে পড়িল, রঞ্জন পরীকে লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছে। রঞ্জনের প্রশ্নে সে সজাগ হইয়া উঠিল। বলিল, জয়দেব যাব। কিন্তু তুমি—কি বলব তোমাকে, কি নাম নিয়েছ? তুমি কোথা যাবে?

রঞ্জন বৈষ্ণবের মতই মৃদু হাসিয়া বলি, নাম এখন আমার রাইদাস মহান্ত।

কমল অকারণে লজ্জা পাইল। রঞ্জন বলিল, আমিও জয়দেব যাব। আমার সঙ্গেই এস, কি বল?

কমল কহিল, চল।

কমলের মনের মধ্যে কত প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া মরিতেছিল, কিন্তু কথা যেন জিভে জড়াইয়া যাইতেছে। পথ চলিতে চলিতে রঞ্জন আবার বলিল, রসিকদাস চলে গেল?

কমল উত্তর দিল না। রঞ্জন বলিল, আমি তোমাদের খবর সবই

জানি। বাউলের যে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান হয়েছে, এও ভাল। তারপর দুজনেই নীরব। শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ পশ্চিম আকাশে অস্ত যাইতেছিল। মেঘের ছায়া ঘন হইয়া কায়া গ্রহণ করিতেছিল। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে চারিদিক। কমল মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, পরী ভাল আছে?

রঞ্জন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, শেষ-জীবনে বড় কষ্টই সে দিলে আমায়; নিজেও পেলে—রোগের যন্ত্রণায় দিনরাত্রি চীৎকার! আর সে কি ভয়ঙ্কর মূর্তি—অস্থিকঙ্কালসার! উঃ! মনে করতেও শরীর আমার শিউরে ওঠে!

সমবেদনায় কমলও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, আহা! পরী মরিয়া গিয়াছে!

আক্ষেপ করিয়া রঞ্জন বলিল, গুরু পেয়েছিলাম ভাল। ভাল আখড়া, দেবসেবা, কিছু দেবোত্তর—সবই তিনি আমায় দিয়ে গেছেন! দিনও কিছুদিন মন্দ কাটে নাই। কিন্তু তারপর এই অশান্তি। এক দিকে দেবতার সেবা, এক দিকে মানুষের সেবা··· এ কি চিনি, শীতে যে কাঁপছ তুমি? গায়ে কাপড় দাও।

কমল বলিল, থাক।

না না, এ ঠাণ্ডায় কঠিন ব্যারাম হতে পারে। গায়ে কাপড দাও।

এবার বাধ্য হইয়া কমলকে জানাইতে হইল, সে গায়ের কাপড় আনিতে ভুলিয়াছে।

রঞ্জন বলিল, তাই তো! তা হলে এক কাজ কর, আমার গায়ের কাপড়খানা—

কমল প্রতিবাদ করিয়া কহিল, না।

পথ চলিতে চলিতে রঞ্জন বলিল, ভাল মনে পড়েছে। দাঁড়াও, আমার কাছে যে আরও দুখানা নতুন গরম কাপড় রয়েছে।

সে আপনার পোঁটলা খুলিয়া দুইখানি গায়ের কাপড় বাহির করিল—একখানি গাঢ় নীল, অপরখানি হলুদ রঙের। নীল রঙের কাপড়খানি সে কমলের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, না নিলে আমার বড় দুঃখ হবে চিনি।

কমল 'না' বলিতে পারিল না। নীল গায়ের কাপড়খানি তাহাকে মানাইলও বড় ভাল। রঞ্জন ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, আমার দেওয়া মিছে হয় নাই রাই-কমল। প্রতিবার আমি জয়দেবে আসি, আর রাধাগোবিন্দকে শীতবস্ত্র ভেট দিই। তাঁর গায়ের কাপড়ের রঙ হলুদ, রাধার গৌর অঙ্গে নীল রঙই মানায় ভাল।

কমল দারুণ লজ্জায় মৃদুস্বরে বলিল, ছিঃ, তুমি করলে কি ?

রঞ্জন বলিল, ঠিক করেছি। রাধারানীই নিয়েছেন রাই-কমল।

পরদিন প্রভাতে কমল অজয়ে স্নান করিয়া মন্দিরে গেল। মনে হইল, বিগ্রহ যেন হাসিতেছে। চারিদিকে বাউল বৈষ্ণবে গান ধরিয়াছে। সেও মন্দিরা বাজাইয়া গান ধরিয়া দিল—

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে
দেখা না হইত পরান গেলে।

তাহার কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে, সঙ্গীতের শিল্পচাতুর্যে মুগ্ধ শ্রোতার দল ভিড় জমাইয়া ফেলিয়াছিল। গান শেষ হইলে পূজারী আসিয়া একগাছি প্রসাদী মালা দিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, ভক্তি তোমার অচলা হোক।

প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সে জল খাইবার জন্য যাইতেছিল অজয়ের ঘাটে! মন্দিরসীমার বহির্দ্বারে রঞ্জন দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, কি প্রসাদ পেলে, আমায় ভাগ দাও কমল।

কমল পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল, প্রসাদ পেয়েছি—শ্যামচাঁদের আশীর্বাদী মালা।

কমল এ কথার উত্তর দিল না। সে শূন্যদৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া রহিল। রঞ্জন বলিল, রাধারানীর কি দয়া আমার ওপর হবে না কমল ?

কমল বলিল, তাই নাও। তারপর স্বর নামাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া বলিল, অনেক ভেবে দেখলাম্—বাউল বল, দেবতা বল, সবার ভেতর দিয়ে তোমাকেই চেয়ে এসেছি এতদিন।

এগারো

জয়দেবধামের মন্দিরপ্রাঙ্গণে রঞ্জনকে বরণ করিয়া সেইখান হইতেই কমল তাহার অনুগামিনী হইল। ঘরের কথা মনে হইল না। কাহুর কথা মনে হইলেও কাহু যেন অনেক ছোট হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিল, ইহার পর ননদিনীকে একটা সংবাদ পাঠাইয়া দিলেই হইবে, কিংবা তাহারা দুইজনে গিয়া একেবারে তাহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা চাহিবে। পোড়ারমুখী ননদিনী ছুটিয়া আসিয়া অবাক হইয়া যাইবে।

কল্পনার জাল বুনিতে বুনিতে রঞ্জনের সঙ্গে তাহার আখড়ায় যখন গিয়া পৌঁছিল, বেলা তখন যায়, গোধূলির আলো ঝিকিমিকি করিতেছে।

মনের মধ্যে উল্লাসের তৃপ্তির আর পরিসীমা ছিল না তাহার। কিন্তু সে উল্লাস বাহিরে প্রকাশ করিবার যেন উপায় ছিল না। রঞ্জনকে সম্ভাষণ করিবার যোগ্য সম্বোধন সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাহার লঙ্কা—কিন্তু ছিঃ, মহান্ত বলিতেও যে লজ্জা হয়, মনও উঠে না। মনে মনে বিচার করিয়া 'লঙ্কা'র চেয়ে 'মহান্ত' সম্বোধন কিছুতে সে প্রিয়তর বা মধুরতর মনে করিতে পারিল না।

রঞ্জন উল্লসিত হইয়াছিল। কপোতীকে বেড়িয়া কপোত যেমন অনর্গল গুঞ্জন করিয়া ফেরে, তেমনই ভাবে সে কখনও কমলের আগে, কখনও পিছনে পথ চলিতে চলিতে অনর্গল কথা কহিয়া চলিয়াছিল।

গ্রামে ঢুকিবার মুখে রঞ্জন বলিল, আজ সন্ধ্যেতে কিন্তু আমার ঠাকুরকে গান শোনাতে হবে কমল।

কমল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। মনে মনে স্থিরও করিয়া রাখিল, কোন গান সে গাহিবে। গানের কলিগুলি মনের মধ্যে তাহার এখনই গুঞ্জন করিয়া উঠিল—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়ামুখচন্দা।

আখড়ার নিকটে আসিয়া আগড় খুলিয়া রঞ্জন বলিল, এস, এই আমার আখড়া।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কমল চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। আখড়াটি সুন্দর। শুধু সুন্দর নয়, ভিক্ষুকের ভবনের মধ্যেও স্বচ্ছল সমৃদ্ধির পরিচয় চারিদিকেই সুপরিস্ফুট। একদিকে জাফরি-বোনা বাঁশের বেড়ার মধ্যে গাঁদাফুলের গাছ। গাছগুলির সর্বাঙ্গ ভরিয়া ভারে ভারে ফুল ফুটিয়া আছে। মাঝে মাঝে কয়টা রাধাপদ্মের গাছে বড় বড় হলদে ফুলের সমারোহ। কয়টা সন্ধ্যামণিগাছে তখন সদ্য সদ্য রাঙাবরণ ফুল ফুটিতেছিল। ও-পাশে পাঁচ-ছয়টা আমগাছ মুকুলে যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে! মাঝ-আঙিনায় একটা সজিনাগাছের পুষ্পিত শীর্ষগুলি মাটির দিকে নুইয়া পড়িয়া বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে।

সম্মুখেই দাওয়া—উঁচু বাঁধানো-মেঝে মেটে ঘর একখানি। তাহার ঠিক পাশেই ঘরখানির সহিত সমকোণ করিয়া আর একখানি ছোট্ট ঘর। তাহারও বাঁধানো মেঝে। আকারে প্রকারে মনে হয়, এইটিই বিগ্রহ-মন্দির! দুয়ারের চৌকাঠে, সিঁড়িতে আলপনার দাগ অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল।

কমলের অনুমানে ভুল হয় নাই। রঞ্জন গিয়া ঘরের দুয়ার খুলিয়া দিয়া কহিল, এস, প্রণাম করি।

কমল দেখিল, মন্দিরের মধ্যে গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ। রঞ্জন ও কমল পাশাপাশি বসিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

মহান্ত!

পিছনে অস্বাভাবিক দুর্বল কণ্ঠস্বরে কে যেন বুক ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কমল চমকিয়া উঠিল। প্রণাম তাহার সম্পূর্ণ হইল না, সে পিছন ফিরিয়া দেখিল, ও-ঘরের দাওয়ার উপরে অদ্ভুত এক ানীমূতর প্রাণপণে দুই হাতে মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতেছে। কমল শিহরিয়া উঠিল। মানুষের এমন ভয়ঙ্কর কুৎসিত পরিণতি সে আর দেখে নাই। কঙ্কালাবশেষ জীর্ণ দেহ হইতে বুকের কাপড় শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কমল দেখিল, সে-বুকে

অবশিষ্টের মধ্যে শিথিল চর্মের আবরণের মধ্যে শুধু কঙ্কালের স্তূপ। সেই স্তূপ ভাঙিয়া বাহিরে আসিবার জন্য প্রাণ হৃৎপিণ্ডের দ্বারে যে উন্মত্তভাবে মাথা কুটিতেছে।

রঞ্জন কর্কশকণ্ঠে কহিল, এ কি! আবার তুই বাইরে এসেছিস পরী? পরী!

অজ্ঞাতসারে কমল অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, পরী!

এই পরী! সেই পরীর এই দশা! সেই হৃষ্টপুষ্ট শ্যামবর্ণ মেয়ে এমন হইয়া গিয়াছে। সেই পরিপুষ্ট সুডোল মুখ এমন শীর্ণ দীর্ঘ দেখাইতেছে! মুখে ও চামড়ার নীচে প্রত্যেকটি হাড় দেখা যায়: গালের কোনও অস্তিত্বই নাই'যেন, আছে শুধু দুইটা গহ্বর। পরীর চুলের শোভা ছিল কত! কিন্তু এখন সেখানে সাদা মসৃণ চামড়া বীভৎসভাবে চকচক করিতেছে। যে কয়গাছ চুল আছে, তাহার বর্ণ পিঙ্গল, রুগ্ন কর্কশতায় বীভৎস। চর্মসার কঙ্কালের মধ্যে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল শুধু দুইটি চোখ, চোখ দুইটা যেন দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। শীর্ণ দেহের মধ্যে কোথাও স্থান না পাইয়া মানব-হৃদয় যেন ওইখানে বাসা গাড়িয়াছে। ক্রোধ, হিংসা, অভিমান, লোভ, মমতা, স্নেহ সব আত্মপ্রকাশ করে ওর দৃষ্টির মধ্য দিয়া।

রঞ্জনের কর্কশ তিরস্কারে পরী কর্ণপাত করিল না। সে আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও কে মহান্ত?

দৃষ্টি দিয়া পরী যেন কমলের রূপসম্ভারভরা সর্ব অবয়ব গ্রাস করিতেছিল!

রঞ্জন বলিল, চিনতে পারলে না? ও যে কমল। তুমি যে আমায় বলেছিলে পরী—

পরী পাগলের মত দুই হাতে আপনার বুক চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, না না না, বলি নাই; বলি নাই আমি। সে আমি মিথ্যে বলেছি। তোমার মন রাখতে, মন বুঝতে বলেছি আমি।

হা-হা করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল।

কমল থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। রঞ্জন তাহার হাত ধরিয়া

ডাকিল কমল, কমল!

দেবতার ঘরের খুঁটিটা ধরিয়া কমল বলিল, পরী বেঁচে থাকতে তুমি এ কি করলে? আমায় তো তুমি বল নাই! ছি!

রঞ্জন বলিল, পরী মরেছে, সে কথা তো আমি বলি নাই কমল।

সে কথা সত্য কি না যাচাই করিয়া দেখিবার সময় সে নয়। কমল বলিল, ধর ধর, তুমি পরীকে গিয়ে ধর। পড়ে যাবে, পড়ে যাবে হয়তো।

রঞ্জন পরীকে ধরিয়া ডাকিল, পরী পরী!

তাহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পরী বলিল, কি করলে গো, এ তুমি কি করলে? দুটো দিন সবুর করতে পারলে না? আমি তো বাঁচব না। দুদিনও হয়তো বাঁচব না। দুদিনের জন্যে আমার বুকে এ তুমি কি শেল হানলে গো?

আবার সে হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রক্তমাংসের মানুষ লইয়া এ কি কুশ্রী কাড়াকাড়ি! কমলের করুণা হইল। ওই মেয়েটির বুকে যে আজ কি বেদনা, কত তাহার পরিমাণ সে তো নিজে নারী, সে তাহা বোঝে। শুধু তাই নয়, আজ যে তাহাকে কঠোরভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল, তোমায় মরিতে হইবে—একান্ত নিঃস্ব রিক্ত হইয়া কাঙালিনীর মরণ মরিতে হইবে।

কমলের চক্ষে জল দেখা দিল। সে আসিয়া পরীর পায়ের কাছে বসিয়া বলিল, পরী, আমার ওপর রাগ করলি ভাই?

বেরো—বেরো—দূর হ—দূর হ। চীৎকার করিয়া পরী তাহার কঙ্কালসার দেহে যতখানি শক্তি ছিল প্রয়োগ করিয়া কমলকে লাথি মারিয়া বসিল। অতর্কিত কমল নীচে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। রঞ্জন কিছু করিবার পূর্বেই কমল নিজেই উঠিয়া বসিল।

ও কি, তোমার ভুরু থেকে রক্ত পড়ছে যে! রঞ্জন পরীকে ছাড়িয়া দিয়া কমলের পরিচর্যার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

পরীর চোখ বাঘিনীর চোখের মত হিংস্র দীপ্তিতে দপদপ করিয়া জ্বলিতেছিল।

সে দৃষ্টি কমল দেখিয়াছিল। ভ্রূতে বুলানো রক্তমাখা হাতখানি দেখিতে দেখিতে সে বলিল, না না, লাগে নাই আমার। যাও, তুমি পরীকে ধর—ও রোগা মানুষ। আমি নিজেই ধুয়ে ফেলছি।

কমল এপাশ ওপাশ অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, একটি চারা আম-গাছের তলায় জল ফেলিবার জন্য একটুখানি স্থান বাঁধানো রহিয়াছে। বালতির জল লইয়া সে ভ্রূ-র রক্ত ধুইতে বসিল। ধুইতে ধুইতে শুনিল, পরী বলিতেছে, না না, এমন করে তুমি চেও না। রাগ করো না। ছুটো দিন, ছুটো দিন ওকে পর করে রাখ। আদর করো না, কথা কয়ো না। ছুটো দিন গো, ছু দিন বই আর আমি বাঁচব না। সত্যি বলছি।

সন্ধ্যার দেবতার সম্মুখে নিত্য কীর্তন হয়। রঞ্জন কমলকে বলিল, এস, আমার প্রভুকে গান শোনাবে এস!

কমল বলিল, না।

রঞ্জন আশ্চর্য হইয়া গেল। বলিল, সে কি? এ এখানকার নিয়ম। আর এরই মধ্যে লোকজন এসেছে সব, তাদের বলেছি আমি।

কমল দৃঢ়স্বরে বলিল, না। পরীর অবস্থাটা ভাব দেখি। আমার গান শুনলে সে হয়তো পাগল হয়ে উঠবে।

রঞ্জন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হুঁ।

কমল আবার বলিল, যাও, তুমি নাম-গান আরম্ভ করগে, সন্ধ্যে বয়ে যাচ্ছে। আমি বরং যাই, দেখেশুনে পরীর জন্যে একটু সাবু কি বার্লি চড়িয়ে দিই।

রঞ্জন অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল! সে কমলের হাত ধরিয়া বলিল, কমল, আগে দেবসেবা পরে মানুষ। এস বলছি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কমল বলিল, আমারও এতদিন তাই ছিল। কিন্তু আজ আমি ধর্ম পালটেছি। ছাড় আমাকে তুমি।

রঞ্জন হাত ছাড়িয়া দিল। কমল ধীরপদক্ষেপে ওদিকে চলিয়া যাইতেছিল, রঞ্জন অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, মরবেও না, আমারও অশান্তি

ঘুচবে না।

কমল ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, দেবতার পায়ে প্রাণ ঢেলেও দেবতার সাড়া পাইনি। দেবতা পাথরের বলে মানুষকে ধরেছি জড়িয়ে। মানুষের ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিও না আর। ছি!

রঞ্জন এতটুকু হইয়া গেল। ঘরের ভিতরে দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে পরী গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছিল।

রঞ্জন নিজেই খোল লইয়া দেবতার দুয়ারে বসিল।

কীর্তন ভাঙিয়া গেলে ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, কমল!

কমল তখন পরীর কাছে বসিয়া ছিল। পরীর সবে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। কিন্তু তখনও তাহার তন্দ্রাতুর বক্ষের ক্রন্দনকম্পিত দীর্ঘশ্বাস মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়া আসিতেছিল।

কমল সন্তর্পণে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন বলিল, নাও।

সে একডালা ফুল আগাইয়া দিল। কমল হাত বাড়াইয়া লইল। কিন্তু জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

রঞ্জন হাসিয়া বলিল, ফুলশয্যা—

না।

রঞ্জন আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন?

কমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, ভুল করে করেই জীবন চলেছে আমার। যত বড় মানুষ আমি, ভুলের পর ভুল জমা করলে সেও বোধ হয় তত বড়ই হবে। আবারও বোধ হয় ভুল করলাম আমি।

রঞ্জন কমলের কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। সে বিস্মিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কমল বলিল, যে মানুষের প্রয়োজন নাই, তার কি কোন দাম নাই তোমার কাছে? একবার পরীর কথা ভাব দেখি।

রঞ্জন বলিয়া উঠিল, কমল, তুমি কি পাথর?

আমি? কমল হাসিল। তারপর আবার বলিল, পাথর হলে

পাথরেই মন উঠত লঙ্কা, এ কথা আর একবার বলেছি। মানুষ বলেই মানুষের জন্যে পাগল হয়েছি, মানুষের জন্যে মমতা না করে যে পারি না।

আচ্ছা, থাক! রঞ্জন ঈষৎ উষ্মাভরেই সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল।

মহান্ত!—ঘরের ভিতর হইতে পরী ডাকিতেছিল।

কমল তাড়াতাড়ি পরীর শয্যাপার্শে গিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া অস্বাভাবিক উত্তেজনায় পরী আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, না, না, সরে যা তুই বলছি।

সভয়ে কমল বাহিরে আসিয়া রঞ্জনকে বলিল, যাও, ডাকছে তোমায়। একান্ত অনিচ্ছার সহিত রঞ্জন পরীর শয্যাপার্শে গিয়া দাঁড়াইল। পরী বলিল, আজ তোমার ফুলের বাসর হবে, নয়? তোলা বিছানার মধ্যে তোশক বালিশ—

বাধা দিয়া রঞ্জন বলিল, থাক থাক, ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না পরী।

না। বিছানা নামিয়ে নাওগে। কিন্তু আমি শখ করে যা যা করিয়েছি, সেগুলো নিও না। সে আমার, সে আমি সইতে পারব না। প্রাণ থাকতে সে দেখতে আমি পারব না।

উত্তরে রঞ্জন অতি কটু একটা জবাব দিতে গেল। কিন্তু পিছনে লঘু পদশব্দে কমলের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া সে তাহা পারিল না। শুধু পরীর মাথায় হাত বুলাইতে চেষ্টা করিল। পরী হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া বলিল, থাক।

রঞ্জনও যেন বাঁচিল, সে চলিয়া গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে রঞ্জন তামাক খাইতেছিল। কমল আসিয়া কহিল, তোমার বিছানা পরীর ঘরে।

রঞ্জন চমকিয়া উঠিল। কমল বলিল, 'না' বলতে পাবে না। আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে।

রঞ্জন আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না—বার বার অস্বীকার

করিয়া বলিল, না না। রোগীর গায়ের গন্ধে আমার ঘুম হবে না।
শান্তভাবে কমল প্রত্যুত্তরে বলিল, তা হলে আমারও যদি কোন দিন ওই পরীর মত দশা হয়, তবে তো তুই এমন করেই আমাকে জঞ্জালের মত ঘেন্না করবে, আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে চাইবে!

রঞ্জন চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে হাসিমুখেই কমলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার জয় হোক কমল।

কমল হেঁট হইয়া রঞ্জনের পায়ের ধূলা লইল। রঞ্জন মুহূর্তে অবনত কমলকে বুকে টানিয়া তুলিয়া লইল, চুম্বনে চুম্বনে অধর ভরিয়া দিল, সবল পেষণে যেন পিষ্ট করিয়া দিতে চাহিল। কমলের চোখ দুটিও আবেশে মুদিয়া আসিতেছিল। এ আনন্দ তাহার অনাস্বাদিত-পূর্ব। রসিকদাসও তাহাকে এমনই আদরে বুকে লইয়াছে, কিন্তু সে যেন তাহাতে পাগল হইয়া যাইত। ঠিক এই সময়ে ভিতরে পরীর সাড়া পাওয়া গেল, সে বোধ হয় আবার কাঁদিতেছে! মুহূর্তে আত্মস্থ হইয়া সে বলিল, ছাড়।

না।

কমল বলিল, ছাড়। যে মরতে বসেছে তাকে আর ঠকিও না।

রঞ্জনের বাহুবেষ্টনী শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, কমল আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, যাও, শোওগে যাও।—বলিয়া সে আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না, এপাশের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে পরীর ঘরখানি পরিষ্কার করিবার জন্য সেই ঘরে ঢুকিল। ঝাঁট দিতে দিতে পরীর দিকে চাহিতেই সে দেখিল, পরী তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। কমলের ভয় হইল, পরী হয়তো আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিবে।

কমলি!—পরী তাহাকে ডাকিল।

পরী আবার ডাকিল, শোন, আমার কাছে আয় ভাই কমলি। ভয় নাই।

কমল কাছে আসিয়া বসিল। পরীর জীর্ণ দেহে সস্নেহে হাত

বলিল, ভয় কি ভাই ?

পরী সে কথার কোন উত্তর দিল না। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, রূপ একদিন আমারও ছিল।

কমল চমকাইয়া উঠিল। করুণ হাসি হাসিয়া পরী বলিল, তোকে আশীর্বাদ করব বলেই ডাকলাম ভাই। আজ ছ মাস বিছানা পেতেছি, ছ মাস একা পড়ে পড়ে কাঁদছি। বড় সাধ ছিল ভাই, সে সাধ তুই মেটালি। আশীর্বাদ করি—

আর সে কথা বলিতে পারিল না, অকস্মাৎ অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠিল। কমল ব্যস্ত হইয়া ডাকিল, পরী, পরী!

বালিশে মুখ গুঁজিয়া পরী শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, না না, তুই যা, তুই যা। আমার সামনে থেকে তুই যা।

ওই দিন সন্ধ্যাতেই পরী দেহ রাখিল। যেন ওই আকাঙ্ক্ষাটুকুই তাহার জীবনকে জীর্ণ পঞ্জরের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। বহুদিনের রোগী প্রায় সজ্ঞানেই দেহত্যাগ করে। পরীরও তাহাই হইয়াছিল। বৈকালের দিকে শ্বাস উপস্থিত হইতেই রঞ্জন বলিল, পরী, চল, তোমাকে প্রভুর সামনে নিয়ে যাই, প্রভুকে একবার দেখ।

পরী হাত নাড়িয়া বলিল, না।

জীবনের জ্বালা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের বোধ হয় যায় না। কষ্টের পরিসীমা ছিল না, তবুও পরী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দেবতার সেবা অনেক করেছি, কিন্তু দেবতা আমায় কি দিলে ? দেবতা নয় ; মহান্ত তুমিও না। তোমার মুখ আমার দেখতে ইচ্ছে করছে না। সরে যাও তুমি। আমি একা থাকব।

তারপর একটি সকরুণ হাসি হাসিয়া বলিল, আমি তো আজ একাই।

আপন জীবনের সমস্ত তিক্ত রসটুকু হতভাগী নিঃশেষে পান করিয়া তবে গেল।

বারো

তারপর ?

তারপর একটি অবিচ্ছিন্ন মিলনের গাঢ় আনন্দ। এই আনন্দের মধ্য দিয়া দিবারাত্রিগুলি স্বচ্ছন্দে শ্বাসপ্রশ্বাসের মত বহিয়া যায়। মিলনের আবেশে চোখের নিমিখ নামিয়া আসে, সে নিমিখ খুলিতে খুলিতে রাত্রি আসে। আবার রাত্রি কাটিয়া প্রভাত হয়। পাখির কলরব জাগিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে যাহার ঘুম ভাঙে, সে অপরের কানের কাছে মৃদুস্বরে গায়—

রাই জাগো—রাই জাগো
ওই শুক-সারী বোলে।

ঘুম ভাঙে। প্রভাত হইতে আবার আরম্ভ হয়—হাসি, গান, আনন্দ অভিমান, অনুনয়, অভিনয়, অশ্রু। আবার মিলন হয়। আবার হাসি, আবার আনন্দ। মোট কথা, দুইটি তরুণ নর-নারীর জীবনের যা লীলা—তাই। পুরাতন ধারা জীবনে ঘুরিয়া ফিরিয়া অল্প একটু বেশ পরিবর্তন করিয়া দেখা দেয়। নর-নারী দুইটি কিন্তু ছদ্মবেশ ধরিতে পারে না। তাহারা পায় তাহার মধ্যে নূতনের সন্ধান।

কিন্তু তবু কমল মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠে। মনে হয়, পরী যেন ঈর্ষাতুর দৃষ্টিতে চাহিয়া কোন্ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে।

সেদিন দোল। বসন্ত-পূর্ণিমা শেষ-ফাল্গুনে আসিয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিণা বাতাসের গতি ঈষৎ প্রবল। ঘরে দোলনা খাটানো হইয়াছে। দেবতার পায়ে আবীর-কুমকুম নিবেদন করিয়া দিয়া থালাখানি হাতে রঞ্জন দাওয়ায় আসিয়া উঠিল। কমল বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল। কৌতুকভরে রঞ্জন একটা কুমকুম ছুড়িয়া কমলকে মারিল। রাঙা মুখে কমলও উঠিয়া একটা কুমকুম তুলিয়া লইল।

কিন্তু সে কুমকুম তাহার হাতেই থাকিয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়া বিবর্ণ মুখে সে বলিয়া উঠিল, কে কাঁদছে গো ?

সবিস্ময়ে রঞ্জন প্রশ্ন করিল, কই, কোথা?

ওই ঘরে।

ওই ঘরটায় পরী মরিয়াছিল। সত্যই একটা অস্ফুট কান্নার মত শব্দ যেন দীর্ঘায়িত বিলাপের ছন্দে বাজিতেছিল।

সাহস করিয়া রঞ্জন ঘরে ঢুকিল। বাতাসের তাড়নায় একটা খোলা জানালা ধীরে ধীরে দুলিতেছিল—তাহারই মরিচা-ধরা কব্জার শব্দ সেটা।

রঞ্জন হাসিয়া উঠিল।—এত ভয় তোমার?

কমল হাসিতে চেষ্টা করিল।

*

এমনই করিয়া দিন কাটে। দিনে দিনে মাস—মাসে মাসে বৎসর চলিয়া যায়। বৎসরের পর বৎসর যাইতেছিল। পাঁচ বৎসর পর বোধ হয়। কমল হঠাৎ একদা অনুভব করিল, দিনগুলি যেন বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। দিনগুলির ধারারও কেমন যেন পরিবর্তন হইয়াছে, তেমন স্বচ্ছন্দ গতিতে আর যায় না—কেমন যেন মন্দগতি। মধ্যে মধ্যে কাটিতে চায় না দিন। রঞ্জন আখড়ার জমি-জমা লইয়া বড় বেশি জড়াইয়া পড়িয়াছে। কাজের আর অন্ত নাই।

দোলের দিন রঙ-খেলায় সে আর তেমন করিয়া মাতে না। ঝুলনের দিন বকুলশাখায় ঝুলনা আর ঝুলানো হয় না। রঞ্জন গাছে উঠিতে পারে না, বলে, এ বয়সে হাত-পা ভাঙলে, বুড়ো হাড় জোড়া লাগবে না। রাসের দিন দেবতার রাস সারিয়া রঞ্জন ঘুমাইয়া পড়ে। ঘুম আসে না কমলের। মধ্যে মধ্যে সেই পুরানো ভয় হঠাৎ তাহাকে চাপিয়া ধরে। মনে হয়, ও-ঘরের মধ্যে পরী যেন পদচারণা করিয়া ফিরিতেছে।

কমল ক্রমে হাঁপাইয়া উঠিল।

সেদিন রঞ্জন খাইতে বসিলে সে বলিল, দেখ, চল, কিছুদিন তীর্থ ঘুরে আসি।

রঞ্জন বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। কমল বলিল,

আমার ভাল লাগছে না বাপু, চল, একবার ব্রজধাম ঘুরে আসি।

শ্লেষের হাসি হাসিয়া রঞ্জন বলিল, কত খরচ জান? বোষ্টম-ভিখারীর ঝুলিতে তা নাই।

কমল ম্লান হইয়া গেল, বলিল, তোমার তো টাকা না-থাকার নয়।

রঞ্জন পরিষ্কার বলিল, আমার একটি পয়সাও নাই।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কমল আবার বলিল, বেশ তো, কাজ কি টাকাকড়িতে? চল, ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে করে বেরিয়ে পাড়ি।

রূঢ়কণ্ঠে রঞ্জন বলিল, আমার বাবা এলেও তা পারবে না।

কমল আঘাত পাইল, অভিমানও হইল। কিন্তু কেন কে জানে সে অভিমান প্রকাশ করিতে তাহার সাহস হইল না।

ইহার পর কমল যেন সজাগ হইয়া উঠিল। মহান্তের সেবাযত্নের পারিপাট্যে গভীরভাবে সে আত্মনিয়োগ করিল। রঞ্জনও একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তবু কমলের মনে অতৃপ্তি ঘুরিয়া মরে। তাহার মনে হয়, সে দিন আর নাই। সে ব্যাকুল অন্তরে সেই হারানো দিন ফিরিয়া পাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিল।

দোলের দিন আবার সে রঙের খেলা খেলিতে চায়, রাসের রাত্রে সারা রাত্রি জাগিয়া সে গান করিতে চায়, জীবনে সে লীলা চায়।

শ্রাবণ মাস, সম্মুখেই ঝুলন-পূর্ণিমা। শুক্লপক্ষের মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণমুখর একটি রাত্রি। রঞ্জন বাড়িতে ছিল না, কমল দাওয়ার উপর বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। ও-পাশে শুইয়াছিল বাউড়ী-বুড়ী। মহান্ত না থাকিলে ওই বুড়ী বাড়িতে শোয়।

মেঘাবরিত চাঁদের জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ প্রভার মধ্যে অবিরাম ধারা-পাতের ঝরঝর ধারা কুহেলীর মত দেখা যাইতেছিল। রাত্রিটি কমলের বড় মধুর লাগিল। আকাশ নীচে নামিয়া শ্যামা ধরণীকে আলিঙ্গন করিতে চায়, কিন্তু বাতাস নিয়তির মত পথ রোধ করিয়া হা-হা করিয়া হাসে, তাই আকাশ যেন কাঁদিয়া সারা।

কমল মনে মনে আগামী দিনের জন্য এমনই একটি রাত্রি বার বার

কামনা করিল। একটি সুন্দর সঙ্কল্প করিয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। দেব-মন্দিরে ঝুলনা ঝুলানো হইয়াছে, যুগল বিগ্রহ ঝুলনে চাপিয়াছেন। কমল সঙ্কল্প করিল, সেকালের মত শয়ন-মন্দিরে তাহারাও ঝুলনা বাঁধিয়া ঝুলনে দোল খাইবে।

কমল কল্পনা করিতে করিতে বিভোর হইয়া উঠিল।

সবুজ রঙের ছাপানো সেই কাপড়খানি সে পরিবে। চুল এলানো থাকাই ভাল। নাকে রসকলি, কপালে চন্দন। মহান্তের গলায় দিবে গন্ধরাজের মালা। নিজের জন্য বেলফুলের মালাই তাহার পছন্দ হইল।

কিন্তু এমন জ্যোৎস্নাস্বচ্ছ বর্ষণমুখর রাত্রিটি কি কাল হইবে? কমলের আক্ষেপ হইতেছিল। আজ যদি সে থাকিত! শুধু আক্ষেপ নয়, সে তাহার লজ্জার জন্য একটি সলজ্জ বেদনাময় অভাব অনুভব করিতেছিল। কেহ কোথাও নাই, যেন নিজের কাছে নিজের লজ্জা বোধ হইতেছিল তাহার।

কখন বাউড়ী-বুড়ীর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, সে পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে বলিল, ঘর-দোরে আলো কই গো? সন্ধ্যেপিদিম জ্বাল নাই নাকি?

কমল চমকিয়া উঠিল। তাই তো, মহাপ্রভুর ঘরে—যুগল বিগ্রহের ঘরেও যে আলো দেওয়া হয় নাই, কীর্তন গাওয়া হয় নাই! তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া সে প্রদীপ জ্বালিতে বসিল।

প্রদীপ দেওয়া শেষ করিয়া সে নিয়মমত খঞ্জনী লইয়া কীর্তন গাহিতে বসিল। গান ধরিল—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর—

অকস্মাৎ সে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে করিয়াছে কি? যুগল বিগ্রহ যখন পূর্ণ মিলনানন্দে ঝুলনে চাপিয়াছেন, তখন সে এ কি গান গাহিল? মনে মনে বার বার মার্জনা চাহিয়া সে ঝুলনের গান ধরিল।

পরদিন প্রভাতেও মেঘ কাটিল না। কমল সজল মেঘাচ্ছন্ন

আকাশ দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। কল্পনা করিল, আজিকার রাত্রিটি গতরাত্রির চেয়েও সুন্দর হইবে। আজ চাঁদ এক কলা বাড়িবে যে! সে ঝুলনের বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মাথালি মাথায় দিয়া সে বড় পিঁড়েখানি ঘরে আনিয়া তুলিল। ধুইয়া মুছিয়া তাহাতে আলপনা আঁকিতে বসিল। আলপনায় পাশাপাশি দুইটি পদ্ম সে আঁকিল। তারপর সে দোকানে বাহির হইয়া গেল। যখন ফিরিল, তখন মহান্ত আসিয়াছে। মহান্তকে দেখিয়া কমল কাপড়ের আঁচলে কি যেন লুকাইল। বেশ দেখাইয়াই লুকাইল। কিন্তু রঞ্জন সেদিকে লক্ষ্যই করিল না, সে আপন মনেই বলিতেছিল, জ্বালাতন রে বাপু, সারা দিনরাত টিপটিপ ঝিপঝিপ! হবে তো তাই ভাল করে হয়ে ছেড়ে দে রে বাপু।

কমল বলিল, হোক না বাপু, তোমারই বা কি, আমারই বা কি? কাল কেমন রাতটি হয়েছিল বল দেখি?

রঞ্জন বলিল, হুঁ তা হয়েছিল। কিন্তু জলে কাদায় যে পায়ে হাজা ধরে গেল। তোমার কি বল, তোমার তো জলই ভাল, তুমি যে কমল।

কমল খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এতটুকু আদরেই সে গলিয়া গেল। আঁচলের ভিতর হইতে সে এবার লুকানো জিনিসটি বাহির করিল। বেশ মোটা এক আঁটি দড়ি বাহির করিয়া রঞ্জনের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, দেখ তো।

রঞ্জন এক নজর দৃষ্টি বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি, হবে কি?

কমল তরুণীর মত ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, বাঃ রে, আমি বললাম, দেখ তো জিনিসটা কেমন; আর উনি জিজ্ঞেস করছেন, হবে কি? আগে আমার কথার উত্তর দাও।

একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া রঞ্জন বলিল, দড়ি শক্ত বটে! এখন হবে কি শুনি?

সকৌতুকে কমল বলিল, বল দেখি, কি হবে বল দেখি তুমি কেমন?

রঞ্জন যেন ঈষৎ বিরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, আরে, তাই তো পাঁচবার জিজ্ঞাসা করছি।

কমল বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, বলছি। কিন্তু আগে আর একটা কথার জবাব দাও দেখি, দুজন মানুষের ভার সইবে এতে?

কেন, গলায় দিয়ে ঝুলতে হবে নাকি? তা সইবে।

কমলের মুখ এক মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। এ কথাটাকে সে কিছুতেই রহস্য বলিয়া মনে মনে সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইতে পারিল না। তবুও সে চেষ্টা করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আজ ঝুলন হবে আমাদের। শোবার ঘরে ঝুলনা টাঙাব।

কমলের মুখের দিকে অল্পক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া রঞ্জন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, বলি বয়স বাড়ছে, না কমছে?

রুদ্ধশ্বাসে কমল বলিল, কেন?

রঞ্জনের হাসির ধারায় কমল ভয় পাইয়া গিয়াছিল। রঞ্জন এবার অতি দৃঢ়ভাবে বলিয়া উঠিল, নইলে এখনও তোমার ঝুলনের সাধ হয়! আয়নাতে কি মুখ দেখা যায় না, না, নিজের রূপ খুব ভালই লাগে?

কমলের বুকে যেন ব্যথা ধরিয়া উঠিল। দড়ির গোছাটা হাত হইতে আপনি খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। সে দ্রুতপদে সেখান হইতে পলাইয়া আসিল। তাহার বুকের মধ্যে তখন কান্নার সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে। সে গিয়া ঢুকিল পরী যে ঘরটায় মরিয়াছিল সেই ঘরে। মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কমল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাহার পরীর কথা মনে পড়িয়া গেল। মৃত্যুর দিন সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, রূপ একদিন আমারও ছিল। সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল, এ পরীর বেদনার বিলাপ। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হইল, পরী তাহাকে অভিশাপই দিয়া গিয়াছে।

শুনছ?

ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া রঞ্জন তাহাকে ডাকিল। অশ্রুর লজ্জায় কমল মুখ ফিরাইতে পারিল না, সে নীরবেই পড়িয়া রহিল।

রঞ্জনও বলিল, আমাকে আজ এখুনি আবার যেতে হবে। দিন

তিনেক হবে, বুঝলে ?

তারপর সব নীরব। রঞ্জন উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে নাই, তখনই চলিয়া গিয়াছে। কমল উদাস নেত্রে খোলা জানালার দিকে চাহিয়া পড়িয়া ছিল। মনের মধ্যে সে শুধু ভাবিতেছিল সেই লজ্জা ? কেন এত অবহেলা তাহার ? হঠাৎ সে উঠিয়া বসিল, রঞ্জনের কথাগুলা তাহার মনে পড়িয়া গেল, "আয়নায় কি মুখ দেখ না ?" সে ব্যস্ত হইয়া কুলুঙ্গি হইতে আয়নাখানা পাড়িয়া আপনার মুখের সামনে ধরিল। প্রতিবিম্বের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বাস্তব আজ তাহার চোখে পড়িল। কালের সঙ্গে সঙ্গে তিলে তিলে তাহার যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা চোখে পড়ে নাই এতদিন, আজ পড়িল— সত্যই তো কোথায় সেই প্রাণ-মাতানো রূপ তাহার ? সেই চাঁপার কলির মত রঙ এখনও আছে, কিন্তু সে চিক্কণতা তো আর নাই। চাঁদের ফালির মত সেই কপালখানি আকারে চাঁদের ফালির মতই আছে, কিন্তু তাহাতে যেন গ্রহণ লাগিয়াছে, সে মসৃণ স্বচ্ছতা আর তাহাতে নাই। গালে সে টোলটি এখনও পড়ে, কিন্তু তাহার আশে-পাশে সূক্ষ্ম হইলেও সারি দিয়া রেখা পড়িতে শুরু করিয়াছে—এক দুই তিন। নাকের ডগায় কালো মেচেতার রেশ দেখা দিয়াছে। সেই সে, সেই সব, কিন্তু সে নবীন লাবণ্য তাহার আর নাই। এই দীর্ঘ দিনে পৃথিবীর ধূলা-মাটি তাহাকে ম্লান করিয়াছে। তাড়াতাড়ি সে আয়নাটা বন্ধ করিয়া দিল। আবার তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিল। রঞ্জনের অবহেলার জন্য নয়, তাহার রূপের জন্য কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। কয় ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়া পড়িয়া মাটির বুকে মিশিয়া গেল।

থাকিতে থাকিতে বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়িয়া গেল আর একজনের কথা। বৃদ্ধ-রসিকদাস—বগ-বাবাজীর মুখ বহুদিন পরে তাহার চোখের সম্মুখে যেন ভাসিয়া উঠিল। সেই কৌতুকোজ্জ্বল হাসি-হাসি মুখ। কমলের মনে হইল মহান্ত ব্যঙ্গভরে হাসিতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত অন্তর তাহার প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, না না না। সে তাহাকে বলিত, কৃষ্ণপূজার কমল। সেই তাহার নাম দিয়াছে—

রাই-কমল। কমল শুকায়, কিন্তু রাই-কমল, সে তো কখনও শুকায় না। আবার সে শিহরিয়া উঠিল, মনে পড়িল পরীকে। পরী ব্যঙ্গভরে হাসিতেছে যেন-- সেই জীর্ণ শীর্ণ বীভৎস মরণাতুর মুখ।

তেরো

ইহার কয়দিন পর আকাশ তখনও মেঘলা হইয়া আছে। অপরাহ্ণের দিকে কমল বিগ্রহ-মন্দিরের দাওয়ার উপর বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল। রঞ্জন সেই গিয়াছে, আজও ফেরে নাই। সে যেন কমলকে লুকাইয়া একটা কিছু করিতেছে। কমলও কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নাই। মনের মধ্যে একটি অভিমানহত উদাসীনতা তাহাকে ম্রিয়মাণ করিয়া রাখিয়াছে। সে আপনার মনে মৃদুস্বরে গাহিতেছে—

সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।

বাহিরের আগড় ঠেলিয়া কে যেন প্রবেশ করিল। কমল চাহিয়া দেখিল, সে রঞ্জন। রঞ্জনের বেশে আজ পরম পারিপাট্য ছিল। কপালে চন্দনের তিলক, গলায় ফুলের মালা, পরনে রেশমী বহির্বাস, গলায় উত্তরীয়। কমল মুগ্ধ হইয়া গেল। রঞ্জন কিশোর সাজিয়া তাহার কাছে ফিরিয়া আসিল! সে সব ভুলিয়া গেল এক মুহূর্তে। সব ভুলিয়া গিয়া সে হাতের মালাগাছি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হউক দেবতার নামে গাঁথা মালা। সেও আজ কিশোরী সাজিবে।

হাসিমুখে কাছে আসিয়া সে বলিল, এ কি, এ যেন নটবর বেশ! দুই হাত তুলিয়া রঞ্জনের গলায় মালা দিতে গেল, কিন্তু পর-মুহূর্তে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত নিশ্চল হইয়া গেল সে, আর্তস্বরে প্রশ্ন করিল, ও কে মহান্ত?

মহান্তের পিছনে ঠিক দরজার মুখে একটি তরুণী দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

মেয়েটি শ্যামাঙ্গী, কিন্তু সর্বাঙ্গব্যাপী একটি চটুলতায় সে

মনোহারিণী। তাহার সে চটুল রূপ ষোলকলায় পূর্ণ বিকশিত। রঞ্জনকে উত্তর দিতে হইল না। মেয়েটি বাড়ি ঢুকিল। অদ্ভুত চপলা মেয়ে, দেখিলেই তাহার প্রকৃতি বুঝা যায়। সর্বাঙ্গে একটি হিল্লোল তুলিয়া হাসিতে হাসিতে সে-ই বলিল, আমি। নতুন সেবাদাসী গো।

তারপর একটু আগাইয়া আসিয়া সে আবার বলিল, তুমিই বুঝি কমল বোষ্টমী—রাই-কমল? তবে যে শুনেছিলাম গাইয়ে-বাজিয়ে বলিয়ে-কইয়ে—রূপে মরি-মরি! ও হরি তুমি এই!

ঠোঁটের আগায় সে একটা পিচ কাটিয়া দিল। ধীরে ধীরে কমল মুখ তুলিল, কিছুক্ষণ রঞ্জনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মুখেও তাহার ফুটিয়া উঠিল বিচিত্র এক হাসি। রঞ্জন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। মেয়েটিও কেমন যেন অভিভূত হইয়া গেল সে-দৃষ্টির সম্মুখে। কমল এইবার কথা বলিল, হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, আমিই রাই-কমল। এখন এস, মহান্তকে পাশে নিয়ে দাঁড়াও দেখি—বরণ করে ঘরে তুলি। দাঁড়াও, পিঁড়িখানা নিয়ে আসি।

ঝুলনের জন্য আলপনা-আঁকা পিঁড়িখানা আনিয়া সে পাতিয়া দিল। সেদিনের সে আলপনা আজও ঝকঝক করিতেছে, দুইজনের জন্য দুই পাশে দুইটি পদ্ম। দেব-মন্দির হইতে শঙ্খঘণ্টা বাহির করিয়া আনিল, জল ভরিয়া ঘট পাতিয়া দিল, তারপর বলিল, পিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়াও।

রঞ্জন বলিল, থাক।

হাসিয়া কমল বলিল, এ যে করণীয় কাজ গো। ছিঃ, উঠে দাঁড়াও, আমি বরণ করি।

সন্ধ্যায় সে নিজের হাতে ফুলশয্যা সাজাইয়া দিল। আপনি শুইতে গেল, পরী যে ঘরে মরিয়াছিল, সেই ঘরে।

পরদিন সকালে উঠিয়া কমল স্নান করিয়া দেবতার ঘরে ঢুকিয়া বসিল, অনেকক্ষণ পর ঘর হইতে বাহির হইয়া রঞ্জন ও নূতন বৈষ্ণবীর বাসর-দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইল। দরজা খোলা, উঁকি মারিয়া দেখিল,

রঞ্জন শুইয়া নাই। এদিক ওদিক সে খুঁজিয়া দেখিল। না, রঞ্জন বাড়িতে নাই। কমল অগত্যা পরীর ঘরেই বসিয়া রহিল। ও-ঘরে তরুণীটি এখনও ঘুমাইতেছে।

কিছুক্ষণ পর রঞ্জন ফিরিল। কমলকে দেখিয়া সে লজ্জিত হইল, ব্যস্ত হইয়া বলিল, কি বিপদ, রাখালটা আসে নাই! সে তাহাকে আড়াল দিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে। হাসিয়া কমল ডাকিল, লঙ্কা! দীর্ঘকাল পর সে রঞ্জনকে 'লঙ্কা' বলিয়া ডাকিল। এতদিন হয় 'ওগো' বলিয়াছে, অথবা 'মহান্ত'।

রঞ্জন নতমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কমল হাসিয়া কহিল, এমন লুকিয়ে ফিরছ কেন বল তো?

নতচক্ষেই রঞ্জন বলিল, আমায় মাপ কর কমল।

প্রশান্তকণ্ঠে কমল উত্তর দিল, আর 'কমল' নয়, 'চিনি' বল। বহুকাল পরে তুমি আমার 'লঙ্কা', আমি তোমার 'চিনি'। কিন্তু রাগ কি তোমার উপর করতে পারি লঙ্কা? রাগ আমি করি নাই।

ব্যগ্রভাবে রঞ্জন বলিল, সত্যি কথা বল কমল।

না না, 'কমল' নয় 'চিনি' বল।

অগত্যা রঞ্জন বলিল, সত্যি কথা বল চিনি।

কমল হাসিমুখে বলিল, রাগ করি নাই, রাগ করি নাই, রাগ করি নাই—তিন সত্যি করলাম, হল তো?

রঞ্জন এবার আদর করিয়া কমলকে বুকে টানিয়া লইতে গেল। কিন্তু কমল বেশ মর্যাদার সহিত আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, ছিঃ! তুমি লঙ্কা, আমি চিনি।

তারপর ঘরের ভিতর হইতে একটা পোঁটলা বাহির করিয়া কাঁধে তুলিয়া লইল, বলিল, এইবার আমায় বিদেয় দাও।

সে কি?

হ্যাঁ। আমি যাই।

তবে তুমি যে বললে, আমি রাগ করি নাই?

না, রাগ করি নাই। তবে—তবে, পরীর কথা মনে পড়ে তোমার

—যেদিন আমি প্রথম আসি ? আমার এই ভ্রূর পানে তাকিয়ে দেখ, মনে পড়বে।

রঞ্জন নীরবে কমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কমল আবার বলিল, আমিও তো সেই পরীর জাত, আমার বুকে তো মেয়ের পরান আছে লক্ষ্মী। সে সেই আশ্চর্য হাসি হাসিল।

রঞ্জন কমলের হাত ধরিয়া অনুনয় করিয়া বলিল, না না কমল, এ রাজত্ব তোমারই। ও তোমার দাসী হয়ে থাকবে। তুমি তো জান, বৈষ্ণবের সাধনা—রাধারানীর কল্পনা—যৌবন-রূপ—

বাধা দিয়া কমল বলিল, ওরে বাপ রে ! অনেক এগিয়েছ তুমি। তা বটে, যৌবন-রূপ সামনে না থাকলে ধ্যান-ধারণায় বাধা পড়ে, রূপ-রসের উপলব্ধি হয় না, মনে রাধারানী ধরা পড়েন না। ঠিক কথা। একটু হাসিয়া আবার বলিল, তুমি, আমার গুরু গো। তোমার সাধন-পথেই তো যাচ্ছি আমি। আমিও তো বৈষ্ণবী, আমারও তো চাই একটি শ্যাম-কিশোর।

রঞ্জন নির্বাক হইয়া গেল। কমল দুয়ারের কাছে গিয়াছে, তখন সে বলিয়া উঠিল, বলি, তারই সন্ধানে চললে বুঝি ?

কমল রঞ্জনের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ গো, তারই সন্ধানে চলেছি আমি। তুমি আশীর্বাদ কর।

সে হাসিতে, সে স্বরে ব্যঙ্গ নাই, শ্লেষ নাই, ব্যথা নাই ; বিচিত্র সে হাসি—বিচিত্র সে কলস্বর !

কমল পথে বাহির হইয়া পড়িল।

পথ—অজয়ের কূলে কূলে পথ। ঘাট, মাঠ, মাঠের পর গ্রাম। গ্রামের মধ্যে পথের দুই পাশে গৃহস্থের দুয়ার।

বৈষ্ণবী পথের পর পথ পিছনে ফেলিয়া চলে। গৃহস্থের দ্বারে গান গাহিয়া ভিক্ষা চায় বিনীত হাসিমুখে। ভিক্ষা লয় সন্তোষের আশীর্বাদে গৃহস্থের ভিক্ষা-দেওয়া শূন্য পাত্রখানি ভরিয়া দিয়া। পরিতুষ্ট পুরনারীরা ভিক্ষা দিয়া নিমন্ত্রণ করে, আবার এস বোষ্টমী।

হাসিয়া বৈষ্ণবী বলে, তোমাদের দুয়ারেই যে আমাদের ভাণ্ডার, আসব বইকি।

হাটে-বাজারে বৈষ্ণবী গান গায়। রসিক শ্রোতার দল নানা প্রশ্ন করে। বৈষ্ণবী মিষ্ট হাসি হাসিয়া অবগুণ্ঠনটা একটু টানিয়া দেয়। শ্রোতারা হাসিয়া বলে, বোষ্টমীর গান যেমন মিষ্টি, হাসিও তেমনই মিষ্টি।

বৈষ্ণবী হাসিয়া উত্তর দেয়, বৈষ্ণবীর ওই তো সম্বল প্রভু।

পথের ধারে অজয়ের ঘাটের পাশে গাছতলায় সেদিনের ঘরকন্না পাতে ; রান্নার উদ্যোগ করিতে করিতে মনে পড়ে রসিকদাসের কথা। রাই-কমল দুইটি হাত কপালে স্পর্শ করিয়া বার বার বলে, তোমার সাধনা সফল হোক, তোমার সাধনা সফল হোক। অজয়ের ঘাটে নামিয়া সযত্নে অঙ্গমার্জনা করিয়া স্নান করে ; মলিন পরিধেয় সাবান দিয়া কাচিয়া লয়। কাচা ধপধপে কাপড়খানি পরে। তারপর স্নানান্তে দর্পণের সম্মুখে নাকে সযত্নে রসকলি আঁকে। আঁকিতে আঁকিতে অকস্মাৎ চোখ তাহার সজল হইয়া আসে, সে গুনগুন করিয়া মৃদুস্বরে গান ধরে—

সখি বলিতে বিদরে হিয়া
আমারই বঁধুয়া আন্ বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া।

কিন্তু এ গান কোনোদিন সে শেষ করিতে পারে না। অভিশাপের কলি তাহার কণ্ঠে ফোটে না।

মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, তাহার পূর্বের রূপ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সে সেই রাই-কমল। নিজেকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া যায়। সেদিন সে গুনগুন করিয়া গান ধরে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

অজয়ের নির্জন তীর, নিজের গান সে নিজেই শোনে। সব সারিয়া গাছতলার ঘর ভাঙিয়া আবার সে পথ চলে।

(১)

মধুর মধুর বংশী বাজে
কোথা কোন কদমতলীতে
আমি পথের মাঝে পথ হারালাম
ব্রজে চলিতে।
(কোন মহাজন পারে বলিতে)
পোড়ামন ভুল করিলি *
চোখ তুলিলি পথের ধূলা থেকে
রাই যে আমার রাঙা পায়ের
ছাপ গিয়েছে এঁকে,
ঢুকলি ছেড়ে পথের ধূলো
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জগলিতে ॥
অনেক আলোর ঘটায় অনেক
ছটা ঝলোমলো
আমার হাতের মাটীর পিদীম
লাজে নিভাইলো
তখন যে হায় গভীর আঁঠার
কোন পথে ঘাট বলো ললিতে ॥

(২)

প্রাণের রাধার কোন ঠিকানা
কোন ভুবনের কোন ভবনে ?
বলতে পারে কোন সজনী কোন স্বজনে ?
ঘুরে দেশে দেশান্তরে—
এলাম শেষে তেপান্তরে
রাধার দিশে পেলেম নারে শুধাইলাম জনে জনে।
হায় কি তারে পাব নাকো দিশেহারার এ জীবনে ?
মনের চকোর কেঁদে ম'ল (হায়) চাঁদ উঠেছে কোন গগনে
প্রাণের কথার লেখন কলি
লিখে লিখে রাখি তুলি
ডাকঘরে হায় নিলে নাকো
ফিরে দিলে ডাক-পিওনে।

(৩)

কুল আর কলঙ্ক দুয়ের
কারে রাখি বলবে কে—সে ?
কুলে আমার সোনার শয্যে
কলঙ্ক মোর কালো কেশে।
কুল রাখি না শ্যাম রাখি হায়—
কুল রাখিলে শ্যাম যে হারায়—
কুল হারালে অকুল পাথার তল নাই তার ডুবি শেষে।
কুলের সোনার কৌটোতে মোর প্রাণ ভ্রমরার বাস
কালিদহের কালো কমল গন্ধেতে নিশ্বাস।
কুল গিয়েছে শ্যাম গিয়েছে
সোনার রাধা লু-টা-ই-ছে—
তবু রাধা কলঙ্কিনী নাম রটেছে দেশে দেশে—।

পাল-পুকুরের ঘাটের উপরেই প্রকাণ্ড বটগাছটার একটা শিকড় বিশাল অজগরের মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া গর্তের ভিতর মুখ সেঁধাইয়া যেন পিঠে রোদ পোহাইতেছে। পুলিন দাস তাহার উপর হাঁটুভাঙা দ-এর মতো উবু হইয়া বসিয়া জলে খোলামকুচি ছুঁড়িয়া 'ব্যাং-ছুড়ছুড়ি' খেলিতেছিল ; তাহার কাঁধে গামছা, কানে একটা পোড়া বিড়ি।

মিতে বলাই দাস আসিয়া ডাকিল, এই যে পেলা, উঠে আয়, ওরে ও খেপাচণ্ডী, উঠে আয়। খুড়ো যে—

পুলিন হাতের খোলামকুচিটা জলের পরিবর্তে মাটিতে আছড়াইয়া কহিল টেঁসেছে বেটা বুড়ো ?

বলাই সোৎসাহে কহিল, আর দেরি নাই, উঠে আয়।

উভয়েই গ্রামের পথ ধরিল, বলাই আগে, পুলিন পিছনে।

বলা কহিল, খু-উ-ব, আছাড়-বিছেড় করছে।

মাথাটা তাহার প্রায় ঘাড়ের নিকটে হেলিয়া পড়িল, ঠোঁট দুইটা চিবুক পর্যন্ত বাঁকিয়া গেল।

আবার উভয়েই নীরব, রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে। একটা গাই রাস্তার ধারে পতিত জমিতে লম্বা দড়িতে বাঁধা, ঘাস খাইতেছিল। জানি না, পুলিন কোন্ কৌতুকে চট করিয়া বাঁ হাতের দুইটা আঙুলে গাইটার পিঠটা টিপিয়া টিপিয়া ঘড়-ড়-ঘোঁত শব্দে নাসিকা-গর্জন করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গাইটাও মাথা নাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল।

পুলিন সলম্ফে হাত দুই সরিয়া আসিয়া কহিল, মাইরি, কী ত্যাজ রে ! আমার বউটাও ঠিক এমনই, মাথা নেড়েই আছে।

পুলিনচন্দ্রের এক দেহশ্রী ভিন্ন আর কিছুই প্রশংসা করিবার মতো ছিল না।

তাহার দেহখানি সুন্দর, দীর্ঘ আকার, সবল দেহ, বর্ণ গৌর, কোঁকড়া চুল, আর সর্বাঙ্গ বেড়িয়া বেশ একটি মিষ্ট লাবণ্য। এ ছাড়া আর কোনো গুণই ছিল না। বুদ্ধির খ্যাতি তো কোনো কালেই নাই, বাল্যকালেই পাঠশালায় গুরুমহাশয়, 'এক পয়সায় তিনটে আম, তা তিনটে আমের কত দাম' ঝাড়া তিনটি ঘণ্টাতেও বুঝাইতে না পারিয়া নিজেই তাহার বই-দপ্তর গুছাইয়া বগলে পুরিয়া দিয়া কহিয়াছিলেন, বাবা, শুকদেব যে এ জন্মে বৈরাগী-কুলে জন্ম নিয়ে হিসেবে বৈরাগ্য করেছেন, তা জানতাম না। তোমায় পড়ানো আমার কর্ম নয়।

ইহার উপর সে ছিল যেন মূর্তিমান বে-তাল।

মজলিশে হয়তো লঙ্কাকাণ্ডের মতো ভীষণ গম্ভীর আলোচনা চলিতেছে, বুড়া জাম্বুবান হয়তো মন্ত্রণা দিতেছে, মজলিশসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ, সহসা সেখানে পুলিনচন্দ্র যেন কৌতুকের কাতুকুতুতে গুলগুল করিয়া হাসিয়া উঠে—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, এ মাইরি আমার খুড়োকে লিখেছে তেমুণ্ডে বুড়ো—ইয়া চুল, ইয়া দাড়ি, ঠিক ঠিক, জাম্বুবান জাম্বুবান—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ!

আবার হয়তো হনু-ভানুর মিতালির রঙ্গে মজলিশ তো মজলিশ, দেবগণ পর্যন্ত হাসিয়া আকুল, সেখানে পুলিন বিস্ময়ে হতবাক, চক্ষু দুইটা ছানাবড়ার মতো বিস্ফারিত, পাশের লোককে বলে, কি মাইরি যে হাসিস, তার ঠিক নাই। তারপর সোৎসাহে বাহবা দেয়, বলিহারি বাপ [illegible] প্যায়দার চেয়েও তুমি জিন্দে পালোয়ান।

গ্রন্থকারও বাদ যান না, পুলিন কহে, বইটার কিন্তু ভারি চহট মাইরি, এ একবারে অবাকজলপান লাগিয়ে দিয়েছে!

আবার রাবণ-বধে সীতা-উদ্ধারে আনন্দিত শ্রোতৃমণ্ডলী আবেগে জয়ধ্বনি করিয়া উঠে। বিচিত্র পুলিন, বিচিত্র তাহার রসবোধ, সে সজল চক্ষে বলে, আহা-হা এতগুলো বেধবা হল, আহা-হা!

আবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যগ্র অনুসন্ধানে কহে, আচ্ছা, লঙ্কায় তা হলে মাছের সের কত করে হল? এক পয়সা, না দু পয়সা?—তা লেখে নাই?

লোকে তাই বুদ্ধিহীনের উপর রং চড়াইয়া কহে, ক্ষ্যাপা।

পুলিন রাগে না, হাস্যমুখে উত্তর দেয়, অ্যাঁ।

রাগে একজন, আর লজ্জায় দুঃখে মরিয়া যায় আর একজন। দুইজনের প্রথমটি পুলিনের স্ত্রী বয়স আঠারো-উনিশ, গোলগাল আঁট-সাঁট দেহ, নাম গোপিনী।

কিন্তু পুলিন কহে, সাপিনী। পুলিনের নির্বুদ্ধিতার লজ্জায়, খোঁচায় গোপিনী রাগে সাপিনীর মতোই গর্জায়; কথাগুলিও বাহির হয় সাপিনীর জিহ্বার মতোই, লকলকে তীক্ষ্ণ তয়াবহ। নির্বোধ, সর্বজনের হাস্যাস্পদ স্বামীর ঘরে শত লজ্জার মধ্যেও সান্ত্বনার একটি আশ্রয় গোপিনীর মিলিয়াছিল, সে ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যে পুলিনের জন্য লজ্জায় দুঃখে মরমে মরিয়া থাকিত; সে পুলিনের বৃদ্ধ খুড়ো রামদাস মোহান্ত, যাহার সহিত পুলিন জাম্বুবানের সাদৃশ্য দেখিতে পায়।

রামদাসের অবস্থা বেশ ভালোই, মোটা জোতজমা, উঠানে বড় বড় মরাই, ঘরে দুগ্ধবতী গাভী, গ্রামে দু-দশ টাকার তেজারতি।

তবে তাহার চেহারাটা আজ শুধু চুল-দাড়ির জন্যই নয়, চিরকালই কেমন বেয়াড়া বিশ্রী; তাই যৌবনে যখন সে শ্রীমতীকে লইয়া পরম আগ্রহে সংসার পাতিয়াছিল, তখন শ্রীমতী রামদাসের ওই বদ চেহারার জন্যই নাকি তাহার পাতানো সংসারে লাথি মারিয়া কোথায় একদিন উধাও হইয়া গিয়াছিল।

গৃহী-বৈরাগীর বংশধর রামদাস শ্রীমতীর সন্ধানে হরেক রকম তালি দেওয়া আলখাল্লা পরিয়া ঝোলা কাঁধে ভবঘুরে ভিখারী বৈরাগী সাজিল, শোকে সংসারকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল, কিন্তু সংসার তাহাকে ছাড়িল না।

শ্রীমতীর সন্ধান মিলিল না, কিন্তু তাহার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে কোন্ দিন শ্রী আসিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাকে সংসারের দিকে ফিরাইল; তখন ভিক্ষার সঞ্চয়েই তাহার তিনশো টাকা পুঁজি, আর

বাড়ির জোতজমার ধান ঠিকাদার-ভাগদারের কাছে বেশ মোটা হইয়াই জমিয়াছিল। শ্রীমতীর অভাবে রামদাস শ্রীকে লইয়া বেশ আঁটালো করিয়া সংসার বাঁধিল।

পাঁচজনে কহিল, মোহান্ত, এইবার ভালো করে সংসার পাতো, একটি ভালো দেখে বোষ্টমী।

রামদাস কহিল, রাধে, রাধে, ও কথা ছাড়ান দাও দাদা। রাধারানী আমার মনেই ভালো, ধ্যানেই সোজা, বাইরে বেজায় বাঁকা। বাঁকা রায়ের লাঞ্ছনাটাই দেখ না! জয় রাধে, শ্রীমতী শ্রীমতী!

কে একজন স্ত্রী-জাতির কী-একটা নিন্দা করিল, মোহান্ত মাথা নাড়িয়া জিভ কাটিয়া সবিনয়ে প্রতিবাদ করিল, রাধে রাধে ও কথা বোলো না, বলতে নাই। শ্রীমতীর জাত, ওরা সবাই ভালো।

একজন ঠোঁটকাটা কঠোর রসিকতা করিয়া ফেলিল, তা তোমার শ্রীমতী—

মোহান্ত হাসিয়া কহিল, বললাম যে দাদা, শ্রীমতীর জাত ওরা, সুন্দর নিয়েই যে কারবার ওদের। অসুন্দরকে কে কবে পছন্দ করে দাদা?

এই সময় রামদাসের বড় ভাই শ্যামদাস বছর আষ্টেকের ফুটফুটে মাতৃহীন পুলিনকে রাখিয়া মারা গেল। রামদাস পুলিনকে বুকে করিয়া 'না বিইয়াই শ্যামের মা' হইয়া উঠিল।

সুন্দর পুলিন বড় হইল। বৈষ্ণবের ছেলে, কীর্তনের আখড়ায় খোল-করতাল ছাড়িয়া লাঠির আখড়ায় লাঠি ধরিতে শিখিল। বলা সঙ্গী হইল, গাঁজা ধরিল। রামদাস শাসন করিতে পারিল না শুধু দুঃখই করিল; তবু মনে মনে নিজেই সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইল, বেশ একটি গোছালো বউ আসিলেই পুলিন মানুষ হইবে, বোকা বুদ্ধিমান হইবে, ঘর বুঝিবে, না বুঝে ঘর ঘাড়ে চাপিয়া পরিচয় করিয়া লইবে।

রামদাস পুলিনের জন্য পাত্রী খুঁজিতে লাগিল।

সৌরভী বৈষ্ণবী আসিয়া কহিল, মোহান্ত, তা আমার মঞ্জরীর সঙ্গে পুলিনের বিয়ে দাও না কেন? ছেলেবেলার সাথী দুটি, ভাবও খুব—

রামদাস কহিল, রাধে রাধে ; তা যে হয় না সৌরভী, আমরা হলাম জাত-বোষ্টম, আর তোমরা ভেকধারী।

সৌরভী ছিল ধোপার মেয়ে, ভেক লইয়া বৈষ্ণবী হইয়াছে। তাহার মেয়ের সঙ্গে ভাইপোর বিবাহ দিতে রামদাসের রুচি হইল না। না হইলে সৌরভীর মেয়ে মঞ্জরী বেশ সুশ্রী, বেশ নজরে-ধরা মেয়ে। তবে একটু রসোচ্ছলা, যাকে বলে 'ডগমগ' ভাব, সেই ভাবে সে চঞ্চল। চলিতে তাহার দেহে হিল্লোল খেলিয়া যায়, কথা বলিতে হাসি উপচিয়া পড়ে। হাসিতে নিটোল গালে টোল পড়ে, সে গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকাইয়া দাঁড়ায়। অনেক রসকলি কাটে, চূড়া বাঁধিয়া চুল বাঁধে কথার ধরনটা ও তাহার কেমন বাঁকা। লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না। নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না।

মঞ্জরী পুলিনের চেয়ে বছর চারেকের ছোট, বাল্যসাথী, দুইজনের ভাবও খুব। পুলিন সময়ে-অসময়ে মঞ্জরীদের বাড়ি যায়, মঞ্জরী সাদরে অভ্যর্থনা করে. দীপ্তি ফুটিয়া উঠে, রসোচ্ছলা আরও উচ্ছল হইয়া উঠে।

পুলিন বলে, কী হে রসকলি, করছ কী?

দুজনে 'রসকলি' পাতাইয়াছে।

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া সুরে বলে—

"তোমায় আঁকছি হে অঙ্গে যতন করে।"

পুলিন এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পায় না।

অভাব-অভিযোগে কত দিন মঞ্জরীর মা সৌরভী আসিয়া কহে, দেখ লো মঞ্জরী, দুটো টাকা কারু কাছে পাওয়া যায় কিনা, নইলে তোর খাড়ুটা বাঁধা দিতে হবে।

মঞ্জরী বলে, খাড়ু আমি বাঁধা দেব না রসকলি। তুমি টাকা এনে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে বলে, সে কি রসকলির মা, খাড়ু বাঁধা দেবে কি? আমি টাকা এনে দিই।

সৌরভী আপত্তি করিলে মঞ্জরী কহে, কেন, রসকলি কি আমার পর?

খুড়ার তহবিল সন্ধান করিয়া না পাইলে চাউল বিক্রয় করিয়া সে টাকা আনিয়া দেয়।

আবার মঞ্জরী কখনও কখনও পুলিনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, না, তুমি দিতে পাবে না, ও মায়ের চালাকি।

মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া হয়, পুলিন ব্যস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু মঞ্জরী কহে, খবরদার, আড়ি করব।

দশ বছর বয়সেই মঞ্জরীর একবার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু পাত্রটিকে মঞ্জরীর পছন্দ হয় নাই, তাই তাহাকে সে নাকচ করিয়া দিয়াছে। সে বেচারী বহুবার মঞ্জরীর জন্য হাঁটাহাঁটি করিয়া শেষে অন্যত্র বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছে। মঞ্জরীকে ছাড়পত্র করিয়াছে।

নানা কারণে রামদাস সৌরভীকে প্রত্যাখ্যান করিল।

রামদাস সৌরভীকে ফিরাইয়া দিল; সৌরভীও ঘরে গিয়া পুলিনকে ফিরাইয়া দিল, কহিল, বাবা, মেয়ের আমার সোমত্ত বয়েস, তুমি আর এস না। একেই তো পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। মনে ভেবেছিলাম, তোমরা দুটি ছেলেবয়সের সাথী, দু হাত এক করে দিয়ে দেখে চোখ জুড়োব, তোমার কাকা তা দেবে না। আমাকে তো আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে!

কথাটা পুলিনের বড় বাজিল, সে দুই দিন খাইল না, শুইল না, মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল।

রামদাস শেষে রাজী হইল, বেশ, মঞ্জরীর সঙ্গেই পুলিনের বিবাহ হোক।

সময়টা হোলির, রামদাস শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবে। তাই স্থির হইল যে, রামদাস ফিরিলে বিবাহ হইবে।

কিন্তু ওপর-ওয়ালার অভিপ্রায় অন্যরূপ।

শ্রীধামে সহসা একদিন রামদাসের সঙ্গে হারানো শ্রীমতীর দেখা হইয়া গেল। শ্রীমতী তখন গাছতলায় কলেরায় ছটফট করিতেছে, পাশে বারো-তেরো বছরের মেয়ে গোপিনী বসিয়া অঝোর-ঝরে কাঁদিতেছিল।

স্ত্রীলোকটির কাতরানিতে আর বালিকাটির কান্নায় দয়াপরবশ হইয়া রামদাস সাহায্যে অগ্রসর হইয়া রোগিণীর পাশে বসিল, ক্ষণেক তাহার মুখপানে চাহিয়া সাগ্রহে ডাকিল, শ্রীমতী !

রোগযন্ত্রণায় কাতর শ্রীমতী রামদাসের মুখপানে চাহিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, রামদাস উত্তরীয়-প্রান্ত দিয়া চোখ মুছাইয়া দিল। শ্রীমতী তাহার পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আমার যাবার সময় পায়ের ধুলো দাও। আর এই মেয়েটিকে নাও। বড় ভালো মেয়ে, মায়ের মতো নয়, পার তো পুলিনের সঙ্গে বিয়ে দিও। ভয় নেই, অজাতের মেয়ে নয়। সেই যে, বাউল প্রেমদাসকে মনে পড়ে, সেও জাত-বোষ্টম, তারই মেয়ে।

রামদাস কাতর কণ্ঠে কহিল, শ্রীমতী, রাধারানী, আমি যে তোমার তরে আজও শূন্য ঘর বেঁধে বসে আছি।

শ্রীমতী সে কথার কোনো উত্তর দিল না, শুধু কন্যা গোপিনীকে কহিল, মা, এই তোর বাপ, এঁর সঙ্গে যা, আমার চেয়েও আদরে রাখবে। আব একটা কথা গোপিনী, কখনও যেন স্বামী ছাড়িস নি, হই বোষ্টম, থাকুক নিয়ম, তবু ওতে সুখ নেই।

শ্রীমতীকে বৃন্দাবনে বিসর্জন দিয়া গোপিনীকে লইয়া রামদাস বাড়ি ফিরিল।

সৌরভীকে ডাকিয়া পঞ্চাশ, একশো, শেষে দুইশোটি টাকা হাতে দিয়া কহিল, সৌরভী, আমার বাক্যি থেকে খালাস দাও।

একমুঠা টাকা খুঁটে বাঁধিয়া সৌরভী হাসিমুখেই বাড়ি ফিরিল।

সৌরভী মঞ্জরীর জন্য পাত্র ঠিক করিল, কিন্তু মঞ্জরী কহিল, না।

মা শেষে রাগ করিয়া রামদাসের টাকা লইয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেল।

মঞ্জরী দুই দিন কাঁদিল ; তারপর আবার উঠিল, ক্রমে হাসিল, রসকলি কাটিল, কিন্তু বিবাহ করিল না।

এদিকে পুলিনের সঙ্গে গোপিনীর বিবাহ হইয়া গেল। পুলিন যেন মঞ্জরীর নেশা ভুলিল। সে দিন-রাত্রি ঘরেই থাকে, বাড়ির বাহির হয় না, দেখিয়া রামদাস সুখে হাসিল। মঞ্জরী দুই-চারি দিন পুলিনের

অপেক্ষা করিয়া শেষে একদিন চূড়া করিয়া চুল বাঁধিয়া, নাকে রসকলি কাটিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে রামদাসের বাড়িতে আসিয়া উঠিল। রামদাস তখন বাড়িতে ছিল না; উঠানে দাঁড়াইয়া মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া ঘরের রুদ্ধ দ্বারকে উদ্দেশ করিয়াই বলিল, কই হে রসকলি, বউ দেখাও হে!

পুলিন ঘরের ভিতর গোপিনীর সহিত কথা কহিতেছিল, মঞ্জরীর আওয়াজ পাইয়া অন্য দুয়ার দিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। গোপিনী নতমুখে ঘরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। মঞ্জরী ঘরে ঢুকিয়া গোপিনীর ঘোমটা তুলিয়া দেখিয়া ঠোঁটের আগায় পিচ কাটিয়া কহিল, তুমি বউ?

গোপিনী মুখ তুলিয়া চাহিল।

মঞ্জরী আবার কহিল, তা হ্যাঁ বউ, রসকলির তোমাকে পছন্দ হয়েছে?

গোপিনী এবার কথা কহিল, যেন চিমটি কাটিয়া কহিল, না।

মঞ্জরী বলিল, বাঃ, এই যে পাখি পড়ে বেশ! তা হ্যাঁ বউ, কেন পছন্দ হয়নি কিছু জেনেছ?

গোপিনী সেই চিমটি কাটার মতোই কহিল, রসকলি কাটতে জানি না কিনা, তাই।

মঞ্জরী সব বুঝিল, এবার সে হাসিয়া বিস্ময়ের ভঙ্গিতে গালে হাত দিয়া কহিল, ওমা, তাই নাকি? তা আমার কাছে রসকলি কাটা শিখবে বউ?

গোপিনী কহিল, শেখাবে? দেখো, ঠিক তোমার মতনটি হওয়া চাই।

মঞ্জরী কহিল, তাই শেখাব, কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকা চাই। পারবে তো?

গোপিনী কহিল, পারব, কিন্তু তোমার সময় হবে তো? বলি, আসবে কখন? রসময়রা ছাড়বে তো?

মঞ্জরী এবার ঠেকার দিয়া কহিল, আমার রসময়রা নয় অসময়ে এসে সময় দেবে। তোমার রসময় যে এক দণ্ড ছাড়ে না দেখি!

গোপিনী কহিল, ও দুদিন, এখন নতুন নতুন নালতের শাক হে। তারপর বুড়ো গোরু ঠিক দামে গিয়ে পড়বে, ভয় নাই।

মঞ্জরী একটু ঝঙ্কার দিয়া কহিল, তা ভাই, বুড়ো গোরু বেঁধে রাখলেই হয়! যার দড়ি নাই, তার আবার গোরু পোষার শখ কেন?

গোপিনীও এবার একটু ঝঙ্কার দিয়া কহিল, ঘোড়া হলে কি চাবুকের অভাব হয় হে, তা হয় না। যখন গোরু পুষেছি তখন দড়ি কি না জুটবে? বলি, পরনের কাপড়ে আঁচল তো আছে, তাতেই বাঁধব।

মঞ্জরী হাসিয়া কহিল, যদি ছিঁড়ে পালিয়ে যায়?

গোপিনী কহিল, ইস, সাধ্যি কি!

মঞ্জরী কহিল, দেখো।

গোপিনী সেই দম্ভভরেই কহিল, তখন না হয় ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়ে ঝুলব হে, তা বলে জ্যান্তে তো আর ভাগাড়ে দিতে পারি না!

ইহার পর মঞ্জরী আর কথা কহিল না, আচমকাই যেন বাড়ি ফিরিল, তখন মুখখানায় হাসি ছিল না, যেন থমথমে জলভরা মেঘ।

পরদিন হইতে রসকলির বাড়িতে পুলিনের আদর যেন বাড়িয়া গেল। লোক পাঠাইয়া পুলিনকে আনাইল, তাহার লজ্জা ভাঙিয়া দিল। এখন আর পুলিনের গাঁজার আড্ডায় মঞ্জরী ঝঙ্কার দেয় না। সঙ্গী বলাকে দেখিয়া বিরক্ত হয় না। এখন কথায় কথায় মঞ্জরী যেন ঢলিয়া পড়ে। পান দেয়। পুলিন আবার বাড়ি ছাড়িল, পূর্বের চেয়ে যেন শক্ত করিয়া মঞ্জরীর বাড়িতে আড্ডা গাড়িল।

মঞ্জরী মাঝে মাঝে আবার এও বলে, রসকলি, এ তো ভালো কাজ হচ্ছে না।

পুলিন হোঁতকার মতো কহে, কি!

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া বলে, এই—আমার বাড়িতে এমন করে চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে থাকা।

পুলিন তেমনি ভাবেই বলে, কেন?

মঞ্জরী সুর করিয়া গান ধরে—

"পাঁচ সিকের বোষ্টুমী তোমার,
ওহে গোসা করেছে, গোসা করেছে।"

পুলিন কহে, ধেৎ।

গোপিনী সত্য সত্যই রাগ করিল, কিন্তু ভাঙায় কে? যাহার উপর মান, সেই যে মানের মুখে ছাই দিয়া দিল। সে খাবার সময় আসে, দুইটা খায়, দেশের দশের হাস্যাস্পদ হইয়া ফেরে, মঞ্জরীর বাড়ি আড্ডা জমায়, ঘরের পয়সা পর্যন্ত মঞ্জরীর ঘরে তুলিয়া দিয়া আসে। মঞ্জরীর না-কি সোনার নথ হইতেছে, গোপিনী জ্বলিয়া গেল। পুলিন যা দুই-চারটা কথা গোপিনীর সহিত কয়, তা পর্যন্ত মঞ্জরী-বিশোভিত। সেদিন রাত্রে কথায় কথায় নির্বোধ কহিল, রসকলি তোমার কি নাম দিয়েছে জান গো? গোপিনী নয়, সাপিনী। তা সত্যি, সবেতেই তোমার ফোঁস।

গোপিনী একটা জ্বলন্ত অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ হানিয়া ছুটিয়া পলাইল। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বাহিরে কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, সে বলিয়াছিল, যদি আঁচল ছেঁড়ে তবে ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়া ঝুলিবে। উদ্‌ভ্রান্ত ব্যথাহত নারী সত্যই আঁচল ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইতে বসিল। ঘরে পুলিন তখন অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। বুঝি-বা রসকলিকে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া বৃদ্ধ মোহান্ত বাহির হইল, শ্বেতবস্ত্রা গোপিনীকে দেখিয়া চমকিয়া কহিল, কে? একি মা? বাইরে কেন, মা আমার?

গোপিনী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৃদ্ধের স্নেহস্পর্শে তাহার হাতের পাকানো আঁচল এলাইয়া খুলিয়া গেল।

মোহান্ত গোপিনীকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া কহিল, মা, বুড়ো ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ধৈর্য ধর, মা আমার, আমি আশীর্বাদ করছি—ভালো হবে, ভালো হবে তোর।

পুলিনের ব্যবহারে শান্ত স্নেহ-দুর্বল বৃদ্ধ মরমে মরিয়া গেল। কঠোর হইতে চেষ্টা করিল, পয়সায় টান দিল, কথা বন্ধ করিল, কিন্তু তবুও যে পুলিন সেই পুলিনই রহিয়া গেল। অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন!

শুধু রসকলির বাড়িতে বসিয়া বলার সহিত খুড়ার আয়ুর দিন গণনা করিতে লাগিল।

রামদাস কিন্তু বাঁচিতে চাহিয়াছিল, মরমে মরিয়াও গোপিনীর জন্য বাঁচিতে চাহিত। সর্বদা তাহার ভাবনা হইত, সে মরিলে গোপিনীর দশা কি হইবে?

কিন্তু মানুষ অমর নয়, মরণের পরোয়ানা সঙ্গে লইয়াই জন্ম লওয়া। সহসা একদিন রামদাসের তলব-আসিল। মোহান্তের বয়স হইয়াছিল, হাঁপানি ছিল, হঠাৎ একদিন হাঁপানি মৃত্যুর মূর্তিতে বুকে চাপিয়া বসিল।

গোপিনী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া সেবা করিতে বসিল। পাড়াপড়শী আসিয়া জমিল। মোহান্ত যেন কার অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু সে তখন পালপুকুরের ঘাটে বসিয়া 'ব্যাং-ছুড়ছুড়ি' খেলিতেছিল।

পাড়াপড়শী ভিড় জমাইয়া বসিয়া আছে, কেহ বলে, মোহান্ত, হরি বল, বল—জয় রাধারানী!

রাধারানীর জয়গানে চিরমুখরকণ্ঠ চারণ কিন্তু আজ এ সময়ে রাধারানীর ধ্যান করিতে পারিল না। মৃগমায়াচ্ছন্ন রাজা ভারতের মতো শুধু বলিল, মা গোপিনী, কিছু করতে পারলাম না মা।

গোপিনী শেষে আছাড় খাইয়া পড়িল। হায়, তাহার নীড় যে ভাঙিয়া যায়! ভ্রষ্টনীড় বিহঙ্গিনীর ক্রন্দন ছাড়া আর উপায় কী? পাড়ার মেয়েরা দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু কেহ এই গোপিনীকে ধরিতে সাহস করিল না। বুড়া, রোগী, কখন শেষ নিশ্বাস পড়িবে, খাবি খাইয়া মরিবার নোটিসও হয়তো দিবে না। মড়া ছুঁইয়া কে অশুচি হইবে।

ধরিল শেষে একজন। সে মঞ্জরী।

মঞ্জরী আসিয়াই শোকবিহ্বলা গোপিনীকে ধরিল। কহিল, ভয় কী?

মুমূর্ষু মোহান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া টানিয়া টানিয়া কহিল, গ্রামের পাঁচজন আছেন, আমার শেষ ইচ্ছা বলে যাই। আমার স্থাবর সম্পত্তির মালিক হল গোপিনী। আর সকলের কাছে এই ভিক্ষে, ছেলেটাকে যেন ওই বেশ্যের হাত হতে বাঁচিও।

কথাটায় সকলের চক্ষু গিয়া পড়িল মঞ্জরীর উপর। সকলেই ভাবিতেছিল, সে কী করিয়া বসে, সে কী করিয়া বসে! কিন্তু মঞ্জরী গোপিনীর এলানো দেহখানি পরম সান্ত্বনাভরে জড়াইয়া বসিয়া ছিল। বসিয়াই রহিল, চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

মোহান্ত যখন কথাটা আরম্ভ করে, তখনই বলার সঙ্গে পুলিন আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেও কথাটা শুনিল।

কথাটা আজ তাহাকে প্রথম আঘাত দিল, মান-অপমানের স্বাদ আজ সে বুঝি প্রথম বুঝিল।

লোকে তখন মোহান্তের শেষ ইচ্ছার সমালোচনায় ব্যস্ত। পুলিন দাওয়া হইতে নামিয়া পড়িল কেহ লক্ষ্য করিল না; কিন্তু মঞ্জরী ডাকিল, যাচ্ছ কোথা?

পুলিন কহিল, আর এ বাড়িতে নয়।

মঞ্জরী কহিল, ছিঃ এই কি রাগের সময়! এসো, খুড়োর মুখে জল দাও, কানে নাম শোনাও।

পাড়াসুদ্ধ লোক এই বেহায়া মেয়েটার সীমাহীন নির্লজ্জতায় অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মেয়েরা গালে হাত দিল। পুলিনও মঞ্জরীর মুখপানে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে খুড়ার শিয়রে বসিয়া মুখে গঙ্গাজল দিল, ডাকিয়া কহিল, বল কাকা, জয় রাধারানী!

বৃদ্ধ কহিল জয় রাধারানী। দয়া কর মা, অনাথিনী দুঃখিনীকে দয়া কর মা!

বেলা আড়াই প্রহরের সময় রামদাস মরিল, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইতে রাত্রি এক প্রহর হইয়া গেল।

তখন মঞ্জরী গোপিনীকে কহিল, তবে আমি আসি।

গোপিনী বলিল, এসো।

মঞ্জরী চারিদিক চাহিয়া সরলভাবেই কহিল, কত্তা কই? একাটি থাকতে ভয় করবে না তো?

গোপিনীর মনে হইল, মঞ্জরী বুঝি তাহাকে ঠাট্টা করিল। সে উত্তর করিল, আসা-যাওয়া যখন একা, তখন একা থাকতে ভয় করলে চলবে কেন? আর একাই তো থাকা এক রকম।

মঞ্জরী কথাটা গায়ে না লইয়া কহিল, আমি কিন্তু ভাই, একা থাকতে পারতাম না।

গোপিনী কহিল, আমি হলে একা থাকতে যদি না পারতাম, গলায় দড়ি দিতাম, তবু—

মঞ্জরী এবার একটু ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল, বালাই, ষাট, মরব কেন? আসি ভাই, কিন্তু রসকলি গেল কোথায়?

গোপিনী ক্ষিপ্তের মতো কহিল, রসকলি নাকেই আছে, ঘরে গিয়ে আয়না নিয়ে দেখ, পোড়া মুখের উপরেই ঝলমল করছে।

মঞ্জরী এই আকস্মিক আঘাতে যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়াও কিন্তু শেষটা উত্তরের বেলায় বলিয়া ফেলিল, রসকলি তো নিজের নাকেই থাকে বউ, এ যে কেড়ে নেওয়া যায় না! তা তুমি যদি চাও তো না হয় দেবার চেষ্টা করি।

গোপিনী ফোঁস করিয়া বলিয়া দিল, কী বললে তুমি? তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে আমি চাইনে, চাইনে। যাও তুমি, যাও।

কথাগুলি ক্রুদ্ধ এক-নিশ্বাসে বলিয়াই সে ঘরে ঢুকিয়া মঞ্জরীর মুখের উপরেই দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

মঞ্জরী ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিল, বুকের ভিতর তাহার যেন আগুন জ্বলিতেছিল। সাপিনীর এত বিষ! আপনার বিষে হতভাগিনী আপনি জর্জর হইয়া মরুক।

আপন বাড়ি ঢুকিতেই মঞ্জরী দেখিল, পুলিন তাহার দাওয়ার উপর বসিয়া।

মঞ্জরীর দেহ ব্যাপিয়া একটা হিল্লোল বহিয়া গেল। হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল।

পুলিন উঠিয়া কহিল, রসকলি!

মঞ্জরী হাসিয়া উত্তর দিল, বোসো, বলি।

পুলিন বসিল।

ঘরের তালা খুলিতে খুলিতে মঞ্জরী বলিল, রসকলি, তুমি ভাই সোনাকপালে পুরুষ। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন।

পুলিন খুব রাগিয়াই কহিল, ও ধন আমার ভাদ্দর-বউ, ছুঁতে পাপ।

মঞ্জরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল, আর বউটি? কি গো, চুপ করে রইলে যে! উত্তর দিতে পারলে না? আচ্ছা, আমিই বলে দিই, সে তোমার গলার মালা ঠোঁটের হাসি।

পুলিন কহিল, না রসকলি, হল না, সে আমার গলার ফাঁসি। ঠাট্টা নয় রসকলি, একটা কথা তোমায় বলতে এসেছি, আমি কাল থেকে নিজের বাড়িতে যাব। ও বাড়িতে আর থাকব না।

নিজের বাড়ি অর্থে পুলিনের পৈতৃক বাড়ি। বাস্তব চক্ষে বাড়িটি একটি মূর্তিমন্ত বিভীষিকা, কিন্তু কল্পনায় বাড়িটি বেশ, অর্থাৎ উঠানভরা বনফুল, প্রাচীর ভাঙিয়া সীমা অসীমে মিশিয়াছে, ঘরের ভিতরেও চাঁদের আলো খেলে।

মঞ্জরী কহিল, বেশ, তা ভালো, তারপর খাবে কি করে?

পুলিন চট করিয়াই কহিল, বোষ্টমের ছেলে, ভিক্ষে করে খাব।

মঞ্জরী কহিল, আরও ভালো; কিন্তু ভিক্ষেতে মেলে তো চাল, তা রাঁধবে কে? বউকে নিয়ে যাও।

পুলিন প্রবল প্রতিবাদে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

মঞ্জরী কহিল, কেন? আর তুমি 'না' বললেও সে যদি না ছাড়ে?

পুলিন কহিল, ছাড়বে না? মারের চোটে ভূত ছাড়ে, তা জান? হুঁ-হুঁ, কথায় আছে, 'পড়লে পরে দুধু ভাতু, না পড়লে ঠেঙার গুঁতু'।

মঞ্জরী কহিল, বেশ। রসকলি আমার বলে ভালো, এ যেন সেই, 'ও পারেতে ধান পেকেছে লম্বা লম্বা শীষ, টুকুস করে মরে গেল লঙ্কার রাবণ'। তা যেন হল, আজ রাত্রের মতো তো বাড়ি যাও।

পুলিন বলিল, না, আর নয়।

মঞ্জরী পরিহাস-ছলেই কহিল, তবে আজ রাতটা পালপুকুরের বটগাছেই কাটাবে নাকি?

পুলিন কহিল, না, তোমার দাওয়াতেই পড়ে থাকব।

মঞ্জরী হাসিল, দুই আর দুইয়ে চার হয়—এ কথাটা যে বুঝে না, সে চারের গুরুত্ব না বুঝিলে তাহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি?

তবু সে বলিল, লোকে বলবে কী?

পুলিন বাহির-দরজার দিকে ফিরিল।

মঞ্জরী কহিল, যাও কোথা?

পুলিন কহিল, দেখি, কোথাও—

মঞ্জরী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, যেতে হবে না, এসো, শোবে এসো।

পুলিন ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, লোকে বলবে কী?

মঞ্জরী কহিল, যা বলবার তারা বলেই নিয়েছে, আবার বলবে কী? শোননি,-আজই তোমার কাকা বললে, ওই—

পুলিন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোমার পায়ে ধরি রসকলি, ছি, ও কথা তুমি বোলো না।

মঞ্জরী হাসিয়া মৃদুস্বরে গান ধরিল—

> 'লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী,
> সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী।'

পুলিন তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, স্পর্শে তাহার সে কি উত্তাপ! মঞ্জরী মৃদু আকর্ষণে হাতখানি ছাড়াইয়া শান্ত মধুর কণ্ঠে কহিল, ছাড়ো, বিছানা করি।

তকতকে ঘরখানি, লাল মাটি দিয়া নিকানো, আলপনার বিচিত্র ছাঁদে চিত্রিত; দেওয়ালে খান-কয়েক পট—সেই পুরানো গোরাচাঁদ, জগন্নাথ, যুগল-মিলন; সবগুলির পায়ে চন্দনের চিহ্ন। মেঝের উপর একখানি তক্তাপোশ, একদিকে পরিষ্কার বেদীর উপর ঝকঝকে বাসনগুলি সাজানো।

তক্তাপোশের উপর গুটানো বিছানা বিছাইয়া দিয়া একটি ছোট চৌকির উপর রক্ষিত তোলা-বিছানার গাদা হইতে দেখিয়া দেখিয়া একখানা 'সিজুনি' আনিয়া পুরাতন বিছানার উপর বিছাইয়া দিল। সিজুনিটি মঞ্জরীর নিজের হাতে অতি যত্নে প্রস্তুত, চারুশিল্পের অপরূপ ছাঁদ বিচিত্রিত। বিছানাটি বেশ করিয়া কয়বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া ডাকিল, এসো।

পুলিন ঘরে আসিয়া তক্তাপোশে বসিল। দেখিল, মঞ্জরী অভ্যাস-মতো ঈষৎ বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া।—সেই হাসি, সেই সব; শুধু দৃষ্টিটুকু নূতন। সে তখন মুগ্ধ, আবিষ্ট, একাগ্র।

পুলিন কথা কহিল, ভাবটা গদগদ কিন্তু সঙ্কুচিত, রসকলি!

মঞ্জরী চমক ভাঙিয়া কহিল, কি গো?

পুলিন কহিল, তুমি—তুমি—আমার—আমার—আমার—

কথাটা শেষ করিতে পারিল না, প্রতিবারই বাধিয়া যায়, আর পুলিন রাঙা হইয়া উঠে।

মঞ্জরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার—তোমার—তোমার কি গো?

কৌতুকে গ্রীবা বাঁকাইয়া খানিকক্ষণ পুলিনের নত লজ্জিত মুখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টি হানিয়া সহসা মঞ্জরী তাহার মুখ পুলিনের কানের কাছে লইয়া গিয়া বলিল, আমি তো তোমারই গো।

কথাটা বলিয়াই সে চট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, চঞ্চল লঘুগতিতে, ছোট ত্বরিতগতি ঝরনাটির মতোই। বাহিরে গিয়াই দরজা টানিয়া শিকল আঁটিয়া দিল। একরাশ দমকা দখিনা বাতাস আসিয়া যেন পুলিনকে তৃপ্ত করিয়া আচমকাই চলিয়া গেল।

শিকল টানিয়া দিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ঢেঁকিশালায় আসিয়া মঞ্জরী আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রিতে পুলিন আসে নাই, বেলা এক-প্রহর হইয়া গেল, তবুও দেখা নাই। গোপিনী অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, সহসা সে সব ঝাড়িয়া

ফেলিয়া উঠিল, স্নান সারিয়া রান্না চড়ালই।

খুট করিয়া শব্দ হইল, ওই বুঝি আসিল! প্রবল অভিমানে ব্যগ্র দৃষ্টিকে রান্নার কড়ায় সে নিবিষ্ট করিল, হাতের খুন্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত অতি বিক্রমে ঘুরিয়া উঠিল, খন—খন—খন।

এই বুঝি ডাকে, সাপিনী হে!

পোষা বিড়ালটা দাওয়ায় লাফাইয়া উঠিয়া ডাকিল, ম্যাও—ম্যাও—ম্যাও।

আর দৃষ্টি মানিল না, ফিরিল, কিন্তু কই? শূন্য অঙ্গন, ভেজানো বহির্দ্বার—মানুষের বার্তা তো দিল না!

হাতের খুন্তিটা সজোরে বিড়ালটার পিঠে হানিয়া গোপিনী গালি পাড়িল, বেরো, বেরো, বেরো, আপদ বেরো।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, গোপিনীর মনে হইল, বুঝি বা একটা যুগ।

সহসা বহিদ্বার খুলিয়া বলাই আসিয়া দাওয়ায় বসিল। হাতের হুঁকা টানিতে টানিতে কহিল, শুনেছ মিতেনী, কাল রেতে মিতে যে মঞ্জরীর বাড়িতে--

বলাই পুলিনের মিতে, তাই গোপিনীকে ডাকিত—মিতেনী, গোপিনী ডাকিত—মিতে।

গোপিনী কহিল, শুনি নাই, তবে জানি।

বলাই বলিল, আবার নিজের ঘর সাফ হচ্ছে, সেইখানেই থাকবে, এ বাড়িতে থাকবে না।

একটা লজ্জা ঢাকিতে পাঁচটা লজ্জা মাথায় লইতে হয়। গোপিনী কহিল, আমিই যে থাকতে দেব না, সে আমি কাল বলে দিয়েছি, বাড়ি ঢুকলে ঝাঁটার বাড়ি দেব।

বলাই বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া বলিল, ও, বুঝি এত! আবার মঞ্জরীকে পত্র করবে!

বুকে পাথর চাপা দিলেও মানুষ কাতরাইতে পারে, কিন্তু এই কথাটা এমন স্থানে গোপিনীকে আঘাত করিল যে, সে আর কথা কহিতে পারিল না।

বলাই কহিল, কাল রেতে জমিদার গাঁয়ে এসেছেন, তুমি নালিশ কর।

গোপিনী দীপ্ত প্রতিবাদে কহিল, না।

তারপর উভয়েই নীরব ; গোপিনীর হাতের খুন্তি নড়ে না, চোখ কড়ার উপর কিন্তু দৃষ্টি নয়, পলকও পড়ে না।

বলাই মনে মনে কি যেন নক্‌শ করিতেছিল, শেষে দালালির ভঙ্গিতে রসান দিয়া কহিল, বেশ বলেছ, সেই ভালো, ও 'দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভালো'।

তারপর আবার হুঁকায় টান পড়িল—ফড়র ফড়র। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, আমাদের তো ছিঁড়লে মালা গাঁথতে আছে, ভাবনাই বা কি! ভাত থাকলে কি কাকের অভাব হয়, কি বল মিতেনী? আমি রয়েছি, সব ঠিক করে দেব তোমার।

পরিশেষে সম্মতির আশায় মিতেনীর মুখপানে চাহিল।

মিতেনী কোনো কথার উত্তর না দিয়ে ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রান্না পুড়িতে লাগিল।

পুলিন কোদালি হাতে বাড়ি সাফ করিতেছিল। 'অনভ্যাসের ফোঁটায় কপ্পাল চড়চড় করে' পুলিন ঘামিয়া যেন নাহিয়া উঠিয়াছে। হাত টাটাইয়া উঠিয়াছে, তবু কাজ সারা চাই। স্ত্রীলোকের অন্নদাস, ছিঃ—তার বড় লজ্জা আর কি!

মিতে বলাই আসিয়া কহিল, ভ্যালা রে মিতে, তা ভালো।

পুলিন কোদালি নামাইয়া বলিল, কল্কেতে কিছু আছে? হুঁকো লয়, অশুচ আমার।

বলা কলিকাটা খসাইয়া পুলিনকে দিল। ধুতরো-ফুলি ছাঁদে হাত ফাঁদিয়া পুলিন টান মারিল—হুশ, হুশ, হু—শ।

বলাই কহিল তা এক কাজ করলি না কেন মিতে? জমিদার এসেছেন, তাঁর কাছে পাড়লে একবার হত না! তোর হল সোদর খুড়ো, আর ওর সৎবাবা, ওয়ারিশ হলি তুই, ও মাগী সম্পত্তির কে? চল তু একবার, দেখবি এখুনি তোর সম্পত্তি তোর হবে।

অদ্ভুত পুলিন, বিচিত্র তার সংসার-বোধ, সে কহিল, ওর কী হবে?

বলাই বলিল, তোর বউ—তুই খেতে দিবি।

পুলিন কহিল, না, না, আমি যে রসকলিকে—

বলাই সোৎসাহে কহিল, রসকলিকে পত্র করবি, ও মরুক গে—যা মন করুক গে। তোর কি?

সে যে নেহাত অমানুষী নয়, হাজার হউক সে স্ত্রী। মনটা পুলিনের মোচড় দিয়া উঠিল। পূর্বে তাহার সান্ত্বনা ছিল, তাহার প্রাপ্য ধনমূল্যে গোপিনীর নিকট মুক্তি পাইবার হকদার সে।

পুলিন বলিল, না মিতে, তা হয় না।

যেমন দেবা, তেমনি দেবী!—বলাই বিরক্তভাবে উঠিল, রাস্তা ধরিল জমিদারের কাছারির পানে।

পুলিন ভাঙা দাওয়াটার উপর ভাবিতে বসিল।

জমিদারের পশ্চিমা চাপরাসী আসিয়া ভাঙা কাঁসরের মতো খনখন করিয়া কহিল, আরে পুলিয়া, আসো, আসো, বাবুর তলব আসে।

পুলিন চমকাইয়া বলিল, ক্যানে, ক্যানে, কাহেসে দারোয়ানজী?

পশ্চিমা কহিল, সো হামি জানে না।

জমিদারের কাছারিতে পুলিন আসিয়া প্রণাম করিল।

বাবু ফরসিতে তামাক টানিতেছিলেন, গোমস্তা কলম পিষিতেছে। কয়জন মাতব্বর এধারে বসিয়া ছিল, আর ওধারে এক পাশে আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সঙ্কুচিতা গোপিনী।

বাবু পুলিনের দিকে চাহিয়া কাছারিকে উদ্দেশ করিয়াই কহিলেন, সে হারামজাদী কই?

রাখাল পাইক বসিয়া ছিল, কহিল, আজ্ঞে, তিনি চানে গেল, আসছেন।

বাবু পুলিনকে বলিলেন, পুলিন, তোমার খুড়োর সম্পত্তি খারিজ করতে হবে।

পুলিন শশব্যস্তে কহিন, আজ্ঞে সম্পত্তি আমার নয়, ওরই।

জোড়হস্তে অঙ্গুলি-নির্দেশে গোপিনীকে দেখাইয়া দিল।

বাবু কহিলেন, ওই হল হে, ওই হল, স্বামী আর স্ত্রী। মুখ থাকতে নাকে ভাত খায় কে হে? আর তুমি থাকতে সম্পত্তির ও কে? ও সম্পত্তি পেলে কি করে? কথা কও গো, চুপ করে থাকলে চলবে না।

অগত্যা গোপিনী মৃদুকণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে, তিনি আমায় দিয়ে গিয়েছেন।

বাবু কহিলেন, তোমাকেই তবে খারিজ করতে হবে, পাঁচশো টাকা লাগবে।

পুলিন বলিল, আজ্ঞে, ও মেয়েমানুষ—

বাবু ধমক দিয়া কহিলেন, তুই থাম বেটা। বল গো, তুমি বল। আবার চুপ করলে যে, উত্তর দাও, পাঁচশো টাকা চাই আমার।

পথভ্রান্তকে যে পথ দেখাইয়া দেয়, সেই পথেই সে চলে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়া গোপিনী পুলিনের কথা ধরিয়াই বলিল, আজ্ঞে, আমি যে মেয়েমানুষ—

বাবু কহিলেন, আরে সম্পত্তি তো মেয়েমানুষ নয়। আচ্ছা, না পার, সম্পত্তি তুমি পুলিনকে ছেড়ে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে বলিল, আজ্ঞে না।

গোপিনীও বলিল, আজ্ঞে না।

বাবু চটিয়া কহিলেন, আচ্ছা, সম্পত্তি সদরে বাজেয়াপ্ত হবে। আর পুলিন, তুই বেটা ওই মঞ্জরীকে নিয়ে গাঁয়ে ঢলাঢলি করছিস কেন? ও সব হবে না, পরিবার নিয়েই থাকতে হবে।

অভিমান অনবুঝ, স্থানকাল জ্ঞান নাই, পুলিন কিছু না বলিতেই গোপিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

প্রতিবাদে বাবু চটিয়া দীপ্তকণ্ঠে কহিলেন, চোপরাও হারামজাদী, ওই পুলিনকে নিয়েই তোকে থাকতে হবে।

গোপিনী আঁতকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঠিক তখনই মঞ্জরী আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, বাবু, আমায় তলব করেছেন?

বাবু মুখ ফিরাইয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। সম্মুখে রসোচ্ছলা মেয়েটি—চূড়ার মতো চুল বাঁধা, নাকে রসকলি আঁকা, মুখে মিষ্ট হাসি, গালে দুইটি ঈষৎ টোল। মঞ্জরীকে দেখিয়া ক্ষণেক তাঁহার কথা সরিল না।

মঞ্জরী পুনরায় বলিল, হুজুর!

চমক ভাঙিয়া বাবু কহিলেন, হ্যাঁ, এসো। শুনছ গো, ওসব চলবে না, পুলিনের সঙ্গেই ঘর করতে হবে।

শেষটা কহিলেন গোপিনীকে। কথার নির্দেশে মঞ্জরীর দৃষ্টি পড়িল ভয়ত্রস্তা গোপিনীর উপর, সে ত্বরিত পদে নিকটে গিয়া গোপিনীকে কাছে টানিয়া লইল।

আশ্বাস লোকে কথাতেও পায়, দৃষ্টিতেও পায়, স্পর্শেও পায়; গোপিনী মঞ্জরীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, রসকলি!

উজ্জ্বল হাসিতে মঞ্জরীর মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, ভয় কি রসকলি?

বাবু পুনরায় কহিলেন, বুঝলে, এই আমার হুকুম। উত্তর দাও, রাজী কি না? শুনছিস পুলিন?

পুলিন গোপিনী উভয়েই নীরব। উত্তর দিল মঞ্জরী, তেমনিই হাসিয়া, হুজুর, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া কি ধমকে মেটে?

বাবু কহিলেন, আলবাত মিটবে, না মিটলে চলবে না।

মঞ্জরী বলিল, নাই যদি মেটে হুজুর, তাই বা কি? আমরা জাতে বোষ্টম, ছিঁড়লে মালা আবার নতুন গাঁথি।

বাবু কহিলেন, বেশ, তবে ও বলাকে পত্র করুক।

ওপাশে বসিয়া বলা মুচকি হাসিল।

গোপিনী প্রবল প্রতিবাদে বলিল, না না।

বাবু কহিলেন, তবে কী মতলব শুনি? কিন্তু আমার রাজ্যে ওসব বদমায়েশি চলবে না।

পুলিন কি একটা প্রতিবাদ করিল, কিন্তু এত ক্ষীণ যে কাহারও খেয়াল আসিল না। সে নড়িয়া-চড়িয়া বসিল, যেন স্থৈর্য আর থাকে

না। গর্তের সাপ ধরা পড়িবার পূর্বে যেমনতর বাহির হইতেও পারে না, অথচ ক্রোধে গর্তের ভিতরে কুণ্ডলী পাকাইয়া যেমন ঘোরে, তেমনই ভাবেই তাহার মনটা পাক খাইতেছিল।

মঞ্জরী কিন্তু বেশ সবিনয়ে সবল প্রতিবাদ করিল, জিভ কাটিয়া সে বলিল, ছি ছি, বাবু, আপনাকে ওসব কথা বলতে নাই।

বাবু অপ্রস্তুত হইয়া মঞ্জরীকে ধমক দিয়া কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তোমারও এখানে থাকা চলছে না, পাঁচজনে তোমার নামে পাঁচ কথা বলছে, তোমায় গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে।

মঞ্জরী সবিনয়ে বলিল. আজ্ঞে, কোথায় যাব? মেয়েমানুষ আমি—

বাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, আচ্ছা. আমার সঙ্গে চল তুমি. আমার বাড়িতে থাকবে।

মঞ্জরী বলল, আজ্ঞে, ঝি-গিরি আমি করতে পারব না।

বাবু কহিলেন, আচ্ছা, কাজ তোমায় করতে হবে না।

মঞ্জরী হাসিয়া বলিল. বাপরে! রানীমা তা হলে ভাত দেবেন কেন?

বাবু এবার বেশ রস দিয়া কহিলেন. সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। আমাদের বাগানে তোমার কুঞ্জ করে দেব, এখানে যেমন আছ তেমনই থাকবে—বলিয়া বাবু হাসিলেন, হাসিটি গেঁজলা রসের মতো. কেমন যেন বিশ্রী কুৎসিত গন্ধের আভাস দেয়।

মঞ্জরী কহিল আমার পোড়ার মুখকে কী আর বলব!—সত্যি-সত্যিই এ মুখে আগুন দিতে হয়। আপনি রাজা. আপনিও শেষ—। না হুজুর, আমি এ গাঁ ছেড়ে কোথাও যাব না. সে যে যা বলবে বলুক।

বাবু মেয়েটার স্পর্ধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, সহসা তিনি উন্মত্তের মতো চীৎকার করিয়া কহিলেন, কেয়া হারামজাদী? ভূত সিং, লাগাও জুত্তি হারামজাদীকো।

বদ্ধ লৌহদ্বার মত্ত হস্তীও ঠেলিয়া খুলিতে পারে না. আবার অর্গল খুলিলে আঘাতের অপেক্ষাও সয় না. খুলিয়া যায়। পুলিনের মনের দরজার ঠিক অর্গলটিতে হাত পড়িতেই সে খুলিয়া গেল, ভিতরের

মানুষটি বাহিরে আসিল, সে একটা ভীষণ দাপে হাঁকিয়া উঠিল, খবরদার !

রাখাল পাইকের শিথিল মুষ্টির লাঠিগাছটা কাড়িয়া লইয়া মাটিতে ঠুকিয়া পুলিন বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা গড়াইত কতদূর কে জানে, কিন্তু লোকে ব্যাপারটা গোটা বুঝিতে না বুঝিতে মঞ্জরী ত্বরিত পদে পুলিন ও গোপিনীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

স্তম্ভিত ভাবটা কাটিতেই বাবু কহিলেন, ভূত সিং !

বলা মৃদুকণ্ঠে কহিল, হুজুর, এই মঞ্জরীর সঙ্গে গোকুলবাটীর থানার দারোগার পরিবারের সঙ্গে খুব শুখ একটু বুঝে—

বলার কথাটা ঢাকিয়া দিয়া লাঠিহস্তে ভূত সিং ঘ্যানঘ্যান করিয়া বলিল, হজৌর, হুকুম !

বাবু কহিলেন, কুছ নেহি, যাও।

মঞ্জরী দুই জনের হাত ধরিয়া আসিয়া উঠিল একেবারে রামদাসের বাড়িতে। সারাটা পথ সে যেন কী ভাবনায় ভোর হইয়া ছিল;— ভাবনা বলিলে ঠিক হয় না, সে যেন একটা আবেশ, একটা নেশা।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই মঞ্জরী দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, একগাছা মোটা লাঠি আনিয়া পুলিনের হাতে দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বাইরে বোসো পাহারাওলা।

পুলিন লাঠি হাতে বাহিরে বসিল, আর ঘরের মেঝেতে বসিয়া নীরবে চোখের জল ফেলিতেছিল দুইটি নারী। গোপিনী নতদৃষ্টিতে, আর মঞ্জরী তাহার মুখের পানে চাহিয়া যেন নেশায় ভোর হইয়া বসিয়া ছিল।

সহসা হাসিয়া সে কহিল, রসকলি !

গোপিনী মুখ তুলিয়া হাসিল, বড় বিষাদের হাসি, যেন মলিন ফুলটি।

মঞ্জরী বলিল, এক কাছারি লোকের সামনে রসকলি পাতিয়েছে, 'না' বললে তো চলবে না।

গোপিনী কহিল, হ্যাঁ।

মঞ্জরী বলিল, তা ভাই, অনুষ্ঠানটা হয়ে যাক, তুমি আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও, আমি তোমায় দিই,—যা নিয়ম তা তো করতে হবে।—বলিয়াই খুঁজিয়া-পাতিয়া সব সরঞ্জাম বাহির করিয়া তিলক মাটি ঘষিতে বসিল।

তারপর গোপিনীর কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া কহিল, তুমি ভাই আগে বলেছ, আগে তোমার পালা দাও, আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও।—বলিয়া নিজের আঁকা রসকলিটি মুছিয়া ফেলিল।

হতভম্ব গোপিনী কম্পিত করে মঞ্জরীর নাকে রসকলি আঁকিয়া দিল।

মঞ্জরী বলিল, দাঁড়াও, সাক্ষী ডাকি।—বলিয়া বাহিরে পুলিনকে ডাকিল, সেই মধুভরা কণ্ঠে, রসকলি, এসো বলি।

পুলিনকে লইয়া গোপিনীর হাতে হাতে নিজের হস্তবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া কহিল, এই নাও রসকলি, আমার রসকলি তোমায় দিলাম।

পুলিনের কথা সরিল না।

তারপর পুলিনকে বলিল, আমি দিচ্ছি, 'না' বোলো না।

গোপিনী ও পুলিন বিস্মিত, নির্বাক।

সহসা গোপিনী মঞ্জরীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, না না, তুমি সুদ্ধ এসো আমরা দু বোনে—

রসোচ্ছলা রসোচ্ছলার মতোই কহিল, দূর, আমি যে রসকলি!

বৈকালের মুখে মঞ্জরী কহিল, দাঁড়াও, আমি একবার গাঁয়ের হালচাল দেখে আসি।

পুলিন বাধা দিয়া কহিল, সে কি একলা?

মঞ্জরী হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল, বলিল, ভয় কি! আমার রসকলি যে সঙ্গে।—বলিয়া নাকের রসকলি দেখাইয়া দিল। তারপর আবার কহিল, ভয় নাই, আমি বাইরে বাইরে খবর নেব, তেমন তেমন বুঝলে আমি গোকুলবাটী থানায় যাব। আজ রাত্রে না ফিরতেওপারি, বুঝলে?

খবরদার, তোমরা বেরিও না, দিব্যি রইল, মাথা খাও।

সে কণ্ঠস্বরে পরিহাসের বিন্দুও ছিল না, পুলিন সে কথা অবহেলা করিতে পারিল না।

মঞ্জরী চলিয়া গেল, রাত্রে ফিরিল না।

পরদিন প্রাতে বলাই আসিয়া ডাকিল, মিতে!

মঞ্জরীর সংবাদের আশায় নিজের বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া দরজা খুলিয়া কহিল, এসো।

বলাই বলিল বেশ বেশ, তা মঞ্জরীকে দিয়ে টাকাটা পাঠালি কেন? নিজে গেলেই তো হত। তা ও বেশ ভালোই হল। বাবুও বললেন, বলাই, পুলিন যখন পঞ্চাশ টাকা জরিমানাই দিলে, তখন আর তার উপর রাগ নাই আমার। তা পুলিন বোধ হয় ভয়ে আসে নাই, তাই মঞ্জরীকে দিয়ে পাঠিয়েছে। মঞ্জরীকেও মাপ হয়ে গিয়েছে। তা একবার আজ যাস, বাবুকে পেন্নাম করে আসিস। ভয় নাই, আমিও সব বলে কয়ে দিয়েছি।

পুলিনের কথা সরিল না।

জমিল না দেখিয়া বার কয়েক হুঁকা টানিয়া বলাই চলিয়া গেল। পুলিন স্তম্ভিতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। কে জানে—কতক্ষণ! একটি পুটলি কাঁখে মঞ্জরী আসিয়া হাসিমুখে অভ্যাসমতো হেলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, রসকলি!

পুলিন কথা কহিল না।

হাসিয়া মঞ্জরী বলিল, রসকলি, রাগ করেছ?

পুলিন অভিমানভরে বলিল, তুমি জমিদারকে—

মঞ্জরী কহিল, জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বাদ করা কি চলে গো? তাই মিটিয়ে ফেললাম।

পুলিন কহিল, টাকা—

মঞ্জরী কথা কাড়িয়া বলিল, সে তো তোমারই গো, আমি কি তোমার পর?

তারপর পুলিনের হাত দুইটি ধরিয়া কহিল, তবে আসি।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো পুলিন বলিল, কোথায়?

মঞ্জরী কহিল, বৃন্দাবন।

পুলিন অভিমান করিয়া বলিল, রসকলি!

মঞ্জরী কহিল, আমি তো তোমারই গো।

গোপিনী দ্বারের পিছনে ছিল, সম্মুখে আসিয়া যেন দাবি করিল, না যেতে পাবে না।

মঞ্জরী বলিল, তীর্থের সাজ খুলে কুকুর হব?

গোপিনী কহিল, বল তবে, ফিরে আসবে?

মঞ্জরী বলিল, আসব।

গোপিনী কহিল, আসবে? দেখো।

উত্তর না দিয়া মঞ্জরী হাসিয়া পুটলিটি তুলিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। বিচিত্র সে হাসি, রহস্যের মায়া-মাধুরীতে ভরা, কে জানে তার অর্থ!

চলিতে চলিতে গান ধরিল -

> "লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী
> সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো,
> আমি গরবিনী।"

নাকে তাহার রসকলি, মুখে তাহার হাসি, চলনে সে কী হিল্লোল, রসধারা যেন সর্বাঙ্গ ছাপাইয়া ঝরিতেছিল।

(৪)

মন জানে না মনের কথা দিশেহারা অভিমানে
পরাণ কেঁদে সারা সখি মনের কথা নাহি জানে।
যার তরে সেই পরাণ কাঁদে
তায় দেখি না কুলের বাদে
চোখ দেখে না নষ্ট চাঁদে, মন মজে হায় তারই ধ্যানে।
গরব রাধার রইল সখি, গরবিনী নাম ছুটেছে
পরাণ হ'ল কাঙালিনী ধুলার তলে ঐ লুটেছে।
শ্যাম যে কাঁদে রাধার তরে—
রাধা কাঁদে অঝোর ঝরে—
নয়ন জলের তুফান সখি যমুনাতে বয় উজানে।

(৫)

আহা—লাল পাগুরী বেঁধে সাথে
রাজা হ'লে মথুরাতে
বাঁশি ছেড়ে দণ্ড হাতে বঁধু হ'লে দণ্ডদাতা
কলঙ্কিনী রাধায় দণ্ড না দিলে মান থাকে কোথা?
এখন আমি নালিশ করি
মাখন চুরি, বসন চুড়ি
শেষে মন অপহরি ফেরারী চোর গেল কোথা?
বেঁধে এসে বিচার কর শুনব না কো ছুতোনাতা।
বঁধু তুমি রাজা হয়ে কেন হ'লে হায় বিধাতা।

(৬)

আমার মনের গোপন কথা যাই বলে গো তোমার চরণতলে
ভাসাও আমায় ভাসাও নয়ন জলে।
চোখের জলের নামলে বাদল ঝরঝর ধারায়—
আমার বাহির ভুবন হারায়—
আমার মন ভুবনের প্রবাল দ্বীপে—সোনার কিরণ ছড়ায়—
এই জীবনের হারামণি সেই কিরণে ঝলমলিয়ে ঝলে—
হারামণি—রত্নমণির প্রদীপ হয়ে জ্বলে—
ভাসাও আমায় ভাসাও নয়ন জলে।

একেই বলে—'কুঁদুলী' ; কোঁদল না পেলে, বেণার মুড়োয় চুল জড়িয়ে 'কোঁদল করে' ; তাও নিজের জন্য নয়, স্বজাত নয়, জ্ঞাতি নয়, এক পরের জন্য। তবে আর লোকের দোষ কি ? লোকে যে কাহুকে গোপনে সাত কুঁদুলী বলে, সেরা কুঁদুলী বলে, সেটা মিথ্যাও নয় আর অন্যায়ও বলে না।

একা মেয়ে দশ-দশজন মেয়ের সঙ্গে কোঁদল বাধাইয়া বসিল। কিন্তু দশজনও কথা বলিতে জানে, তাহারাও কম যায় না। হইলে কি হয়,—কাহুর মুখখানি ত নয় যেন ক্ষুরের ধার, সে তাহাদের গতর, চোখের মাথা খাইয়া বসিল ; দশ-দশটি মেয়ে হাঁফাইয়া উঠিল। এ যেন সেই 'লঙ্কাকাণ্ড' বা 'কুরুক্ষেত্র', কাহুর এক নিক্ষেপে লক্ষ বাণ ধায় চারিভিতে ; প্রতিপক্ষ জর্জর ব্যাকুল।

তুলসী আসিয়া হাত ধরিয়া কাহুকে টানিয়া ঘরে ঢুকাইল,—কহিল—"ছিঃ—"।

এই তুলসীর জন্যই কিন্তু কোঁদল।

কাহু কহিল—"ছি ! ছিঃ কেন শুনি, এমন চোখের মাথা খাব না, এমন জিভ খসে যাবে না।"

—"বলুক না !"

কাহু ঝঙ্কার দিল—"না,—বলবে কে—ন ? বলি বলবে কেন শুনি ? কোন চোখ-খাগীর--"।

বাধা দিয়া তুলসী কহিল,—"আমার মাথা খাস্।"

—"তোর মা—া খাব না ভাবছিস্, তোর মাথাও খাব, জ্ঞাতি আনব, তোর ওই চুলের রাশ কাটব, ঝামা দিয়ে নাকের রসকলি তুলব—তবে অন্য কাজ।"

তুলসী হাসিয়া কহিল—"তাই আন্, পরের সঙ্গে কেন বাপু।"

কাহু ও কথায় কান দিল না, সে তুলসীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া মুগ্ধ-নেত্রে কহিল—"দেখ দেখি—এই রূপে চোখ-খাগীরা কু দেখে? তাদের চোখের মাথা খাব না! এ রূপ গেলে দেখব কি, মুখপুড়ীদের কাল হাঁড়িমুখ, না পোড়াকাঠ!"

তুলসী ঘটনাটাকে সরস করিবার অভিপ্রায়ে মৃদুকণ্ঠে গান ধরিয়া দিল—

"ননদিনীর কথাগুলি নিমে গিমে মাখা,
কালসাপিনীর জিভ্যে যেন বিষে আঁকা বাঁকা,—
আমার দারুণ ননদিনী।"

কাহু একটু হাসিল। তুলসী ভরসা পাইয়া স্নেহভরে কহিল—"ছিঃ ওই সব কি বলে, না ঝগড়া করে?"

কাহু কহিল—"তবে কি বলব শুনি, শ্রীমতী কি বলতে বলেন শুনি?"

তুলসী আবার গান গাহিল—

"ননদিনীর ব'লো নগরে—
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।"

বছর বিশেক বয়স মেয়েটির নাম তুলসী;—'জাত-বোষ্টোম'এর ঘরের মেয়ে, চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হইয়াও তাই পত্যন্তর গ্রহণ করে নাই। 'জাত-বোষ্টোম' পুরুষানুক্রমিক বৈষ্ণব, গৃহস্থের মত ঘর বাঁধিয়া সৎজাতি গৃহস্থের আচার ব্যবহার মানিয়া চলে।

বাউল ভেকধারী বৈষ্ণবেরা 'ছিঁড়লে মালা, নতুন গাঁথে।' অর্থাৎ বৈষ্ণব থাকিতেই মনান্তরে বা এমনি কারণে বৈষ্ণবী নতুন বৈষ্ণবের গলায় মালা, ললাটে চন্দন পরাইয়া মালাচন্দন করে। কিন্তু এরা—এই জাত-বোষ্টোমেরা সৎজাতি গৃহস্থের অনুকরণে বৈষ্ণব থাকিতে মালাচন্দন করা ত দূরের কথা, বিধবা হইয়াও নতুন আশ্রয় গ্রহণ করে না; এ শুধু লজ্জায় নয়, বহুদিন হইতে পালন করিয়া এ আচার তাহাদের সংস্কার; ধর্মের বিধান সত্ত্বেও সংস্কার তাহারা লঙ্ঘন করিতে পারে না।

তুলসীর বাপ যখন মারা যায়—তুলসী তখন তিন বছরের। তুলসীর মা বহু কষ্টেই মেয়েকে পালন করিয়া বড় করিয়া তুলিল। সেও আচার অনুযায়ী বিধবার মত কাটাইয়াছে; তারপর তুলসীর বিবাহ দিল দশ বছর বয়সে। ছেলেটি বারো বছরের। তুলসীর মা বড় সাধ করিয়া এ বিবাহ দিয়াছিল। ছেলেটির একটি সুন্দর সুশ্যাম কমনীয় লাবণ্য ছিল, আর তুলসী ছিল গৌরী ফুটফুটে মেয়েটি; এ যুগল দেখিয়া তাহার চোখ জুড়াইয়া গেল। এ রূপ দেখিয়া বৈষ্ণবী আর একটি যুগল রূপের কল্পনা করিত, সে তাহার ইষ্টরূপ। কিন্তু সে-সাধের মাথায় বাজ হানিয়া মরণ নির্মম হস্তে ষোল বৎসর বয়সেই শ্যাম-কিশোরটির ছবি ধরণীর বুক হইতে মুছিয়া দিল।

তুলসীর বয়স তখন সবে চৌদ্দ, তাহার গৌরী অঙ্গে রূপ সবে অপরূপ হইয়া ফুটিতে সুরু করিয়াছে, দেহ-লাবণ্যে সবে মাদকতার রেশ লাগিয়াছে। সে রূপ তখনও মুগ্ধ করে, মত্ত করে না।

এ আঘাতটা তুলসীর মার বুকে বড় কঠিনভাবে বাজিল। বাজিবারই কথা। অবরুদ্ধ মর্মযাতনায় দেহ তাহার ভাঙিয়া পড়িল। দিবারাত্রি চিন্তা করিয়া মনের সঙ্গে লড়াই করিয়া শেষে সে মনে মনে সংকল্প স্থির করিয়া তুলসীকে কহিল—"তোর, আবার আমি বিয়ে দোব।"

তুলসী বিস্ফারিত নেত্রে মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল,—কথা কহিল না। মা বুঝিতে পারিল না বিস্ময়, কি ভর্ৎসনা; সে কহিল,— "এমন করে তাকিয়ে থাকিস্ না তুলসী, এ আমাদের আছে,—আমরা বোষ্টোম—আমরা ছিঁড়লে মালা নতুন গাঁথি; এ আমাদের ধর্মে আছে, শাস্ত্রে আছে,—শুধু কথার কথা নয়; তবে আমরা সে করি না—গেরস্ত সমাজে নিন্দে হবে বলে। তা না হয় আমরা ভেকধারীর সমাজেই থাকব।"

চৌদ্দ-পনের বছরের মেয়েটি, সদ্য-হারানো কিশোরটিকে ভুলিতে পারে নাই না কি,—

সে কহিল,—"না—মা।"

মা মিনতি করিয়া হাত ধরিয়া কহিল,—"আমার বুকে আর শেল হানিস্ না তুলসী, বিধবার আচার তোর আমি দেখতে পারব না, তোর মুখের হাসি—"

তুলসী হাসিয়া কহিল—"হাসির অভাব কোথা দেখলি তুই ?—আমি হাসি তো,—এই দেখ হাস্‌ছি।"

মা কহিল—"আরও শোন্, মা তোর অমর নয়, আর দেহের অবস্থা ত এই, কোন্ দিন আছি, কোন্ দিন নাই,—কি করে দিন চালাবি মা ?"

"—হরি বোলে,—বোষ্টোমের মেয়ে ভিক্ষে করতে ত লজ্জা নাই,—পাঁচটা দোর ঘুরলেই একটা পেট চলে যাবে ;—তুই আমাকে গান শেখা।"

তুলসীর মা কাঁদিয়া কহিল,—"তুইত' জানিস্ না মা পথের কথা—পথের ওপর রূপের ডালা নিয়ে বেরোনোর বিপদ ; তুলসী, সাপকে এড়িয়ে পথ চলা যায়, কিন্তু পাপকে এড়িয়ে পথ চলা যায় না। তুলসী, আমার কথা শোন্।"

তুলসী কিন্তু মায়ের কথা শুনিল না। জোর করিয়া সে পরদিন হইতে মায়ের সঙ্গে ভিক্ষায় বাহির হইল,—মায়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গান শিখিতে সুরু করিল। বৈষ্ণবের মেয়ে একেবারে যে গান জানিত না তা নয়,—বাল্যকাল হইতেই সে গান গাহিত, তা ছাড়া এদিকে এই গানের দিকে তুলসীর একটা সহজ দখল ছিল,—তুলসীর বাপ মহানন্দ দাস এ অঞ্চলে বেশ একজন দক্ষ সুস্বর গায়ক ছিল, তুলসীর মায়ের শিক্ষা তাহারই কাছে।

তুলসীর মায়ের গলা ছিল বড় মিঠা,—মহানন্দ ওই মিঠা গলার জন্যই শখ করিয়া তাহাকে শিখাইয়াছিল।

সলজ্জা নারী আপত্তি করিলে মহানন্দ কহিয়াছিল—"জান,—এগুলো হচ্ছে ভগবানের দান, এই রূপ, কণ্ঠ, এর অপব্যবহার করতে নাই, এতে তাঁর পুজো করতে হয়। এ গলা তিনি তোমায় দিয়েছেন, এতে তাঁর স্তবগান হবে বলে; আর শিখে রাখ, আমার সম্পত্তির মধ্যে

ত' এইটুকু,—ভালমন্দ কিছু হলে এ ভাঙ্গিয়ে তুমি খেতে পারবে।"

কথাটা যে এমন নিষ্ঠুর সত্য, তাহা সেদিন কেহ ভাবে নাই,—কিন্তু ভবিতব্যের চক্রে সত্য-সত্যই নিষ্ঠুর রূপে সে সত্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

যাক্—কথা হইতেছিল তুলসীর। উত্তরাধিকারসূত্রে তুলসীর সঙ্গীতে একটা যেন স্বচ্ছন্দ অধিকার ছিল, আর তরুণ কণ্ঠখানি ছিল তাহার সরল বাঁশের বাঁশীর মত—সুডৌল, মধুক্ষরা;—আর একবার শুনিলেই গানের সুরখানি সে যেন আপন কণ্ঠে বসাইয়া লইত।

তাহার উপর মায়ের কাছে শিখিল সে সঙ্গীতের কারুশিল্প,—ছলছল হিল্লোল কণ্ঠখানি যখন কম্পনে ভরিয়া উঠিত, তখন সে যেন উপলাহত প্রবাহের জল-তরঙ্গধ্বনি।

তুলসীর গানের আদরও হইল খুব; ওই কণ্ঠ, তাহাতে এমন সুদক্ষ কারুশিল্প—সর্বোপরি কিশোরীর কমনীয় রূপ, আর তাহার ব্যবহারে কথাবার্তায় একটি সংযত সুশান্ত শীলতা!

তুলসী গান করে চোখ দুটি থাকে তাহার মাটির উপর। কথা কহে বিনীত হাসি-মুখে, ভিক্ষা লয় সন্তোষের আশীর্বাদে গৃহস্থের ভিক্ষা-দেওয়া শূন্য অঞ্জলিখানি ভরিয়া;—আদর হইবারই কথা!

পুরনারীরা ভিক্ষা দিয়া নিমন্ত্রণ করে—"আবার এসো তুলসী।"

একদিনেই পরিচয় হইয়া যায়,—যাচিয়া পুরনারীর দল পরিচয় করে।

তুলসী সবিনয়ে হাসিয়া কহে—"আসব বৈ কি মা,—তোমাদের দুয়ারই যে ভিখারীর ভাণ্ডার।"

তুলসী হাসিয়া মাকে পথে কহিল,—"মা! এই তোমার পথ?"

মা তুলসীর মুখপানে চাহিয়া কহিল,—"পথ এই বটে মা, কিন্তু সাপ ত' পথের উপর বাস করে না,—সে দেখা দেয় তার সুবিধে মত।"

দেখা দিলও একদিন।

বেলা তখন ভাঙিয়াছে, সন্ধ্যার বড় দেরী নাই,—মায়ে ঝিয়ে ভিক্ষা সারিয়া গ্রামান্তর হইতে ফিরিতেছে,—গ্রামখানির প্রায় শেষে

বাগানের মধ্যে একখানা প'ড়ো ঘর,—গ্রামের সখের যাত্রার আড্ডা—এইখানে তাহাদের বৈঠক বসে, সেইখান হইতে একটি ছোকরা,—বেশ ফিটফাট,—হাঁকিয়া কহিল—"বোষ্টোমী ও বোষ্টোমী,—বলি— শুনছ, ওগো ও বোষ্টোমী !"

তুলসীর মায়ের বুকখান ধড়াস্ করিয়া উঠিল ; সে কন্যাকে আকর্ষণ করিয়া ভীত মৃদুস্বরে কহিল—"চলে আয় !"

কিন্তু তখন যুবকটি পথের উপর পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়াছে, সে বেশ কটুকণ্ঠেই হাঁকিল—"বলি শুনতে পাও না, না কথা কেয়ার হচ্ছে না গো ?"

ভিতর হইতে একজন কহিল,—"ধরে আন্তো—।"

তুলসী ফিরিল,—মা কঠিনকণ্ঠে কহিল—"তুলসী !"

তুলসী সম্মুখের পানে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল—"বাবুরা কি ব'লচেন শুনে যাই মা তুমিও এস না।"

মাকেও অগত্যা ফিরিতে হইল। তুলসী শান্তভাবে আসিয়া নত হইয়া যুবকটিকে নমস্কার জানাইয়া কহিল,—"অনুমতি করুন, আমাদের বেলা যায় প্রভু।"

তাহার স্বভাবসিদ্ধ শীলতায় এমনি একটি সংযত মহিমা লইয়া সে দাঁড়াইল, যে উচ্ছৃঙ্খল যুবক কয়টিও একটু সংযত না হইয়া পারিল না ; এটা বোধ করি শীলতার একটা ধর্ম,—অপরের সম্ভ্রম একটা জাগাইয়া তুলিবেই।

একজন একটু বেশ সংযত মিষ্টভাবেই কহিল—"তোমরাই গাঁয়ে গান করছিলে, না ?—বড় সুন্দর গান তোমাদের, মেয়েদের ভিড়ে আমরা ভাল ক'রে শুনতে পাইনি, আমাদের দুটো গান শোনাতে হবে।"

তুলসীর মা কহিল—"আজ্ঞে আজ আমাদের বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছে,—"

তুলসী বাধা দিয়া কহিল,—"ছিঃ সে কি মা, ওঁরা আমাদের গান শুনতে চাচ্ছেন—সে আমাদের ভাগ্য, না কি বলতে আছে ?—দাও একতারায় সুর দাও।"

তুলসী খঞ্জনীতে ঝঙ্কার তুলিয়া সেইখানেই বসিয়া একখানি দেহ-তত্ত্বের গান ধরিল; তুলসীর মা শুধু একতারাই বাজাইল, সে গান ধরিল না—কন্যার অতিশীলতায় সে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

বেশ নিপুণতার সহিত গান শেষ করিয়া তুলসী মাকে কহিল—"এই ত হয়ে গেল মা, কতক্ষণ লাগল ? চল এইবার—"

"আর একখানা, আর একখানা,—" চারিদিক হইতে প্রতিবাদ উঠিল—"আর একখানা—!"

একজন আবার বেশ সরসভাবেই কহিল—"বোষ্টুমী তোমরা, তোমাদের মুখে পদাবলীর প্রেমের গান শুনতে ইচ্ছে আমাদের,—ভাবের ভাবুক তোমরা—"

তুলসী কহিল—"আর একদিন এসে শুনিয়ে যাব প্রভু,—বেলা-পানে চেয়ে দেখুন,—আমাদের ফিরতে হবে—।"

বক্তা কহিল,—"তা এইখানেই না হয় আজ থাকবে, খাও দাও,—না আপত্তি আছে—?"

বক্তার কণ্ঠের সরসতায়, ভঙ্গিতে একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু তুলসী তেমনি শীলতাভরে হাত জোড় করিয়া কহিল,—"দেখুন দেখি,—আপত্তি কি থাকতে পারে ? অনাথা স্ত্রীলোক আমরা, আপনারাই তো আমাদের রক্ষক,—বাপ,—ভাই,—অনাথার আশ্রয়,—ভরসা! তবে প্রভু! ঘরে দুখানা থালা কাঁসা আছে, আর তুলসী-মঞ্চ—গরীবের বিগ্রহ-মন্দির, সে মন্দিরে সন্ধ্যা-প্রদীপ পড়বে না,—সে বৈষ্ণবের মহাপাপ!"

অন্তর সাড়া দিল কি দিল না ভগবান জানেন,—কিন্তু এমন ক্ষেত্রে মানুষের চামড়ার খাতিরেও মানুষকে সুশীল হইতে হয়, যুবকটিকেও হইতে হইল, সুশীল বালকের মতই তুলসী ও তুলসীর মাকে তাহাদের বিদায় দিতে হইল।

পথে নীরবে চলিতে চলিতে তুলসী মাকে কহিল—"কি ভাবছ বল ত মা?"

পথ চলিতে চলিতেই মেয়ের মাথায় হাত রাখিয়া মা রুদ্ধকণ্ঠে

কহিল—"আমার বড় ভাবনা ছিল মা, কিন্তু সে ভাবনা আমার ঘুচল ;
—তুই পারবি তুলসী, গোবিন্দ তোকে ভরসা দেবেন।"

তারপর আজ চার বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তুলসীর মা দেহ রাখিয়াছে, তুলসী আজ পূর্ণযুবতী। তাহার ছিপছিপে দেহখানি সবল পরিপুষ্টিতে ভরিয়া উঠিয়াছে ;—লাবণ্য, মুকুলিত তরুর মত ঝলমল করিয়া সারা দেহখানি ব্যাপিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে ;—সে লাবণ্য তাহার অযত্নে অবহেলিত নয়,—তুলসী আপনার দেহের সেবা করে,—রূপের সে মার্জনা করে !—

কোঁকড়া কোঁকড়া, ফুলো ফুলো একপিঠ চুল,—সে চুল লম্বা করিয়া টানিলে জানুদেশে আসিয়া পড়ে,—সেই চুলে সে পরিপাটি করিয়া বিন্যাস করিয়া রাখাল-চূড়া বাঁধে, ঈষৎ বাঁকা নাকটির ঠিক বাঁকটির উপরেই সূক্ষ্ম রেখায় আঁকা শুভ্র তিলকমাটির রসকলি একটি, ঠিক তাহারই উপরে কালো ভ্রূরেখা দুটির মাঝে তিলকমাটির শুভ্র টিপ একটি গোধূলির তারার মত জ্বলজ্বল করে ; নাকে কোন অলঙ্কার নাই, কিন্তু নাকছাবির জন্য ফোঁড়া দাগটি যেন একটি শোভার সৃষ্টি করিয়াছে।

ক্ষারে কাচা শুভ্র মোটা কাপড়খানি সে ললিত তনুখানি ঘেরিয়া বেড়িয়া থাকে,—প্রান্তে সূক্ষ্ম রেখায় জরদা রঙের চুল-পাড়।

ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবায় দু'কণ্ঠি মিহি তুলসীকাঠের মালা।

দেখিয়া সখী কানু বলে—"শোভা কি মালার গুণে, শোভা হয় গলার গুণে।"

তুলসী ঈষৎ হেলান মাথাটি নাড়িয়া হাসে।

কিন্তু দশজনের চোখে এটা ভাল ঠেকিল না। দশজনে দশ কথা কহিল ; গরবিনী মেয়েটির তাতে কিছু আসিয়া যায় না, সে যেমন চলে তেমনি চলে,—যেন দুটি তটরেখার মধ্য দিয়া একটি নদীর স্রোত আপন টানে আপনি চলিয়াছে,—কোন তটচারীর উপলনিক্ষেপে সে-প্রবাহ রুদ্ধও হয় না, ক্ষুব্ধও হয় না, স্বচ্ছন্দ গতি !

ননদিনী কিন্তু জ্বলিয়া উঠিল। ননদিনী তুলসীর মৃত স্বামীর ভগ্নী নয়, ননদিনী কাছু তুলসীর সখী!

কাছু গ্রামের মোড়লদের মেয়ে,—বাপের একমাত্র মেয়ে—বাপের যথাসর্বস্ব পাইয়া বাপের ভিটাতেই স্বামী সন্তান লইয়া বাস করে,—গ্রামের সাত কুঁদুলীর এক কুঁদুলী, লোকে বলে সেরা-কুঁদুলী সেই, তাহারই মাথা লোকে আগে খায়।

মুখরা বলিয়া তুলসী সখ করিয়া কাছুর সহিত ননদিনী পাতাইয়াছিল।

তুলসী বলিত—'ননদিনী'—

কাছু বলিত—'বৌ'!

এই কথাটাই বলিতেছিলাম। কাছু দশজনের কথা সহ্য করিল না, ওই কথা তাহার কানে উঠিতেই সে জ্বলিয়া উঠিত,—দশজনকে সে শত কথা শুনাইয়া দিত;—তুলসী আসিয়া তবে তাহাকে নিরস্ত করিত।

তুলসীর তরুণ জীবনের একটা স্বপ্ন ছিল,—এ রূপে সে শ্যামসুন্দরের পূজা করিবে,—বহু ইতিকথা সে শুনিয়াছে, কত বিগ্রহ প্রাণময় হইয়া প্রাণঢালা পূজা গ্রহণ করিয়াছে—।

আর স্বর্গগতা জননীর চক্ষু ত' আকাশের পার হইতে তাহারই পানে চাহিয়া আছে,—তাহাকে তাহার সংকল্পের দৃঢ়তা দেখাইবে!

সে তাই দেহকে সাজায়,—পরম যত্নে সাজায়;—রূপের জোয়ার তুলিয়া সে শ্যামসুন্দরের পট পূজা করে,—সন্ধ্যায় মাথার উপর ঘৃতদীপ ধরিয়া আরতি করে। কিন্তু বড় দুঃখ তাহার—সে ছবি মূক; সে ছবি হাসে না,—অভয় দেয় না, স্বপ্নেও কখনও দেখা দেয় না।—ধারণাতেও সে তাহার হাসিমুখ কল্পনা করিতে পারে না। কত সময় তাহার মনে জাগে কাছুর সংসার; স্বামীর সঙ্গে হাসি, খেলা, ঝগড়া, খুঁটিনাটি;—তেমন ধারা সে যে কল্পনাও করিতে পারে না! কিন্তু সাধ হয়। সময়ে মনে হয়—পট না হাসুক, বিগ্রহ প্রাণপ্রতিষ্ঠা-করা দেবতা, সে হাসিবে; বিগ্রহ-মন্দিরে তাই সে ছোটে।

গ্রামে, গ্রামান্তরে, তীর্থস্থলে বিগ্রহমূর্তির সম্মুখে সে প্রাণ ঢালিয়া গান গায়, পাষাণের আঁকা অধর যদি ঈষৎ বিকশিত হয়!

পৌষ-সংক্রান্তিতে কেন্দুলীতে মহাপর্ব, বহু পুণ্যকামী তীর্থযাত্রির সমাগম হয়, তুলসীর সেখানে যাওয়া চাই। এই বিগ্রহ-দেবতার উপর অসীম ভরসা ছিল তাহার,— এই ঠাকুরই ত' একদিন জয়দেব গোস্বামীর মহাসমস্যার সমাধান করিয়া কালির আখরে প্রেমিকার জয়ঘোষণা করিয়া নারীচরণে মাথা নত করিয়াছিলেন।

কিন্তু সেখানেও তুলসীর আর ভরসা হয় না; দেবতা আজও হাসে নাই, পাষাণের আপন ধর্ম লইয়া নির্বাক রহিয়া গেছে ;—হাসিবে বলিয়া আর ভরসাও হয় না।

তুলসীর অভিমান হইল, সে সঙ্কল্প করিল, এবার সে গান শুনাইতে যাইবে না।

সংক্রান্তির পূর্বদিন স্নানের সময় ননদিনী তুলসীর দুয়ার খোলা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।— জয়দেবের যাত্রী সকালে রওনা হইয়া গিয়াছে।—

পোড়ামুখীর অসুখ করিল না-কি?—

সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল— "বো!"

তুলসী তখন স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল,—সে ঘরের ভিতর হইতে কহিল,— "দাঁড়া,—আমারও এই হয়েছে।"

—"তোর শরীর ভাল ত?"

তুলসী কর্মশেষে ঘরের বাহির হইয়া মুখের কাছে হাত নাড়িয়া কহিল—"বলি, ও—ওলো— ননদী,—আজকে হঠাৎ হলি যে তুই এমন দরদী? হঠাৎ শরীরের কথা যে?"

—"তবে যে বড় নাগরের ডাক হেলা করে বেলা বাড়াচ্ছিস্;— জয়দেব যাস্‌নি যে?"

—"যাব না।"

—"কেন?"

—"মান করেছি।"

—"মান! সে মান ভাঙায় কে? পাথরের ঠাকুর তার চূড়াও হেলে না, হাতও মেলে না—।"

তুলসী স্বপ্নপ্রবণ চোখে শূন্য সম্মুখপানে চাহিয়া কহিল—"দেখি—!"

ঘাটের পথে ননদিনী আবার কহিল "বৌ, মিছে দেহপাত করিস্ নে,—কলিতে সে হবার নয়।"

তুলসী বোধ করি স্বপ্ন-কল্পনা করিতে করিতেই পথ চলিতেছিল,—সে চকিতভাবে মুখ তুলিয়া কাহুর পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিল।

কাহু কহিল—"এমন করে তাকাস্ না ভাই, ওই তাকানিকে আমার বড় ভয় লাগে।"

তুলসী তবু হাসিল না।

স্নান করিতে করিতে কাহু হাসিয়া কহিল—"তার চেয়ে বৌ আমাকে তোর শ্যাম কর ভাই; আমি তোকে বুকে করে রাখব।"

সে তুলসীর নগ্ন সুন্দর বক্ষে একটি আঙুলের টোকা মারিল।

সে তখন আপন মনে হাত দুটি দিয়া কালো জলে হিল্লোল তুলিতে তুলিতে গাহিতেছিল—

> "সাগরে যাইব, কামনা করিব সাধিব মনের সাধা,
> মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা।"

ফিরিবার পথে তুলসী, কহিল—"তাই ভাল ননদিনী!"

—"কি?"

—"তোকেই আমার শ্যাম করব!"

—"মর্।"

—"সন্ধ্যেতে আসিস্ যেন?"

—"তুই যাস্ ভাই, ছেলেপিলের খাওয়া দাওয়া, চ্যাঁ ভ্যাঁ, সন্ধ্যেতে আমার আসা হবে না।"

—"আচ্ছা যাব। নন্দাই কিছু বলবে না ত?"

—"তাকে রাম মোড়লের মজলিসে তামাক খেতে পাঠিয়ে দোব।"

তুলসী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, প্রেমাস্পদের উপর কি স্বচ্ছন্দ অবাধ আধিকার!

কিন্তু দ্বিপ্রহর না যাইতেই তুলসীর কি হইল কে জানে। সে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া, ছোট একটি পুঁটলি বাঁধিয়া ত্বরিতপদে পথে বাহির হইয়া পড়িল, ননদিনীকে ঘরের চাবি দিয়া, তুলসী-মন্দিরে দীপ দিবার কথা বলিবার অবসরও তাহার হইল না। সে চলিয়াছিল জয়দেব।

যাত্রীর দল ভোরবেলা রওনা হইয়া গিয়াছে, দশ-বারো ক্রোশ পথ, শীতের দিন, রাত্রে ত' হাঁটা যাইবে না!

তুলসী একাই পথ ধরিল, হোক শীতের রাত্রি, দু'পহর পর্যন্ত হাঁটিলেই যাত্রীদলকে ধরা যাইবে। পথে তুলসীর মনে হইল, একখানি কাপড় গামছা ছাড়া কিছুই সে আনে নাই। গায়ের কাপড়খানা বাহির করিয়াও ভুলিয়া আসিল; তুলসী একটু হাসিল। ঠিক সন্ধ্যার মুখেই একখানা গ্রাম পার হইয়া বিস্তীর্ণ মাঠ একখানা, আড়াআড়ি ক্রোশ দুই হইবে, দৈর্ঘ্যে আরও বেশী। আড়াআড়ি এই মাঠখানা পার হইলেই বড় একখানা গ্রাম; ওই গ্রামেই যাত্রীর দল সাধারণতঃ বিশ্রাম করিয়া থাকে। তুলসী ভরসা করিয়া মাঠের বুকেই আগাইয়া পড়িল। সদ্য ফসল-কাটা শুভ্র ক্ষেত, তাহারই মাঝে আইলের উপর দিয়া পায়ে-চলা পথের নিশানা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে; মাথার উপর আকাশে খানা-খানা স্তর-মেঘের মেলা দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত; কিন্তু তবুও অন্ধকার নয়, শুক্লপক্ষের দশমীর চাঁদ মেঘের অন্তরালে। তাহারই জ্যোৎস্নার আভায় ভুবনব্যাপী একটি স্বচ্ছতায় সব কিছু স্পষ্ট না হোক, আবছা দেখা যায়;—শীর্ণ পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া কত স্থানে কত শাখাপ্রশাখা মেলিয়া কত দিকে চলিয়া গিয়াছে।

তুলসী ঠাওর করিয়া পথ চলিতেছিল।

দূরে পশ্চিমে ওই অন্ধকার রাশির মত গ্রামের বৃক্ষশীর্ষ তাহার লক্ষ্য; কিন্তু সে অন্ধকার-লেখা চারিদিকেই। তাহার উপর শীতের

সন্ধ্যায় কোন দূরাগত ধূমরাশি কি কুহেলিকা মাঠের বুকে চারিধারে জমিয়া আছে। যেন ক্ষেতের বুকে সাদা মেঘ নামিয়াছে। তুলসী চলিয়াছেই, মাথার উপরে কাটা-কাটা মেঘের ফাঁক দিয়া আলো-আঁধারির খেলা খেলিতে সঙ্গে সঙ্গে চাঁদও চলিয়াছে; কিন্তু পথ যে ফুরায় না।

পথ ভুল হইল না ত'? চারিদিকেই ত' পথ!

তুলসী মাঠের উপর থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। উপরে চাঁদ তখন প্রায় মাথার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে; রাত্রি ত' অনেক হইয়াছে। চারিপাশে তাকাইয়া দেখে—সে সেই মাঠেরই মধ্যে, গ্রাম সেই দূরে, একটুও আগাইয়া আসে নাই!

কান্না পাইল তুলসীর!

এই সীমা-হারা প্রান্তরে একা সে ভুল পথে ঘুরিয়া মরিতেছে। এমন ভুল সে কেন করিল! কে পথ দেখাইবে? কতক্ষণ দাঁড়াইয়া কাটিয়া গেল কে জানে। সহসা তাহার কানে আসিয়া পশিল কোন পথচারীর কণ্ঠস্বর, পথিক যেন গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে।

তুলসী চমকিয়া উঠিল, সে ত্বরিতপদে স্বর লক্ষ্য করিয়া চলিল;—ওই ওই মানুষের কায়া ছায়ার মত দেখা যায়।

তুলসী উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"কে—গো!"

আবার ডাকিল—"ওগো কে গো তুমি! একটু দাঁড়াও!"

পথিক শুধু দাঁড়াইল না, শব্দলক্ষ্যে ফিরিয়া কহিল—"কে—কে তুমি?" বলিয়া সে এই দিকেই হাঁটিতে শুরু করিল। আলি-পথের একটি বাঁকের উপরেই দু'জনের দেখা হইল; তুলসীর নয়নে তখন একটা স্বপ্ন-ভরা দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি দিয়া সে দেখিল পথিক যুবা। শুধু যুবা নয়, রূপও আছে তার।

গরবিনী, মর্যাদাশালিনী এই মেয়েটি সে রূপ দেখিয়া কেমন অননুভূত লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

পুরুষটি দেখিল অপরূপ একটি নারী; ঠিক এই সময়েই চাঁদ

উঠিল। সলজ্জা তুলসী চোখ দুটি নত করিল ; পুরুষটি সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

সহসা শুভ্র জ্যোৎস্না ম্লান ছায়ামাখা হইয়া গেল, চাঁদ আবার মেঘে ঢাকা পড়িল। দৃষ্টি বাধা পাইতেই পুরুষটির মোহ যেন ভাঙিল, সে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাবে তুমি ?"

তুলসী উত্তর দিতে পারিল না।

তুলসীর মনে একটি গোপন আশা হইয়াছিল ;—কিন্তু এ তো সে নয়! ছায়াম্লান জ্যোৎস্নাতে শুভ্র ক্ষেতের বুকে তাহার দেহের দীর্ঘ ছায়াখানি বাঁকাভাবে পড়িয়া আছে; এ নিতান্তই রক্ত-মাংসের মানুষ ; কিন্তু তবু তুলসীর সদ্যসঞ্জাত বুকভরা লজ্জিত মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হইল না।

পথিকটির পরিচয়ও পাওয়া গেল,—'সন্ধ্যা জোল' গ্রামের আখড়ার মোহনদাস মহান্ত।

তুলসী কিন্তু আপন পরিচয় দিতে পারিল না, তাহার চোখ ওঠে না, বুকের ভিতরটা লজ্জায় কেমন দুরু দুরু করে, কণ্ঠে স্বর ফোটে না, সে বহুকষ্টে জানাইল—সে জয়দেবের যাত্রী, যাত্রীর সঙ্গ ধরিতে পারে নাই, মাঠে পথ ভুলিয়া ঘুরিতেছিল।

কথা কয়টা অনুমান করিয়া মহান্তই কহিল,—তুলসী শুধু হুঁ বলিয়া গেল।

মোহনদাস আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা—কি ? সদ্‌গোপ ?"

তুলসী মৃদুস্বরে কহিল,—"না, বোষ্টোম !"

— 'বৈষ্ণবী ! তা তোমার,"—মহান্ত প্রশ্নটা সম্পূর্ণ করিতে পারিল না. নীরবে পথ চলিতে চলিতে কহিল—"তা তোমার মহান্ত, —" এবারও প্রশ্নটা রহিয়া গেল।

এ কথার উত্তর তুলসী বহুবার বহু রসিক প্রশ্নকারীকে দিয়াছে—, নতচক্ষে অপূর্ব শীলতার সহিত কহিয়াছে—'আমি জাত বোষ্টোমের মেয়ে, আমি বিধবা।' আজ কিন্তু পারিল না।

মহান্ত আবার কহিল,—"আমিও জয়দেবধাম যাব, তুমি কি

আমার সঙ্গে যাবে,—না পথে আপন যাত্রীর খোঁজ করবে ?"

তুলসী পিছন-পিছন চলিতে চলিতে কহিল—"যাব।"

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে শীত ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তার উপরে মেঘলা রাত্রির উত্তর বায়ু,—তুলসী কাঁপিতেছিল ; সে শীতবস্ত্রখানি বাহির করিয়া রাখিয়াও আনিতে ভুলিয়াছে।

মহান্ত কহিল—"তুমি যে শীতে কাঁপছ, গায়ের কাপড় বুঝি পুঁটলিতে আছে। বের করে গায়ে দাও—।"

তুলসী—মৃদুস্বরে বলল—"থাক।"

—"থাক নয়, গায়ে দাও, এ ঠাণ্ডায় কঠিন অসুখ করতে পারে।"

এবার বাধ্য হইয়া তুলসীকে জানাইতে হইল—সে গায়ের কাপড় আনিতে ভুলিয়াছে।

—"তাইত ;—এক কাজ কর, আমার গায়ের কাপড়খানা—"

—"না—না—থাক্। আপনারও ত মানুষের দেহ।"

আবার চলিতে চলিতে মহান্ত কহিল—"দেখ—এছাড়া আমার কাছে নতুন শীতবস্ত্র দু'খানা আছে, তুমি একখানা নাও, গায়ে দাও। আমার কথায় না বলো না।"

বলিয়া সে আপন পোঁটলা হইতে দু'খানা শীতবস্ত্র বাহির করিল, একখানা নীল অপরখানা হলদে। নীল গায়ের কাপড়খানা সে তুলসীর দিকে তুলিয়া ধরিল, "নাও, নাও, না করো না,—পথের সাথীকে পর ভাবতে নাই, ধর।"

তুলসীকে অগত্যা লইতে হইল ; নীল গায়ের কাপড়খানি তাহাকে মানাইল ভাল।

মহান্ত তাহার পানে তাকাইয়া কহিল—"না, আমার দেওয়া মিছে হয়নি—"

আবার চলিতে চলিতে মহান্ত কহিল—"প্রতিবার আমি জয়দেবের বিগ্রহকে শীতবস্ত্র ভেট দিয়া থাকি,—শ্যামচাঁদের কাপড়ের রং হলদে —আর রাধারাণীর অঙ্গে নীল বসনই মানায় ভাল।"

তুলসী লজ্জায় মরিয়া গেল।

জয়দেব হইতে ফিরিয়া তুলসী যেন আর একটি হইয়া গেল। যে অপূর্ব শীলতার মর্যাদায় সে স্বচ্ছন্দে পুরুষকে এড়াইয়া চলিত, সে শক্তি যেন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, এখন যেন তাহার বুক কাঁপে। স্বচ্ছ-বারি প্রবাহিনীর মত জীবনের ধারা যে তাহার স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়াছিল, একটা অচিন্ত্য বাঁকের মুখে আসিয়া সে গতি যেন সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল, তেমন সহজ আনন্দে পূজায় ভিক্ষায় দিনগুলি আর কাটিয়া যায় না, সরল আজ জটিল হইয়া পড়িয়াছে, সহজ কঠিন হইয়াছে, আনন্দ যেন নীরস হইয়া গিয়াছে।

কাহুর চোখে এটা ধরা পড়িল—"তোর কি হয়েছে বল ত?"

তুলসী নীরব হইয়া রহিল।

কাহুও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সঙ্কোচভরে কহিল—"আমায় বলবি না ভাই?"

কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা করিয়া কাহু আবার কহিল—"কতক্ষণ হাসিটা ছিল?"

বিস্মিতা তুলসী কহিল—"কার?"

—"ঠাকুরের?"

কাহুর মনে হইল এবার তুলসী কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

ঈষৎ ম্লান হাসি হাসিয়া তুলসী কহিল—"তুই পাগল কাহু?"

—"কেন?"

তখনও তুলসীর অধরে ম্লান হাসির রেশটি লাগিয়া ছিল,—"ঠাকুর হাসে না ননদিনী।"

—"তবে!"

ওই তবে কথাটির মধ্যে যে পরম নৈরাশ্যের সুর বাজিয়া উঠিল তাহার মধ্যে সখীর জন্য যেন অপরিসীম সহানুভূতি লুকান ছিল,—তুলসী তাহা অনুভব করিল;—সে তাহার মনের দুয়ার খুলিয়া গোপন কথাটা না বলিয়া পারিল না।

সে কহিল, "শ্যামের হাসি ঠাকুরের মুখে দেখা যায় না কাহু, সে হাসি দেখা যায় মানুষের মুখে।"

কাহু অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

তুলসীর হাত দুটি ধরিয়া কাহু ব্যগ্রতাভরে কহিল—"বৌ, আমায় বলবি না ভাই?"

—"বলব,—তোকে না বললে আর কাকে বলব? আয় ওপরে আয়।"

সকল কথা কহিয়া তুলসী কহিল,—"ঠাকুরকে ভক্তি করা যায়, কিন্তু ভালবাসা যায় না ভাই, এ আমি বেশ বুঝেছি। কাহু, রূপ যে ভোগ করতে পারে না, রূপের পুজো তার পাওনা নয়।"

বলিয়া সে খোলা জানালা দিয়া চাহিয়া রহিল,—কাহুও নীরব। আঙিনার চারা আমগাছটির কয়টা শাখা জানালায় আসিয়া পড়িয়াছে, শাখা কয়টার প্রান্তে নতুন মঞ্জরী, গাছটায় এবারই প্রথম মুকুল আসিয়াছে; একটা অতি মৃদু গন্ধ আসিতেছিল।

কাহু কহিল—"এখন কি করবি?"

—"তুই বল, আমি কি করব?"

—"তোদের ত' এ রীতি আছে।"

—"রীতি আছে, কিন্তু এতদিন ত' এ রীতি মানিনি; এ রীতির কথা নয়, আমার মনের কথা; আমার মন আমি বুঝতে পারছি না ননদিনী, তুই বলে দে।"

কাহু তুলসীর মুখপানে চাহিল, দেখিল তাহার চোখের কোলে কোলে জল; সে চোখের কোলে কোলে এই কয়দিনেই ঈষৎ কালো একটি রেখা যেন কে টানিয়া দিয়াছে।

কাহু কহিল—"বৌ, তুই তাই কর।"

তুলসীর চোখের জল কোলের বসনে ঝরিয়া পড়িল।

কাহু তাহার হাত দুটি ধরিয়া কহিল—"বল ভাই, তা'হলে তোর নন্দাইকে আমি পাঠাই।"

—"না সে নিজেই আসবে; সে আমায় এ কথা বলেছিল, আমি জবাব দিতে পারিনি, সেই নিজে জবাব দিতে আসবে।"

কাহু সরস পরিহাসে হাসিয়া কহিল—"রাধারানীর জয় হোক,

কলিতে দেখছি বৃন্দে বাদ পড়ল। তা মালা গাঁথতে ললিতেকে ত' চাই না কি ? মালা গেঁথে রাখি ?"

তুলসী সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল—"রাখ, তোকেই ত' সব করতে হবে ; আমার আর কে আছে ?"

দৃঢ় আলিঙ্গনে তুলসীকে বুকে লইয়া কানু কহিল—"তা হচ্ছে না গো, তুমি আমাকে তোমার শ্যাম করতে চেয়েছিলে, আমি ছাড়ব কেন ?"

বলিয়া মুখরা কানু তুলসীর রাঙা গালে এক চুমা খাইয়া বসিল।

কানুর গালে একটা ঠোনা মারিয়া তুলসী কহিল—"মর্।"

কানু কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া দিল না, তাহাকে বুকে বাঁধিয়াই ঢুলিতে ঢুলিতে কহিল—"একটি গান বল ভাই।"

আলিঙ্গনের মধ্যে থাকিয়াই তুলসী অতি মৃদুকণ্ঠে, যেন কানুর কানে কানে, গাহিল—"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম" !

কিন্তু আত্মভোলা বিভোরার স্বর সে নয়, কোন কিশোরীর অতি সলজ্জ গোপন কথা নিবেদন।

তুলসী ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কি করিতেছিল। শীতের রৌদ্রতপ্ত উপভোগ্য মধ্যাহ্ন, আমের মঞ্জরীগুলি এতদিনে পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই উচ্ছ্বসিত মধুর মত্ত গন্ধে প্রাঙ্গণখানি উতলা, কে ডাকিল—"রাধারানীর দরবারে ভিক্ষা পাই।"

তুলসী চমকিয়া উঠিল,—সম্মুখে সেই আম্রছায়াতলে মোহনদাস। তুলসী তাড়াতাড়ি মাথার উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল, কিন্তু সে এক বিপদ, চুল সামলাইতে গেলে অবগুণ্ঠন খসিয়া যায় ; তুলসী বিব্রত হইয়া পড়িল,—এ তুলসীর প্রথম, অবগুণ্ঠন সে দিত না।

মোহনদাস সম্ভাষণের অপেক্ষা না করিয়াই দাওয়ার উপর একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া কহিল—"ভিক্ষা দাও।"

তুলসীর এতক্ষণে হুঁস হইল, সে একখানি আসন আনিয়া নীরবেই সেই দাওয়ার উপর পাতিয়া দিল ; আসনই অতিথিকে সম্ভাষণ করে,

বসিবার নিমন্ত্রণ করে, ভাবণটা অধিকন্তু।

মোহনদাস কিন্তু আসন গ্রহণ করিল না, সে সেই মাটির উপরে বসিয়াই কহিল—"ভিক্ষুককে সম্মান হল ভিক্ষা, ভিক্ষা না পেলে আসনে তার কি হবে?"

তুলসীকে কথা কহিতে হইল—সে মৃদুস্বরে কহিল—"আপনি বসুন।"

—"বসতে হবে! তুমি অনুরোধ করছ, বেশ—" বলিয়া সে আসন গ্রহণ করিল, তারপর আবার কহিল—"তুলসী, রাধারানী, রাধারানীর দরবার থেকে কি নিষ্ফল হয়েই ফিরতে হবে?"

তুলসী নীরবে ঘর খুলিয়া প্রবেশ করিল, কোন উত্তর সে দিল না।

মোহনদাস সেই দাওয়াতেই বসিয়া রহিল। সে তুলসীর সকল ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিল, সে বুঝিল, তুলসী মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, তাহার মনের মানদণ্ডে ওজন চলিয়াছে—একদিকে স্বপ্ন-কল্পনার ছবি একখানি, অপর দিকে রক্তমাংসের মানুষ সে। মহান্তের মনে হইল ওই স্বপ্ন-কল্পনার ছবিখানির কাছে রক্তমাংসের সে যেন বারবার তৃণের মত লঘুভার হইয়া যাইতেছে। বহুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মহান্ত উঠিয়া মুক্তদ্বার ঘরখানিকেই সম্বোধন করিয়া কহিল—"জয় হোক তোমার তুলসী, রাধারানী, তোমার ভক্তির জয় হোক। আমি আসি।"

মহান্ত অঙ্গনে নামিয়া পড়িল।

—"যাবেন না!"

মহান্ত ফিরিয়া দেখিল তুলসী দুয়ারে দাঁড়াইয়া কহিতেছে—"যাবেন না।"

তাহার চোখের কোলে অশ্রুর রেখা দূর হইতেও বোঝা যায়।

তুলসী আবার কহিল—"ফিরে আসুন।"

মহান্ত ফিরিল, এবার সে একেবারে দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তুলসী দ্বার-পথ ছাড়িয়া দিয়া কহিল—"জল খান্।"

ঘরের মধ্যে আসন পাতা, পাশে এক গ্লাস জল, সম্মুখে একখানা

রেকাবিতে কয়খানা বাতাসা, কদমা, মণ্ডা, নারিকেল নাড়ু, সরবতি লেবু, কলা পরিপাটী করিয়া সাজান পাশে একটি খিলিদানিতে ছ'খিলি পান।

মহান্ত হাসিয়া কহিল—"না, তোমার আতিথ্যের অপমান করবার আমার সাধ্য নাই, ধর্ম তোমার অক্ষয় হোক, রাধারানীর সৌভাগ্য তুমি লাভ কর।" বলিয়া সে আসন গ্রহণ করিল।

উপচারের সকল দ্রব্যগুলি নিঃশেষে আহার করিয়া, হাত মুখ ধুইয়া মহান্ত পান লইতে লইতে কহিল—"এবার আমি আসি।"

তুলসী কথা কহিল না।

মহান্ত আবার বিনয় করিয়া কহিল—"তুলসী রাধারানী, সত্যিই কি নিষ্ফল হয়ে ফিরব?"

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মোহনদাস পা বাড়াইয়া কহিল—"আসি তবে—"

—"না।"

তুলসী লজ্জায় রাঙা হইয়া কোন মতে কহিয়া ফেলিল,—"না।"

পুণ্য মাঘি পুর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মাঝে তুলসী আর মোহনদাসের মালাচন্দন হইল।

মালা গাঁথিয়াছিল ননদিনী, মালা গাঁথিয়াছিল সে ফুলে আর আমের মুকুলে; কহিল—"শুধু আফলা ফুলের মালা পছন্দ হ'ল না, আমের মুকুলে যেমন থরে থরে ফল ধরে, তেমনি ফলে ফলে সংসার তোর ভ'রে যাক,—ছেলে নইলে সংসারের ফাঁক মরে না।"

সে শুধু মালা গাঁথিয়াই পালা শেষ করিল না,—বাসর জাগাইয়া তবে ছাড়িল।

পরদিন চোখের জলে ভাসিয়া বিদায় দিয়া কহিল,—"দেখিস্ একেবারে ভুলিস্ না, আসিস্, ছ'মাস এখানে, ছ'মাস সেখানে তা' বলে রাখছি কিন্তু, হ্যাঁ!"

তুলসীও কাঁদিল।

বিদায় লইয়া যখন তাহারা সন্ধ্যা-জোলের আখড়ায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেলা আর নাই, গোধূলির আলো ঝিকমিক করিতেছে।

তুলসী প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিতেছে—এক পাশে জাফরি-বোনা বাঁশের বেড়ায় গাঁদা ফুলের গাছ, সর্বাঙ্গ ভরিয়া অজস্র ফুল ; কয়টা বড় ফুলে ন্যাকড়া বাঁধা, বীজ থাকিবে ; মাঝে মাঝে কয়টা রাধাপদ্মের গাছে বিশাল হলদে ফুল, কয়টা সন্ধ্যামণির গাছে তখনই সদ্য সদ্য রক্তরাঙা ফুলগুলি ফুটিতেছে ; ওপাশে কয়টা আম-গাছে মুকুলের মেলা, দুইটা সজিনার গাছে ফুলের ফুলঝুরি।

সম্মুখেই দাওয়া, উঁচু, বাঁধান মেঝে বড় মেটে-ঘর একখানি, তারই ঠিক পাশেই সমকোণ করিয়া ছোট ঘর একখানি, তারও বাঁধান মেঝে, আকারে প্রকারে মনে হয় এইটিই বিগ্রহ-মন্দির, দুয়ারের চৌকাঠে সিঁড়িতে সিঁড়িতে আলপনার বিচিত্র রেখার শুভ্র রেশ তখনও জাগিয়া আছে।

তুলসীর অনুমানই ঠিক, মহান্ত গিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া দিয়া কহিল— "প্রণাম কর।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ!

তুলসী ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

"মহান্ত!"

পিছনে একটা অস্বাভাবিক দুর্বল আর্ত-স্বর ধ্বনিয়া উঠিল।

তুলসীর প্রণাম সম্পূর্ণ হইল না। সে চমকিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল—ও ঘরের দাওয়ার উপরে, কঙ্কালাবশেষ জীর্ণা এক নারী ; বুকের বসন খসিয়া গিয়াছে, বুকে রক্তমাংসের কোন চিহ্ন নাই, রোগ নিঃশেষে সব মুছিয়া লইয়াছে, চামড়ার অন্তরালে পূর্ণ প্রকটিত পঞ্জরের মালা, আর তারই অন্তরালে দুর্বহ জীবনের শ্রান্ত স্পন্দন ; শীর্ণ মুখখানা লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, চামড়ার নিচে প্রতিটি হাড় দেখা যায়, গণ্ডের কোন অস্তিত্ব নাই, আছে শুধু দুইটা গহ্বর ; মাথার চুলগুলি প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে ; যে কয় গোছা আছে তাহারই পিঙ্গল রুক্ষতার মাঝে কালো বর্ণের রেশে বোঝা যায়—তাহার বয়স বেশী হয় নাই ; চর্ম

আর কঙ্কালের জীর্ণতার মাঝে দপ্ দপ্ করিতেছিল তাহার দুইটা চোখ।

তুলসী শিহরিয়া উঠিল, মহান্তের মুখখানি কঠিন হইয়া গেল, সে কহিল—"তুমি উঠে এসেছ?"

সেকথায় সে কর্ণপাতও করিল না, তেমনি আর্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল—"ও—কে?"

দৃষ্টি দিয়া সে তুলসীর রূপসম্ভার-ভরা সর্ব অবয়ব গ্রাস করিতেছিল।

মহান্ত কহিল—"কেন, তুমিই ত' আমায় বলেছ,—"

মেয়েটি পাগলের মত দু'হাতে আপন জীর্ণ পঞ্জরে আঘাত করিয়া কহিল—"না, না, না, বলি নাই, বলি নাই আমি, সে আমি মিথ্যে বলেছি, তোমার মন রাখতে, মন বুঝতে বলেছি।" হা হা করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল।

তুলসী থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, মহান্ত তুলসীর হাত ধরিয়া কহিল—"তুলসী! তুলসী!"

তুলসী দেবতার ঘরের খুটিটা ধরিয়া কহিল—"ওকে দেখ তুমি, ওকে দেখ—পড়ে যাবে হয়ত!"

মহান্ত তাড়াতাড়ি উন্মাদিনীকে ধরিতে যাইতে যাইতে কহিল—"তোমায় ত' একথা বলেছিলাম তুলসী।"

সত্য, ইহার কথা মহান্ত তুলসীকে বলিয়াছিল, কিন্তু এমন বলে নাই। জয়দেবে যখন প্রথম তুলসীকে সে ভিক্ষা জানায় তখনই বলিয়াছিল। বলিয়াছিল,—মরণ পথের যাত্রী এক স্ত্রী তাহার বর্তমান, বহুদিন ধরিয়া সে শয্যাশায়িনী, তাহার সেবা, দেবতার সেবা দুই লইয়া মহান্ত বিব্রত। সাধনপথের সঙ্গিনী ত' দুদিন পরেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে,—এখন যদি তুলসী তাহাকে দয়া করে তবে রুগ্নার সেবাও হয়, আর সেও হাসিমুখে তাহাকে অনুমতি দিয়াছে।

মহান্ত মেয়েটিকে ধরিয়া কহিল—ভামিনী, ভামিনী—!

মেয়েটির নাম গৌর-ভামিনী।

ভামিনী তাহার দুটি পায়ে ধরিল কহিল—"দুটো দিন অপেক্ষা

করতে পারলে না গো,—ছুটো দিন আর ছুটো দিন, আমি ত' বাঁচব না,—ছুদিনও হয়ত বাঁচব না,—ছুদিনের তরে এ তুমি কি শেল হান্‌লে গো!' আবার সে হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এতখানি কিন্তু তুলসীর ভাল লাগিল না। রক্তমাংসের দেহ হারাইয়াও রক্তমাংসের মানুষ লইয়া একি কাড়াকাড়ি! তবুও ওই নারীটির মর্মভাঙা ক্রন্দনে সে বিচলিতও হইতেছিল,—তাহার অন্তরের শাশ্বত নারী সমবেদনার বেদনায় সারা হইয়া গেল,—সে ধীর পদক্ষেপে আসিয়া ভামিনীর পদতলে বসিয়া—মিষ্ট কণ্ঠ আরও মিষ্ট করিয়া কহিল—"আমার ওপরে রাগ করলে দিদি!"

"বেরো, বেরো, দূর হ, তুই দূর হ,—" বলিয়া ভামিনী তাহার কঙ্কালসার দেহে যতখানি শক্তি ছিল হানিয়া তুলসীকে লাথি মারিয়া বসিল,—অতর্কিতা তুলসী নিচে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। মহান্ত হাঁ হাঁ করিতে করিতে তুলসী আপনিই উঠিয়া বসিল,—"ওকি, তোমার ভুরু থেকে রক্ত পড়ছে যে,—"মহান্ত ভামিনীকে ছাড়িয়া দিয়া তুলসীর পরিচর্যার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, ওদিকে ভামিনীর চোখ তখন দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

সে দৃষ্টি তুলসী দেখিল, সে মৃদু হাসিয়া ভ্রূতে বুলান রক্তমাখা হাতখানা দেখিতে দেখিতে কহিল—"না—না, লাগে নাই, লাগে নাই আমার,—যাও তুমি দিদিকে দেখ, রোগা মানুষ,—আমি নিজেই ধুয়ে ফেলছি।"

এপাশ ও-পাশ চাহিতেই নজরে পড়িল, একটি চারা আমগাছের তলে খানিকটা বাঁধান জল ফেলিবার জায়গা,—বালতিতে জল, তুলসী জলে ভ্রূর রক্ত ধুইতে ধুইতে শুনিল—ভামিনী বলিতেছে,—"না না, তুমি এমন ক'রে তাকিয়ো না, রাগ ক'রো না—আর ছুটো দিন, ছুটো দিন তুমি ওকে পর ক'রে রাখ,—কথা ক'য়ো না,—আদর ক'রো না, —ছুটো দিন গো—ছুদিন বই আর আর আমি বাঁচব না,—সত্যি বলছি।"

সন্ধ্যায় মহাপ্রভুর সম্মুখে নিত্য কীর্তন করিতে হয়। মহান্ত

তুলসীকে ডাকিল—"এস আমার প্রভুকে গান শোনাও।"

তুলসী কি ভাবিয়া কহিল,—"আজ থাক্।"

—"না না, এ আমাদের নিয়ম, আর অনেকে এসেছে, তুলসীর গানের কথা দেশ-দেশান্তরে রটেছে।"

তুলসী কহিল—"না, ছুদিন পরেই শুন্‌বে, দিদির অবস্থাটা ভাব ; —আমার গান শুন্‌লে সে হয়ত রেগে যাবে।"

মহান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"হুঁ।"

তুলসী কহিল—"তুমি যাও, নাম আরম্ভ কর গে, নামের সময় বয়ে যাচ্ছে। আমি দেখি দিদির একটু সাবু বার্লি করতে হবে।"

মহান্ত উত্তেজিত স্বরে কহিল—"তুলসী, আগে দেবতার সেবা, তারপর মানুষ, এস তুমি—।"

দৃঢ়স্বরে তুলসী কহিল—"আমারও ছিল তাই মহান্ত, আজ আমার ধর্ম্ম উল্টো—সে ত তুমি জান !" বলিয়া সে ধীর পদক্ষেপে ওদিকে চলিয়া গেল।

মহান্ত আপন মনেই সহসা বলিয়া উঠিল—"মরবেও না, আমারও অশান্তি ঘুচবে না।"

তুলসী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভর্ৎসনাপূর্ণকণ্ঠে কহিল—"ছিঃ।" কথাটি তাহার কানে গিয়াছিল।

ঘরের মধ্য হইতে একটি দুর্বল ক্ষীণ অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনিয়া উঠিল।

মহান্ত এতটুকু হইয়া চলিয়া গেল।

কীর্তন ভাঙিয়া গেলে মহান্ত আসিয়া ডাকিল, "তুলসী"—

তুলসী তখন ভামিনীর পাশে বসিয়া ছিল, ভামিনীর সবে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, কিন্তু তখনও নিদ্রাতুরার বক্ষ ভেদিয়া মাঝে মাঝে ক্রন্দন-কম্পিত দীর্ঘশ্বাস বহিতেছিল।

তুলসী সন্তর্পণে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

মহান্ত কহিল—"নাও।"

মহান্তর হাতে একটা ডালায় ফুল। তুলসী হাত বাড়াইল, কিন্তু জিজ্ঞাসু নেত্রে মহান্তের পানে চাহিয়া রহিল,—কি হইবে ফুলে ?

মহান্ত হাসিয়া কহিল—"ফুল-শয্যায় ফুল চাই না ?"

তুলসী হাতের ডালাটি তেমনি ভাবেই ধরিয়া রহিল, বহুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"তা হয় না মহান্ত।"

চমকিয়া মহান্ত কহিল—"কেন ?"

"দিদির কথাগুলোর কি কোন দামই নেই মহান্ত ?"

মহান্ত তুলসীর হাত ধরিয়া কহিল—"তুলসী, আজকের দিন ত' ফিরে আসবে না, এটা যে একটা সাধের দিন।"

—"আমারই কি নয় গো ? কিন্তু সাধের জন্মে কি মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মারা চলে ?"

মহান্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"তুলসী, তুমি কি পাথর !"

তুলসী হাসিয়া কহিল—"পাথর হলে ত' পাথরেই মন উঠত গো ! মানুষ বলেই ত মানুষের উপর মায়া হচ্ছে।"

—"আচ্ছা থাক্" বলিয়া মহান্ত দাওয়ার উপর হইতে নামিয়া গেল, তুলসী হাসিয়া কহিল—"রাগ হল বুঝি ?"

মহান্ত উত্তর করিল না।

তুলসী ললিত ভঙ্গিতে দেহ দোলাইয়া কহিল--"আচ্ছা, তা বলে রাগ আমি ভাঙাব না, সে বলে দিচ্ছি; তোমাকেই ভাঙতে হবে।"

"মহান্ত !" ভামিনীর কণ্ঠস্বর।

তুলসী তাড়াতাড়ি ভামিনীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল, ভামিনী তাহাকে দেখিয়া আবার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কহিল—"না না, সরে যাও, সরে যাও তুমি।"

সভয়ে তুলসী বাহির হইয়া মহান্তকে আসিয়া কহিল—"যাও, ডাকছে তোমায়।"

মহান্ত একান্ত অনিচ্ছায় বিরক্তিভরে ভামিনীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল, ভামিনী তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, কিছুক্ষণ পরে কহিল—"আজ তোমার ফুল-শয্যে, তোলা বিছানার মধ্যে তোশক বালিশ—"

মহান্ত বাধা দিয়া কহিল—"না না, ভামিনী, সে কি হয়,—ও

তোমার কাছেই শোবে।"

ভামিনী মুখ ফিরাইয়া কহিল,—"না, আর আমায় অপমান করো না মহান্ত ; ওর দয়া আমাকে গ্রহণ করিয়ো না, তোশক বালিশ নাও গে, কিন্তু আমার লেপখানা যেন নিয়ো না।"

মহান্ত উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু একটা কোমল শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল—ছুয়ারের সম্মুখে তুলসী, কথাটা আর বলা হইল না তাহার, কিন্তু ললাটের কুঞ্চনে, নাসিকার স্ফীতিতে তাহার কটু মনের পরিচয় গোপন রহিল না। সে ভামিনীর মাথায় হাতটি বুলাইতে লাগিল, হাত অল্প ঠেলিয়া দিয়া ভামিনী কহিল—"থাক্।"

মহান্তও চলিয়া গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর মহান্ত তামাক খাইতেছিল, তুলসী কহিল—"তোমার বিছানা দিদির ঘরে।"

মহান্ত চমকিয়া উঠিল,—তুলসী আবদারভরা কণ্ঠে কহিল—"না বলতে পাবে না, এ আমার প্রথম আবদার!"

মহান্ত কটুভাবে বলিল—"না, রোগীর গন্ধে—"

তুলসী শান্তভাবে কহিল—"পাষাণের ওপর ভালবাসাটা গেছে মহান্ত, মানুষের ওপর ভালবাসাটা আর ঘুচিয়ে দিয়ো না।"

মহান্ত তুলসীর মুখ পানে চাহিয়া কহিল—"তোমার জয় হোক্।"

তুলসী হেঁট হইয়া মহান্তের পায়ের ধূলা লইল, লোলুপ পুরুষ অবনত নারী-দেহখানিকে বক্ষে টানিয়া লইয়া চুম্বনে অধর ভরিয়া দিল, সবল পেষণে পিষ্ট করিয়া ফেলিল যেন ; তুলসীরও চক্ষু মুদিয়া আসিয়াছিল, সহসা সে কহিল—"ছাড়্।"

মহান্ত হাসিয়া ছাড়িয়া দিল, তুলসী কহিল—"যাও, শোও গে, যাও ; যে মরতে বসেছে, তাকে আর ঠকিয়ো না।"

বলিয়া সে এপাশের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে তুলসী ঘরে ঝাঁটা বুলাইতে ভামিনীর ঘরে ঢুকিল, ঝাঁট দিতে দিতে ভামিনীর পানে তাকাইতেই দেখিল, ভামিনী তাহারই পানে তাকাইয়া আছে। তুলসীর ভয় হইল, ভামিনী কখন উত্তেজিতা

হইয়া উঠিবে !

"তুলসী !"—ভামিনী তাহাকে ডাকিতেছে—

ভামিনী আবার কহিল—"তোমার নাম ত তুলসী ?"

তুলসী মৃদুস্বরে কহিল—"হ্যাঁ।"

ভামিনী কহিল—"শোন, আমার কাছে এস, ভয় নাই।"

তুলসী কাছে আসিয়া বসিল, সে তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল—"ভয় কি দিদি ?"

ভামিনী তাহার সে কথা শুনিল না, সে তাহাকে দেখিতেছিল, দেখিতে দেখিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"রূপ একদিন আমারও ছিল।"

তুলসী চমকিয়া উঠিল ; ভামিনী একটু করুণ হাসি হাসিয়া কহিল, "তোমাকে আশীর্বাদ করব বলেই ডেকেছি ; আজ ছ'মাস বিছানা পেতেছি, ছ'মাস আজ একা একা পড়ে পড়ে কাঁদছি ; বড় সাধ ছিল বোন,—তা সে সাধ তুই মেটালি। আশীর্বাদ করি তুই যেন চিরদিন তাকে পাস, চিরদিন একা-একা।"

ভামিনী সেইদিনই সন্ধ্যায় দেহ রাখিল, যেন ঐ আকাঙ্ক্ষাটুকুই তাহার জীবনকে জীর্ণপঞ্জরের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

বহুদিনের রোগী প্রায় সজ্ঞানেই দেহত্যাগ করে, কিন্তু ভামিনী মরিল যেন বন্দোবস্ত করিয়া। বৈকালের দিকে শ্বাস উপস্থিত হইতেই মহান্ত কহিল—"ভামিনী, চল তোমাকে প্রভুর সামনে নিয়ে যাই, প্রভুকে একবাব দেখ।"

ভামিনী হাত নাড়িয়া কহিল—"না, দেবতার সেবা আমি অনেক করেছি, কিন্তু দেবতা আমায় কি দিলে ? দেবতা নয় মহান্ত,—মহান্ত তুমিও না, এসময় তোমার মুখ দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না। একা থাকি আমি, আমি ত' আজ একাই।"

ভামিনী পাশ ফিরিয়া শুইল, আবার ডাকিল—"তুলসী !"

তুলসী কাছে আসিয়া কহিল—"দিদি !"

—"তুই নাকি ভাল গাইতে পারিস, দেশ-বিদেশে তোর গানের

নাম, একটা গান শোনা না, ভাই।"

—"কি গাইব বল ?"

ভামিনী হাসিয়া কহিল—"বলে দিতে হবে! বেশ, সেই—'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।"

"কিন্তু সরে, সরে যা, ওই পেছনে বসে গা।"

আপন জীবনের সমস্ত তিক্ত রসটি হতভাগী নিঃশেষে পান করিয়া তবে গেল।

তারপর ?

এর পর একটি অবিচ্ছিন্ন মিলনের প্রগাঢ় আনন্দ।

ওই আনন্দের মধ্য দিয়া দিবারাত্রিগুলি স্বচ্ছন্দ শ্বাসপ্রশ্বাসের মত বহিয়া যায়—

মিলনের আবেশে চোখের নিমিখ নামিয়া আসে, সে নিমিখ খুলিতে খুলিতে রাত্রি আসে, রাত্রি কাটিয়া প্রভাতের পাখি কলরব করিয়া উঠে।

হাসি, গান, আনন্দ, মান-অভিমান, অনুনয়, অভিনয়, অশ্রু, পুনর্মিলন, আবার হাসি, আবার আনন্দ।

দুটি তরুণ নরনারীর জীবনের যা লীলা তাই, সেই পুরাতন জীবনে সে বারে বারে নবীন হইয়া দেখা দেয়।

তুলসী মাঝে মাঝে আপন গ্রামে যায়, মহান্তের আপত্তি টেঁকে না, সে ধরিয়া বসে—"আমি যা—ব; কানুর সঙ্গে কতদিন দেখা হয়নি, ননদিনীর জন্যে মন কেমন করছে।"

মহান্ত কহে—"আমার চেয়ে ননদিনী তোমার বড় হ'ল ?"

"হ্যাঁ হ'ল, কি বলছ বল ?"

মহান্ত আর কথা কয় না, তুলসী বকিতে বকিতে আপন গৃহকর্ম করিয়া যায়, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিয়া মহান্তের সম্মুখে জাঁকিয়া বসিয়া কহে—"কি বলছ তা বল বাপু; ও চুপ ক'রে থাকা আমার ভাল লাগে না, আমি কিন্তু কাল যাব।"

তুলসীর যেন একটু পরিবর্তন হইয়াছে, সে সীমারেখাবদ্ধ প্রবাহিণীটি আর নয়, তাহাতে সার্থকতার জ্যোৎস্নার জোয়ার ধরিয়াছে, কূল ছাপায়-ছাপায় !

মহান্ত কহিল—"যখন যাবেই, তখন আর কি বলব বল ?"

তুলসী ঝঙ্কার দিয়া কহে—"ননদিনীর হিংসাতেই পাট-পাট ; ননদিনী যেন ওঁর সতীন !"

মহান্ত আর কথা কয় না ;—তুলসী কিন্তু তাহাতে ভয় পায় না, পরদিন প্রাতেই কাপড় বাঁধিয়া কহে—"চল্লাম আমি।"

গ্রামের প্রান্তে বিস্তীর্ণ মাঠ,—সেই মাঠখানি ; এই মাঠেই দুজনের তাহাদের প্রথম দেখা হইয়াছিল, তুলসী সেই কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। অধরে মৃদু হাসি আসে ; পিছন হইতে মহান্ত কহিল —"এই আমাদের যমুনা পুলিন !"

মহান্ত যে আসিতেছে, একথা তুলসী জানিত, তবু সে কৃত্রিম বিস্ময়ের ভান করিয়া কহে—"তুমি !"

মহান্ত গান ধরে—পরাণ ছাড়িলে পীরিতি না ছাড়ে পীরিতি গড়ল কে ?"

জনহীন প্রান্তরে তুলসীও সঙ্গে সঙ্গে গান ধরে—"পীরিতি পীরিতি, কি রীতি, মূরতি, হৃদয়ে লাগল সে। পরাণ ছাড়িলে পীরিতি না ছাড়ে পীরিতি গড়ল কে ?"

মাঠের প্রান্তে আসিয়া তুলসী কহে—"এইবার তুমি যাও। বেলা অনেক হল, ফিরতে দেরী হবে ; আচ্ছা, কি আসবার দরকার ছিল বল ত ?"

মহান্ত কহে—"চল, চল !"

তুলসী কহে—"না, তুমি কোথা যাবে ? তবে যাব না আমি।"

—"কেন ?"

—"তোমার ঠাকুরের সেবা—"

—"সে আমি বন্দোবস্ত করে এসেছি।"

—"তা হোক, তোমার যাওয়া হবে না, লোকে বলবে কি ? কেউ-

এর মত পিছু পিছু—ছিঃ, চল বাপু, আমিই ফিরছি, আমার গিয়ে কাজ নাই।"

কোন বার সেখান হইতেই তুলসীকে ফিরিতে হয়, কোন বার মহান্ত ফিরিয়া যায়, বলিয়া যায় "তিন চার দিনের বেশী যেন থেক না।"

গ্রামে আসিয়া ননদিনীর দুয়ারে খঞ্জনির ঝঙ্কার তুলিয়া তুলসী কহে—"খোকা হোক ননদিনীর, ভিক্ষা পাই গো।"

কাদু ঘর হইতেই ঝঙ্কার দিয়া বাহির হইয়া আসে—"তোর হোক, তোর হোক, তোর হোক। মর্ পোড়ামুখ, মর্; রঙ্গ দেখ কেনে!"

তুলসী গান ধরে—

"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে। চোখের বালি—ননদী হে—।"

কাদু কয়—"যাক বাবা, আসতে পারলি?"

তুলসী সলজ্জভাবে কহে—"যে কাজ ভাই, ঠাকুরের সেবা, অতিথি বোষ্টোম, একদিন না থাকলে চলে না।"

ননদিনী ঝঙ্কার দিয়া কয়,—"থাক্ থাক্ আর খুব হয়েছে।"

তুলসী ধরা দেয়, সে চুপ করিয়া মৃদু মৃদু হাসে।

ননদিনী কহিল—"তোর নন্দাইকে পাঠালাম—"

সবিস্ময়ে তুলসী কহে—"কবে?"

—"এই সে দিন।"

—"কই না, যায়নি ত'!"

—"গিয়েছিল, কিন্তু চাষার আবাড ত,' পথে মহান্তর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেইখান থেকেই ফিরে এসেছে, কয়েত-বেল গুড় দিয়েছিলাম, আর বলে দিলাম—বৌর সঙ্গে দেখা করে আসতে বলে এস, তা পথে মহান্তর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেইখান হতেই কত্তা আমার ফিরেছেন আলুতে মাটি দিতে হবে, রাজ্যপাট বয়ে যাচ্ছিল।"

তুলসী গালে হাত দিয়া কহিল—"হে-ই মা-গো, আমাকে যদি এক কথা বলে থাকে, যাই একবার, দাঁড়াও না। আমাকে বললে কি —এ গাঁয়ের একটা লোক কোথা গেল এই পথে, তা দিয়ে গেল,

ননদিনী দিয়েছে তোমার।"

ওদিকে কাহুর ছোট ছেলেটা কাঁদিয়া উঠে, কাহু ছোট ছেলেটাকে আনিতে যাইতে যাইতে কহিল, "ওই দেখ, কালদের জ্বালায় একদণ্ড অবসর আছে, না স্বস্তি আছে; যাই পোড়ামুখো দাঁড়া।"

রাত্রে কাহু তুলসীকে সঙ্গে করিয়া শুইতে যায়। ঘরে পাশাপাশি দুইটি বিছানা, কাহু কোলের ছেলেটিকে লইয়া একটিতে হাত-পা মেলিয়া দিয়া কহিল—"শুয়ে পড়, আঃ দাঁড়িয়ে রইলি যে!"

তুলসী প্রবল আপত্তি তুলিয়া কহিল—"না না, তুমি এখানে শুতে পাবে না, স্বস্থানে পরমেশ্বরী, যাও বাপু, আপনার ঘরে যাও।"

ননদিনী কহিল—"ভয় নাই, সে বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে, ছেলে-গুলোর কাছে আজ ছেলের বাপ থাকবেন, আজ তার পালা।"

—"না না, কি মনে করবেন বলত?"

কাহু হাসিয়া কহিল—"মনে করবার তার অবসর নাই,—এতক্ষণে দেখ গে তার অর্ধেক রাত, ওই ওই, শোন্ না নাক ডাকছে—ওই ঘড়র-ঘোঁৎ, ঘড়র ঘোঁৎ, আবার শোন্ না, এক-একবার হবে পট পট পট ঘড়র-ঘোঁৎ ফুস—এই হ'ল—বলে—অ-অ ও-ই।" কাহু হাসিয়া উঠিল।

তুলসীও হাসিল, হাসিতে হাসিতেই কহিল,—"কাল ত মনে হবে, তখন!"

কাহু হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে কহিল,—"ভয় নাই সখী, আমাদের হ'ল চাষার মরদ, চাষে খাটা আকাট মুনিষ, ওরা চেনে শুধু মাটি আর মুড়ির বাটি, তারপর যা কিছু সব ফাউ, হ'লেও হয়, না হ'লেও হয়। আমাদের নটবর নয়, আর সে বয়েসও নাই।"

তুলসী কহিল—"মর্।"

—"এখন তোর কথা বল, এখন দু'দিন থাকবি ত? এ মাস তোকে ছাড়ছি নে, কিন্তু এ মাসেরই আর ক-দিন আছে, আর ত' দশটা দিন।

তুলসী কহিল—"বাপ্‌রে এই বলে আসতে দেয় না, ঝগড়া করে এলাম। বললাম, ননদিনী কি তোমার সতান? বল্লে কি—বলে

হুঁ। আমি ঝগড়া করে চলে এলাম, তা পথে পিছু ফিরে দেখি পিছু পিছু আসছে ; কত করে তবে তাড়ালাম, হয়ত কালই আবার এসে হাজির হবে।"

কাহু খুব হাসে, তারপর জিজ্ঞাসা করে—"এখন বল ত সখি চাঁদ-বদনী, মানুষ ভাল না দেবতা ভাল ?"

তুলসীও হাসিয়া কহে,—"মানুষের জ্বালায় কিন্তু অস্থির ভাই, উদ্ভট সখ, বলে, দোলের সময় দোল্‌না টাঙিয়ে দুজনে দোল খাব ; ঝুলনে ঝোলনায় ঝুলনে চাপতে হবে, রাসে সারারাত জাগতে হবে ; অস্থির ভাই! কোন্‌দিন শুনবি, দোলনা ভেঙে হাত পা ভেঙে পড়ে আছি।"

কাহু কোন সাড়া দেয় না, তুলসী ডাকে, "কাহু!"

কাহু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ; তুলসীর কিন্তু ঘুম আসে না, নতুন জায়গা বলিয়া বোধ হয়।

তুলসীর কথা পরদিনই সত্য হইয়া দাঁড়াইল। অপরাহ্নে মহান্ত আসিয়া হাজির, আসিয়াই সে দশ কথায় আসর জমাইয়া তুলিল, যেন কুলীনের জামাই—"প্রভুর ভোগ কাল ভাল হয়নি, অতিথ এসে মুড়ি-চিঁড়ে খেলে, মানুষ নইলে কি সেবা চলে ?"

কাহু আড়াল হইতে কহিল—"বাকী থাকল যে,—রাতে ঘুমোবার উপায় নাই, বিছানায় ছারপোকা হয়েছে, রোদে দেওয়া হয়নি ; মশা হয়েছে ঘরে ধূপ পড়ে না, চালে কাঁকর, পানে চুন, বলুন সবগুলো, বাকী থাকল যে!"

তুলসী চিমটি কাটিয়া কহিল—"মর্‌!"

কাহুর মুখে হাত দেয় কে ; সে চিমটি আমলেও আনিল না, তেমনিভাবে সে কহিল, "তা বেশ, আজ রাতটা এখানে থাকা হোক, আমাদের এখানে মশা নাই, আর রূপের ধূপ তো ধূপদানিতে জ্বলছেই। চালও বেছে দোব, পানেও চুন লাগবে না।"

মহান্ত অপ্রতিভ হইয়া কহে—"না না দেব-সেবা।"

কাহু কহিল—"তা বেশ ত, আপনি আজ যেতে পারেন, রেতে ত

বৌর যাওয়া হয় না, রাতে মাঠের মধ্যে ওকে আবার ভূতে পায়।"

মহান্তকে হাসিতে হয়।

তুলসীকেও পরদিন যাইতে হয়।

বোধ হয় বছর আষ্টেক পর; তুলসী অনুভব করিল দিনগুলি বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। দিনগুলির ধারারও কেমন যেন পরিবর্তন হইয়াছে, তেমন ছল ছল স্বচ্ছন্দ গতিতে দিন আর বয় না, কেমন যেন তার মন্দগতি—উপলাহত প্রবাহের মত ব্যাহত ধারা।

তুলসী বিরক্ত হইয়া উঠিল।

সেদিন মহান্ত খাইতে বসিলে সে কহিল—"চল বাপু কোথাও যাই।" মহান্ত বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

তুলসী কহিল—"আমার ভাল লাগছে না বাপু, চল বৃন্দাবনে যাই।—"

মহান্ত শ্লেষের হাসি হাসিয়া কহিল—কত খরচ জান! ভিখেরীর ঝুলিতে তা নাই।

তুলসী কহিল—"বোষ্টোম হলেও ত' তুমি ভিখেরী নও।"

মহান্ত পরিষ্কার কহিল—"আমার বাপু টাকাকড়ি নাই।"

তুলসী ম্লান হইয়া গেল,—কিছুক্ষণ পর সে যেন একটা উপায় খুঁজিয়া পাইল—পরম উৎসাহভরে সে কহিল—"কাজ কি আমাদের টাকায়, চল ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে বেরিয়ে পড়ি, পুঁজি আমাদের গান, পদব্রজে ব্রজে চল— ।"

মহান্ত খাইতে খাইতে কহিল—"আমার বাবা এলেও তা পারবে না।"

তুলসীর মুখের দীপ্তি মহান্তের কথার ফুৎকারে নিভিয়া গেল। ক্ষণপরে সে আবার কহিল—"তবে নবদ্বীপ চল,—সে খরচ ত বেশী নয়।"

মহান্ত পরম বিরক্তিভরে কহিল—"বাজে বকো না বাপু, যত সব—ছঁ।"

তুলসী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"কিন্তু পাঁচ বছর আগে হ'লে তুমি আমার কথা এমন করে ফেলতে পারতে না মহান্ত!"

সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

মহান্ত খাইতে খাইতে আপন মনেই কহিল—"হুঁঃ।"

তুলসী যেন এর পর হইতে সজাগ হইয়া উঠিল,—মহান্তের সেবা-যত্নের পারিপাট্য যেন বাড়িয়া গেল।

নারীর এটা স্বভাব, মান-অপমান বিচার করিয়া সে করে না,—কিন্তু সে করে।

মহান্তও যেন একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

তবু তুলসীর মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তি ঘুরিয়া মরে, এ প্রসন্নতা ত তাহার কাম্য নয়, এ প্রসন্নতা ত দেবতার পূজা করিয়াও পাওয়া যায়, অতিথির কাছে পাওয়া যায়, এক মুষ্টি ভিক্ষার বিনিময়েও ত এ প্রসন্নতা ভিক্ষুকের কাছে পাওয়া যায়। সে যাহা চায়—সে ত' পূজায় মেলে না, এই মহান্তই ত' একদিন উপযাচক হইয়া তাহাকে তাহা দিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে কত কথা মনে আসে। মনে পড়ে—ননদিনীর জীবনের কথা। সেদিন ননদিনীর বাড়ি গিয়াছিল সে, সেখানে সে দেখিয়াছিল—দুটি প্রাণী নীড়-রচনায় ব্যস্ত, দুজনেই আপন আপন কাজ লইয়া ফেরে, যেন দুটি মৌমাছি, অবিরত মধুসঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে, কেহ কাহারও পানে তাকায় না, কিন্তু সে অবহেলা নয়, তাহার জন্য কাহারও অভিমান নাই, বেদনাও নাই।

কানু বলিয়াও ছিল—"সখী রে, সেদিন চলে গেছে।"

তুলসী একটু আশ্বস্ত হইল, দুশ্চিন্তায় যেন একটা ছেদ পড়িল, সে মনে মনে আপনাকেই কহিল—"সখী রে, সেদিন চলে গেছে।"

তুলসী পাকারকমে গৃহিণী হইয়া উঠিতে চাহিল। সঞ্চয়, সঞ্চয়, সঞ্চয়—নীড়খানি দিনে দিনে অপরূপ করিয়া তুলিতে চাহিল,—আঙিনায় ধানটি পড়িয়া থাকিলে সে তাহা নখের কোণে খুঁটিয়া তোলে, পথ হইতে গোবর আনিয়া ঘরে তোলে—একগাছা কাঠি পড়িয়া থাকিলে তাও লইয়া আসে, জ্বালানীর সাশ্রয় হইবে। মন মানিল

একরূপ,—কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, এত করিয়াও ধরণীর দিবারাত্রিগুলি তবু দীর্ঘ,—তবু বিরস !

তুলসী ভাবে,—ননদিনীর অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থাটা খতাইয়া দেখে, কোথায় নীড়ের মধ্যে ছিদ্র পড়িয়াছে, যে ছিদ্র দিয়া সকল মধু সকল রস ক্ষরিত হইয়া যাইতেছে !

কাত্নর ছেলেগুলিকে লইয়া অনেক কাজ, তাহাদের লইয়া অবসর নাই। তাহার ছুটি কথা তাহার মনে পড়িল, যেদিন সে আমের মুকুলে মালা গাঁথিয়া দিয়াছিল সেদিন সে বলিয়াছিল—"ছেলে নইলে সংসারের ফাঁক মরে না !"

আর একদিন সে বলিয়াছিল—"ওই দেখ্ কালদের জ্বালায় অবসর আছে না স্বস্তি আছে !"

কিন্তু পরিপূর্ণ একটা আনন্দ আছে !

তাহার স্বামীও সেদিন ওই ছেলের পাল বুকে করিয়া নিদ্রা গেল, নিশ্চিন্ত সুখ-নিদ্রা, আনন্দ নহিলে কি সে আসে !

আর কাত্নর স্বামীর উদাসীনতার মাঝে একটা আনুগত্য আছে, একটা নির্ভরতার মাধুর্য আছে, নিবিড় একটি আত্মসমর্পণ।

নিবিড় আত্মসমর্পণ—ওই বস্তুটিতেই কাত্নর জীবনের সার্থকতা, আনন্দ ! ওইটুকুরই অভাব তুলসীর ; ওইটুকুই সব !

ওই অভাবটাই প্রত্যক্ষ, সকল বেদনার হেতু, তুলসীর মনে পড়িল দেবতার পায়ে আত্মসমর্পণ করিতে গিয়া একদিন এই শূন্যতার বেদনা হেতুই সে মানুষের মাঝে তৃপ্তি খুঁজিয়াছিল।

তুলসী ব্যাকুল অন্তরে সেই হারানো দিন ফিরিয়া পাইতে চাহিল ; মানুষ তাই চায়, কিন্তু হায় রে, দিনের পর আবার দিন আসে সেই, আলো সেই কলরোল লইয়া, কিন্তু মানুষের যে দিনটি যায় সে আর আসে না।

তুলসী সর্ব্ব দেহমন দিয়া মানুষকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিল, ঐ মানুষটিই তাহার সে হারানো দিন ফিরাইয়া দিতে পারে।

দোলের দিন আবার সে রং-এর খেলা খেলিতে চায়,—রাসের দিন

সারা রাত্রি জাগিয়া গান করিতে চায়। জীবনে সে লীলা চায়।

শ্রাবণ মাস, সম্মুখে ঝুলন পূর্ণিমা, মেঘাচ্ছন্ন শুক্লপক্ষের বর্ষণমুখর রাত্রি ; মেঘ-বারিত জ্যোৎস্নার আভার সচ্ছলতায় অবিরত ধারাপাতের ঝর ঝর ধারা কুহেলীর মত দেখা যাইতেছে। রাত্রিটা তুলসীর বড় মধুর লাগিল।

মহান্ত সেদিন বাড়িতে নাই, তুলসী কালও এমনি একটি রাত্রি কামনা করিয়া মনে মনে একটি সংকল্প করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। দেব-মন্দিরে ঝুলনা ঝোলান হইয়াছে, যুগল বিগ্রহ ঝুলনে অধিষ্ঠান হইয়াছেন ; এই শয়ন-মন্দিরে তাহারও ঝুলনা ঝুলাইবে, তাহারাও দুজনে ঝুলনে দোল খাইবে—দে দোল, দে দোল !

এই সুখ-কল্পনায় তুলসী বিভোর হইয়া উঠিল।

বর্ষার শ্যাম-শোভার মত সুশ্যাম শাড়িতে দেহখানি সে বেড়িবে, ঘন কুঞ্চিত কেশদাম তাহার এলান থাকিবে, সজল হাওয়ায় এলো-মেলো উড়িয়া সে চুল মহান্তর মুখের উপর পড়িবে ; নাকে সে এমন রসকলিটি কাটিবে তেমনটি বোধ হয় আজও কখনও হয় নাই !

মহান্তের গলায় দিবে গন্ধরাজের মালা, সে লইবে বেলার মালা, কানে দুটি করিয়া রজনীগন্ধা, চুলের উপর তারা-ফুলের মত ছোট ছোট জুঁই ফুলের মালার বেষ্টনী !

কিন্তু এমন স্বচ্ছ বর্ষণমুখর সুন্দর রাত্রিটি কি কাল হইবে ? তুলসীর আক্ষেপ হইতেছিল, আজ যদি সে থাকিত ! শুধু আক্ষেপ নয়, নারীটি পুরুষটির জন্য একটি সলজ্জ মধুর বেদনাময় অভাব অনুভব করিতেছিল, কেহ সেখানে নাই, তবু লজ্জা, যেন নিজের কাছে নিজেরই লজ্জা ! সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, প্রভুর দরবারে কীর্তন গাহিতে হইবে তাহাকে, সে খঞ্জনি লইয়া বিগ্রহমন্দিরের দুয়ারে বসিয়া গান ধরিল—

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।"

কণ্ঠস্বর সে উচ্চে তুলিতে পারিল না, অতি সলজ্জ মৃদু কম্পিত স্বর !

পরদিন প্রভাতে তখনও মেঘ কাটে নাই, তুলসী সজল মেঘ

দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল, আজও তবে তেমনি রাতটি পাওয়া যাইবে। হয়ত' তার চেয়েও সুন্দর স্বচ্ছতর, আজ চাঁদ এককলা বাড়িবে যে! তুলসী ঝুলনের বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইয়া উঠিল; মাথালী মাথায় দিয়া সে বড় পিঁড়েখানি ঘরে আনিয়া তুলিল, হ্যাঁ ইহাতে বেশ হইবে, দু'জনের বেশ বসা হইবে। তাহাতে সে বিচিত্র আলপনার রেখা টানিয়া দিল, দুটি পদ্মও আঁকিল!

তারপর সে বাহির হইয়া গেল। যখন ফিরিল তখন মহান্ত ফিরিয়াছে, দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে,—মহান্তকে দেখিয়া তুলসী কাপড়ের আঁচলে কি যেন লুকাইল, বেশ দেখাইয়াই লুকাইল! কিন্তু মহান্তের কোন কৌতূহলই উদ্রিক্ত হইল না, সে আপনমনেই বিরক্তিভরে বলিতেছিল—"জ্বালাতন রে বাপু, সারাদিন সারারাত টিপটিপ ঝিপঝিপ, হবে ত' তাই ভাল করে হোক রে বাপু, তা না সারাদিন মেঘলা!"

তুলসী কহিল—"হোক না বাপু, তোমারই বা কি, আমারই বা কি? কাল কেমন রাতটি হয়েছিল দেখেছিলে?"

মহান্ত কহে—"হ্যাঁ রাতটি বেশ হয়েছিল বটে!"

তুলসী খুশি হইয়া উঠিল, মহান্তের প্রাণ এখনও আছে। আহা —রূপ-সন্ধানী বৈষ্ণবের প্রাণ!

সে আঁচল হইতে লুকান জিনিসটা বাহির করিল, বেশ মোটা দড়ির আঁটি একটি, মহান্তের সম্মুখে রাখিয়া কহিল—"দেখ ত!"

ডান হাতে হুঁকা টানিতে টানিতে মহান্ত কহিল—"কি হবে কি?"

তুলসী তরুণীর মত ঝঙ্কার দিয়া কহিল—"বাঃ রে, আমি বললাম, দেখ ত জিনিসটা কেমন, উনি জিজ্ঞেস করছেন কি, হবে কি? আগে আমার কথার উত্তর দাও।"

দড়ি দেখিয়া মহান্ত কহিল—"দড়ি ভাল, শক্ত বটে; এখন কি হবে শুনি?"

তুলসী স-কৌতুকে কহিল—"বল দেখি কি হবে? দেখি তুমি কেমন!"

মহান্ত যেন একটু বিরক্তিভরে কহিল—"তাই ত' পাঁচবার জিজ্ঞাসা করছি।"

তুলসী কহিল—"আচ্ছা বলছি, আগে আর একটি কথার জবাব দাও দেখি; দু'জন মানুষের ভার সইবে এতে?"

—"কেন গলায় দিয়ে ঝুলতে হবে নাকি? তা সইবে।"

তুলসীর মুখ ম্লান হইয়া গেল, এমন কথাটাকে সে কিছুতেই রহস্য বলিয়া সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইতে পারিল না; তবু সে কহিল—"আজ ঝুলন হবে আমাদের, শোবার ঘরে ঝোলনা টানাব।"

তুলসীর মুখের পানে চাহিয়া মহান্ত বেশ সরস শ্লেষেই কহিল—"বয়স দিন দিন বাড়ছে না কমছে?"

—"কেন?"

—"নইলে এখনও তোমার ঝুলনের সাধ? আয়নাতে কি মুখ দেখা যায় না, না নিজের রূপ খুব ভালই লাগে?

তুলসীর বুকে যেন ব্যথা ধরিয়া গেল, দড়ির গোছাটা হাত হইতে আপনি পড়িয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়া তোলা বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই ঘরখানায় ভামিনী মরিয়াছিল, মহান্ত ভ্রমেও এঘরে পা দেয় না। কাঁদিতে কাঁদিতেই সে শুনিল মহান্ত গুঞ্জন করিয়া গাহিতেছে—"গেল নীল সাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।"

তুলসীর ক্রন্দনের বেগ বাড়িয়া গেল।

মহান্ত গান থামাইয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে কহিল—"আমি ঘুরে আসি, ক'টি লোক আসবে, প্রভুর পূজার ফুল, ভোগ, অতিথ-সেবার সব ঠিক ক'রে রাখ, দেরী না হয়!" বহুক্ষণ কাটিয়া গেল;—তুলসীর মনে হইল ভামিনীর কথা। মরণের দিন সে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিয়াছিল—"রূপ একদিন আমারও ছিল।"

সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল—বেদনার বিলাপ; আজ মনে হইল প্রচ্ছন্ন অভিশাপ।

তুলসী তাড়াতাড়ি ওঘরে গিয়া দেওয়ালে টাঙানো আরশিখানা

লইয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল ; মুক্ত আলোকে নিবিষ্টচিত্তে আপন রূপ দেখিতে বসিল ;—সত্যই ত কোথায় সে প্রাণ-মাতানো রূপ তাহার ! সেই গৌর বর্ণ আছে, কিন্তু তাহার চিক্কণতা আর নাই ; সেই ললাট, কিন্তু মসৃণ স্বচ্ছতা আর নাই। মহান্ত বলিত 'জান, প্রথম দিন তোমার কপালে চাঁদ দেখেছি আমি'—মসৃণ স্বচ্ছ ললাট তাহার চাঁদের প্রতিবিম্ব তুলিয়া লইয়াছিল। গালে সে টোলটি এখনও পড়ে কিন্তু তাহার পাশে পাশে কয়টি সূক্ষ্ম রেখার আভাস জাগিয়া সে শোভা তাহার ম্লান করিয়া দিয়াছে ; বাঁকা নাকটির প্রান্তদেশে কাল মেচেতার রেশ ; সেই সে, সেই রূপ, কিন্তু নূতনের অপরূপত্ব তাহার আর নাই ! এই দীর্ঘ দিনে ধরার-ধূলা তাহাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। তুলসী তাড়াতাড়ি আরশিটি বন্ধ করিয়া দিল ; রূপের জন্য তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কয় ফোঁটা অশ্রুও ঝরিয়া পড়িয়া ধরার ধূলায় মিশিয়া গেল।

হায় রে, রূপ কেন অজয় অটুট নয় !

ইহারই কয়দিন পর, আকাশ তখনও মেঘলা হইয়া আছে ; তুলসী বিগ্রহ-মন্দিরের দাওয়ায় বসিয়া মালা গাঁথিতেছে, আর আপন মনে গাহিতেছে—

"আমি হরি লালসে তনু তাজব পাওব আন জনমে।"

মহান্ত আজ দিন তিনেক বাড়িতে নাই ; সেই লোক কয়টির সঙ্গে কোথায় গিয়াছে, টাকাকড়ি লইয়া ব্যাপার ; কত টাকা ও দিল, কিন্তু তুলসী কোন খোঁজ করে নাই ; তাহাতেই বা কি স্বার্থ তাহার, মহান্ত যে নাই, তাহাতেই বা তাহার কি যায় আসে !

মহান্ত আসিয়া বাড়ি ঢুকিল, কপালে তাহার চন্দনের তিলক জ্বলজ্বল করিতেছে, গলায় ফুলের মালা, পরণে গরদের কাপড়, অঙ্গে উত্তরীয় !

তুলসী মুগ্ধ হইয়া গেল, সে তাহার হাতের মালাগাছি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, হোক দেবতার নামে গাঁথা মালা ! সে কাছে আসিয়া কহিল—"একি এ যে নটবর বেশ !" দু'হাতে তুলিয়া সে মহান্তের

গলায় মালা দিতে গেল, কিন্তু সহসা তাহার হাত যেন পঙ্গু অসাড় হইয়া গেল ; সে আর্তস্বরে কহিল—"ও—কে মহান্ত ?"

মহান্তের পিছনে একটি তরুণী নারী, শ্যামাঙ্গী কিন্তু সর্বাঙ্গব্যাপী একটি চটুলতায় সে অপূর্ব, সে চটুল রূপ তাহার ষোল কলায় বিকশিত।

মহান্তকে উত্তর দিতে হইল না, চঞ্চলা তরুণীটিই উত্তর দিল—"আমি নতুন সেবাদাসী গো !"

তুলসীর হাতের মালাগাছি তৎক্ষণে হাত হইতে পড়িয়া গেছে। মেয়েটি আগাইয়া কহিল—"তুমিই বুঝি তুলসী বোষ্টুমী, গাইয়ে, বাজিয়ে, বলিয়ে-কইয়ে, রূপে মরি মরি। ও হরি—এই তুমি !"

সে ঠোঁটের আগায় একটা পিচ কাটিয়া দিল।

ততক্ষণে তুলসী নিজেকে সামলাইয়া নিয়াছে।

সে কহিল—"হ্যাঁ আমি তুলসী। এখন পাশে এসে দাঁড়াও দেখি, —বরণ করে ঘরে তুলি ; আ—আমার মনের মাথা খাই, পিঁড়ির ওপর দাঁড়াতে হয় যে !"

সে সেই বড় পিঁড়িখানি আনিয়া পাতিয়া দিল,—সেদিনের সে আলপনা আজ ঝকঝক করিতেছে, দুটি জনের তরে দুপাশে দুটি পদ্ম !

পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া সে ঘট শঙ্খ দেবমন্দির হইতে বাহির করিয়া আনিল।

মেয়েটি তখন মহান্তকে বলিতেছে—"আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে ত'।"

তুলসী মহান্তকে কহিল—পিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়াও।"

মহান্ত কহিল—"থাক্।"

হাসিয়া তুলসী কহিল—"এযে করণীয় কাজ গো ! উঠে দাঁড়াও আমি বরণ করি, তুমি এই পদ্মে—তুমি ওই পদ্মে।"

বরণ করিতে করিতে সে হাসিমুখেই কহিল—"এ জল ফুল আমি পাথরের যুগলের জন্য রেখেছিলাম, তা সত্যি যুগলের সেবা হল, ভাগ্যি আমার !"

বলিয়া সে শাঁখ বাজাইল।

সন্ধ্যায় সে নিজহাতে ফুলশয্যা সাজাইয়া দিল। আপনি শুইতে

গেল ভামিনী যে-ঘরে মরিয়াছিল। সারাটা রাত ঘুম নাই চোখে ভামিনী যেন অন্ধকার কোণে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। তুলসীর ভয় হইল না—সেও হাসিল।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান ইত্যাদি সারিয়া তুলসী মহান্তকে খুঁজিল;—মহান্ত নাই, উঠিয়াই কোথা চলিয়া গিয়াছে।

ভামিনীর ঘরেই সে বসিয়া রহিল, মহান্তেরই প্রতীক্ষায়। ওঘরে তরুণীটির নিদ্রা তখনও ভাঙে নাই।

মহান্ত একটু বেলা হইলে ফিরিল, কিন্তু ফিরিল যেন একটু আড়াল দিয়া।

তুলসী তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, সে ডাকিল—"মহান্ত!"

মহান্ত নতমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

তুলসী হাসিয়া কহিল—"এমন লুকিয়ে ফিরছ কেন বল ত?"

নতচক্ষেই মহান্ত কহিল—"আমায় মাপ কর তুলসী।"

তুলসী হাসিমুখেই কহিল—"রাগ ত' করিনি আমি।"

মহান্ত ব্যগ্রভাবে কহিল—"সত্যি কথা বল তুলসী।"

কয়খানা ভাঁজ-করা কাপড় বেশ করিয়া ঝাড়িয়া একটা পুঁটুলিতে বাঁধিতে বাঁধিতে তুলসী কহিল—"না।"

মহান্ত আদর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইতে তুলসী বেশ মর্যাদার সহিত আপনাকে মুক্ত করিয়া পোঁটলাটি কাঁখে তুলিয়া কহিল—"আমায় বিদেয় দাও!"

—"সে কি?"

—"হাঁ আমি আসি।"

—"তুমি যে বললে রাগ করনি।"

—"সত্যিই আমি রাগ করিনি, কিন্তু মহান্ত, দিদির কথা মনে পড়ে তোমার, আমি যেদিন আসি?"

মহান্ত নীরবে তুলসীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

তুলসী কহিল—"মহান্ত, আমিও ত' মেয়ে মানুষ!"

মহান্ত তুলসীর হাত ধরিয়া কহিল—"তুলসী তোমারই রাজত্ব, ও

দাসী হয়ে থাকবে, জান ত' বৈষ্ণবের সাধনা রাধারানী—যৌবন—রূপ—,"

—"জানি মহান্ত, যৌবন রূপ সামনে না থাকলে ধ্যানে ধারণা হয় না, কিন্তু আমিও ত' বৈষ্ণবী, আমারও ত' চাই শ্যাম-কিশোর একটি !"

মহান্তের মুখে বাক্ ফুটিল না।

তুলসী দ্বারের সমীপে গিয়াছে, তখন মহান্ত কর্কশকণ্ঠে কহিল—"বলি তারই সন্ধানে চললে বুঝি ?"

তুলসী মহান্তের মুখপানে ফিরিয়া চাহিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল—"হ্যাঁ গো ! তারই সন্ধানে চলেছি আমি। তুমি আশীর্বাদ কর।"

সে হাসিতে, সে স্বরে ব্যঙ্গ নাই, শ্লেষ নাই, ব্যথার রেশও পাওয়া যায় না ;—বিচিত্র সে হাসি, বিচিত্র সে কল-স্বর।

গ্রামের প্রান্তে সেই মাঠখানি, সেই আঁকাবাঁকা আলিপথখানি, এই পথের কোন্ এক বাঁকে তুলসী মানুষকে ভালবাসিয়াছিল। এই পথেই সে সন্ধ্যাজোল আসিয়াছিল, আজও সেই পথেই সে চলিয়াছে ; কোথায়—সেও জানে না ; তবে আপন গ্রামে নয়, সেটা ঠিক , কানুর কাছে এ দৈন্য লইয়া সে দাঁড়াইতে পারিবে না।—

পথ ত' আছে—অনন্ত বিস্তৃত পথ, তাহারই পাশে পাশে গৃহস্থের দুয়ার !

সে খঞ্জনি বাজাইয়া আপন মনে পূর্ণকণ্ঠে এ জীবনে প্রথম গান শুরু করিল—

"সখি বলিতে বিদরে হিয়া,—
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারই আঙিনা দিয়া।"

কিন্তু গানটি সে শেষ করিতে পারিল না, অভিশাপের কলি তাহার কণ্ঠে ফুটিল না।

'—ও চাষকে চে—য়ে নিবারণে— এ মা— ন্দেরী—ভা-ল-ও।'

শ্রাবণের অবিরাম রিমিঝিমি বর্ষণের মধ্যে গোপালের বাপ হরি মোড়ল জল-ভরা জমিতে লাঙ্গল চষিতে চষিতে আপন মনে ওই পুরাতন গানটি গাহিতেছিল, হঠাৎ দেখিল পুত্র গোপালচন্দ্রের হেফাজতের গরু-গুলি দিব্য কাল-বরণ বীজ ধানের ক্ষেতে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেছে, আর শ্রীমান কোথায় উধাও। ধেনুচারণ ত ছাড়িয়াছেই—গোপাল বেণুও বাজায় না যে শব্দভেদী গালি নিক্ষেপে হতভাগাকে ফিরাইয়া আনা যায়।

অগত্যা হরি মোড়লকে গান ছাড়িয়া লাঙ্গল থামাইয়া ছুটিতে হইল। '—উরো গরুটা ঘুরো—রৈ—ঘুরো—রৈ—ধানের বীচনে লাগল রৈ—বলি ওরে ও গোপলা রৈ—' বেচারা যায় আর একবার করিয়া পিছন ফিরিয়া হেলে বলদ দুইটিকে অনুরোধ করে, উপদেশ দেয়—'হ—হ বাপধনরা—একটুকু হ,—অ হ হ; বীচ কটার সাবাড় মেরে দিয়েছিল আর খানিকে—হারামজাদা বেটা গেল কোথায়—এই এই-ই ইদিকেই, ওই ওই, কথা শোনে না; নিজের ভুঁই চেন না—গোয়াল ছাড়া গরু, পরের ভুঁই থাকতে নিজের ভুঁয়ে এঁ্যা?' বলিয়া সপাং করিয়া এক লাঠি গরুর পিঠে বসাইয়া দিল।

শ্রীমান গোপাল তখন সম্মুখের বাগানের ওপাশের মাঠের আইলের উপর বসিয়া ভিজিতে ভিজিতে ঘাস কাটিয়া একটি আট দশ বছরের মেয়ের ঝুড়ি বোঝাই করিয়া দিতেছিল। মেয়েটি বাগানের একটি গাছতলে বসিয়া হিহি করিয়া কাঁপিতেছিল।

গোপাল ঘাস কাটিতে কাটিতে বলে,—'ভিজে কাপড় নিঙড়ে নাও বেশ করে, অসুখ করবে। মাথার চুলগুলো মোছ, আমার ঐ গামছা নিয়ে সেই ফ্যাটাং ফ্যাটাং করে ঝেড়ে ফেল—যে বড় বড় চুল।'

মেয়েটির চুল কিন্তু আদৌ বড় নহে; বয়সের অনুপাতে ক্ষয়া ক্ষয়া চেহারা মেয়েটির, মুখশ্রী নিখুঁত নয় তবু চটক আছে। নাকটি একটু খাঁদা খাঁদা, কিন্তু তাতেই যেন মানায় বেশী; কপালটি ছোট, চোখ দুটি পটলচেরা নহে—ভীরু চাহনি-ভরা ভাসা ভাসা চোখ, মাথার চুল সম্মুখের দিকে বেশ কপাল-ঢাকা কিন্তু লম্বায় খাটো, চুলের প্রান্তগুলি সাপের ফণার মত বাঁকা বাঁকা। প্রবীণা মেয়েরা বলে,—'বয়সে চুল বাড়বে, তারই লক্ষণ; না, ললিতে আমাদের বেশ মেয়ে, বয়েসকালে খাসা ডগডগে মেয়ে হবে।' শুনিয়া গোপালের খুশি ধরে না; সে ললিতাদের বাড়ির আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় ললিতাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য। ললিতা গোপালের বৌ; ন দশ বছরের গোপালের সঙ্গে পাঁচ বছরের ললিতার বিবাহ হইয়াছিল, সে আজ চার পাঁচ বৎসরের কথা।

ললিতার বাপ ছিল না, মা তাহার মেয়েটিকে লইয়া জোত জমার ধানে, গাই কটির দুধে, বেশ দুধে-ভাতেই দিন কাটাইতেছিল।

ললিতার মা চিত্তকালী আর গোপালের মা কাত্যায়নী দুজনে সই। ললিতার মা সইকে বলিল, 'গোপালে আর ললিতেতে কি করছে, মজা দেখ।'

কাত্যায়নী হাসিয়া সারা, গোপাল ললিতাকে বৌ সাজাইয়া খেলাঘর পাতিয়াছে। চিত্ত বলে,—'দুটিতে মানিয়েছে দেখ ভাই! তা ভাই সই, ওদের এ খেলাঘরের সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।'

কাত্যায়নীও অতি আনন্দে সারা হইয়া বলে,—'বেশ বলেছিস ভাই, খুব ভাল হবে।'

চিত্ত বলে,—'ললিতে আমার চোখের সামনে থাকবে'—বলিতে বলিতে তাহার চোখ জলে ভরিয়া যায়, রুদ্ধকণ্ঠে সইকে বলে—'ওকে ছেড়ে আমি একদণ্ড থাকতে পারি না সই, মোড়ল যখন গেল তখন বুকে রাবণের চিতা জ্বলে উঠেছিল, ও আমার সেই আগুনে জল দিয়েছে। এ বিয়ে কিন্তু দিতেই হবে, সই।' বলিয়া সইএর হাত চাপিয়া ধরে। কাত্যায়নী বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলে,—'এত করে বলতে

হবে কেন ভাই, গোপাল কি তোর পর, ও তো তোরও ছেলে, আমার মতিচ্ছন্ন যদিও হয়, তুই জোর করে দিবি।'

ক্ষণেক পরে কাত্যায়নী হাসিয়া কহে—'সম্বন্ধ ত পাকা হয়ে গেল, এখন বিয়ের পর আমাকে কি বলবি?—সই না ব্যান?' চিত্ত এবার মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলে,—'তোমাকে বলবো সই, আর সখাকে বলবো ব্যাই।' কাতু ঝগড়া করে, ঝঙ্কার দিয়া বলে—'মর মর, তোর গরজে ধন্যি যাই, আমার ব্যাই নাই, আবার ব্যান বলতে পাবো না, না ভাই তা হবে না।'

—'না ভাই, সে আমি পারবো না।'

—'আচ্ছা, ললিতে যা বলবে তাই হবে' বলিয়া চার বছরের ললিতাকে কোলে টানিয়া আদর করিয়া বলে—'বলত লক্ষ্মী মা মণি, আমাকে কি বলবে তুমি, সইমা—না শাশুড়ী?'

বাস্তবে যাই হোক না কেন, ছোট ছেলেমেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ী নাকি বড় সাধের বস্তু, কল্পলোকে তার বাস, ললিতা আধ আধ ভাবে বলে—'ছাছুলী'।

চিত্ত মেয়েকে বাধা দেয়—'এই এই, না, বল 'ছাছুলী' না—সইমা।' অবাধ্য মেয়ে বলে—'না ছাছুলী।' কাত্যায়নী বাজি জিতিয়া খুব হাসে। চিত্ত আরও চেষ্টা করে, মেয়েকে ভয় দেখায়—'শাশুড়ী মারে'; মেয়ে বলে—'না, ছন্দেশ দেয়।' কাতুর মন গলিয়া যায়, এতটুকু মেয়ের শাশুড়ী ভক্তি দেখিয়া সে প্রবল উৎসাহে বাগ্‌দান করিয়া বাড়ি ফিরিল। বলিল—'এই মাঘ মাসেই কিন্তু বিয়ে হবে ব্যান?'

—'আমাকে আজই বল কেন সই।'

—'আবার সই? না ভাই তা হলে—'

—'আচ্ছা, আচ্ছা, ব্যান, ব্যান, ব্যান—হল ত?'

বাড়িতে ফিরিয়া সেইদিন অপরাহ্ণেই কাতু স্বামীর কাছে কথাটা পাড়িয়া ফেলিল। হরি মোড়ল দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিল; কাতু উঠান ঝাঁট দিতে দিতে বলিল, 'আমি সইকে কথা দিয়েছি, এ বিয়ে তোমাকে দিতেই হবে, আর এই মাঘ মাসেই দিতে হবে।'

হরি মণ্ডল জাতে চাষা হইলে কি হয়, বেশ হুঁসিয়ার লোক; গাঁয়ের লোক কেউ বলিত 'ইন্দুরূপের প্যাঁচ', কেউ বলিত 'জিলিপীর পাক'।

হরি মণ্ডল রাগিত না, হাসিয়া বলিত—'বাবা, এ সংসারে নিজের গণ্ডা যে বুঝতে পারে সেই মন্দ। তা বল, তোমরা বল, হাম্ কিন্তু নেহি ছোড়েগা, নিজেরটি ষোল আনা বুঝে নেবোই, হ্যাঁ হাঁ।' কিন্তু বুঝিবার সময় বুঝিত সে আঠারো আনা। হরি মণ্ডল পরকে দোষ দিবে কি, তাহাব গৃহিণীও তাহাকে মাঝে মাঝে ঐ নামে অভিনন্দিত করিত, অবশ্য সেটা দাম্পত্য-কলহের সময়—তাই বুদ্ধিমান হরিচরণ সেটা গায়েই মাখিত না। স্ত্রীর এই নতুন সম্বন্ধের প্রস্তাবে হরিচরণ কোন কথাই কয় না, সে মনে মনে লাভ লোকসান খতাইয়া দেখে। তা মন্দ কি? ঐ ত একমাত্র মেয়ে, ও-ই সমস্ত ক্ষুদ-কুঁড়ার মালিক আর নেহাত ক্ষুদ-কুঁড়াও ত নয়, বিঘা আষ্টেক দশ ধানী জমি, কাঠা তিনেক বাস্তু, দু-তিনটে পুকুরের অংশ, মন্দই বা কি? গোপালের মায়ের এ নীরবতা ভাল লাগিল না, সে তীব্র সুরে ঝঙ্কার দিল—'বলি কথা কও না যে?' হাতের ঝাঁটাগাচটার ঘর্ষণ-শক্তি যেন বাড়িয়া উঠিল।

হরিচরণ একটু মৃদু হাসিল, ওই হাসি দেখিলে নাকি কাতুর অঙ্গ জ্বলিয়া যাইত, সে ঝঙ্কার দিয়া বলিত—'দেখ, যা বলবে খুলে বল, তা না, আমি মাগী এক ঘর এক পৌটি বলে মলাম, আর উনি মনে মনে জেলাপীর পাক মেরে হাসলেন একটু 'মসনেফুলী' হাসি, মনে হয় হাসির মুখে মারি তিন ঝাঁটা।' আজ আবার সেই গা-জ্বালানো হাসি দেখিয়া কাতুর ঝাঁটা নীরব হইয়া গেল, সে স্বামীর সম্মুখে আসিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিল,—'বলি হাসছ যে?'

কথার সুরে ঝাঁজ থাকিলে মোড়ল টলিত না, কিন্তু আজ কাত্যায়নীর কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে পত্নীর দিকে না চাহিয়া পারিল না—বেচারী চমকিয়া উঠিল, হ্যাঁ, হাতে ঝাঁটা-গাছটা শক্ত করিয়াই ধরা আছে। তাল বজায় রাখিতে হরিচরণ তাড়াতাড়ি কহে

—'হ্যাঁ, তা ভাল, তা বেশ ভালই হবে, কন্যেটিও বেশ, সবই পাবে থোবে, আর ব্যা—নটিও বেশ।' কহিতে কহিতে মোড়লের চোয়াল ভরিয়া রসালো হাসি ফুটিয়া উঠিল। কাতু আরও গম্ভীর স্বরে বলিল 'কি?'

মোড়লের মৃদুমধুর হাসির কারণটি ধমক খাইয়া অসতর্ক মুহূর্তে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল। সম্পত্তির দিকটি দেখিয়া মোড়লের অন্তর্দৃষ্টি পড়িয়াছিল—বেয়ানের ওপর। বেয়ানের রূপখানি মনে করিয়া তাহার মুখে মৃদুমধুর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পুনরায় ধমক খাইয়া জিলিপীর পাক চট করিয়া একটা পাক ফিরাইয়া শোধরাইয়া লইল—'বা, সই তোমার ভাল লোক নয়!'

মোড়লের নাকি খানিকটা দোষও ছিল—তবে কাতু নাকি বড় কঠিন মেয়ে তাই এদিক-ওদিক চোখ ফিরাইবার তার জো ছিল না। প্রথম বয়সে কাতু স্বামীকে লইয়া অনেক ভুগিয়াছে, তাই এখন তাহাকে বশে পাইয়া অতি কঠোর বন্ধনে বাঁধিয়াছে। পুকুর পাড় দিয়া যাইতে যাইতে ঘাটের পানে চাহিলেই সর্বনাশ,—ঘরে ফিরিয়া আসিলে কে আসিয়াছিল খোঁজ লইলেই কাতু অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হানিয়া কৈফিয়ৎ চাহিয়া বসিত—'কেন বল দেখি, তোমার টনক লড়ল কেন?' তাই মোড়ল কথাটা শোধরাইয়া লইলেও কাতি সহজে ছাড়িল না, সে আরও ঝাঁজাইয়া কহিল—'তা এমন রসান দিয়ে, "ব্যা—নটিও বেশ" বলা হ'ল কেন?'

হরিচরণও বড় ধূর্ত, সে হাসিয়া কথাটা পরিহাসের পর্যায়ে ফেলিয়া এড়াইতে চাহিল—'তা সংসারে ত ব্যাই ব্যান রসগোল্লা পাওয়ার মত —রসের জিনিসই বটে।' কাতুও হারিবার মেয়ে নয়—সে রসিকতার জবাব বেশ একটু গম্ভীরভাবে বাঁকাইয়া দিল—'শুধু রস? তোমার রস গেঁজে তাড়ি হয়ে উঠেছে—মদো গন্ধ যে লুকোবার নয় তা জান।'

কে নাকি ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়াছিল কলা চুরি করিতে। অসময়ে দেবতার ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া পথের লোক—'কে ঘরে' বলিয়া প্রশ্ন করিতে অসতর্ক চোর উত্তর দিয়াছিল—'আমি ত কলা খাই নাই।'

মোড়লের এবার হইল তাই, কাতুর গম্ভীর রসিকতায় সত্যই ধরা পড়িয়াছে সন্দেহে বুকের মধ্যে তাহার ঢেঁকি কোটা শুরু হইয়া গেল ; সে অতি দুর্বল কৃত্রিম ক্রোধে কাতুর উপরই দোষ চাপাইয়া বলিল— 'আচ্ছা ছাঁদ-ধরা বেঁকা মন তোমার, বলে যে, সেই—কেষ্ট বল্লে বাঁধে, রাধা বল্লে ছাঁদে। যা বলব তাতেই দোষ, আবার আমাকে বলে জেলাপীর প্যাঁচ। হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ।' ওই হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ করিতে করিতে সে সরিয়া পড়িয়া বাঁচিতে চাহে। কাত্যায়নী পিছন হইতে বলিল— 'বলি পালাচ্ছ যে, কি বলছ বলে যাও।'

মোড়ল এতক্ষণে কাতুর আঁচে আগুন ঠাওরানর কথাটা ধরিয়া ফেলে, সে ফিরিয়া বসিয়া এক কথায় কথাটা সারিয়া ফেলে,—'তা তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন আপত্তি করে কি করবো বল?'

তোষামোদে দেবতা তুষ্ট, কাতুও সন্তুষ্ট না হইয়া পারিল না। সে হাসিমুখে বলিল—'হুঁকোতে কি টানছ—ধোঁয়া যে নাই, দাও একবার তামুক সেজে দি।'

যাহা হউক দুটি সখীর বাল্যের পুতুল খেলা সার্থক হইল—সই হইতে বেয়ান হইল। কাতু গোপালকে সঙ্গে করিয়া বেয়ানের বাড়ি যায়, গল্প করে, ভবিষ্যতের কত উজ্জ্বল ছবি আঁকে। ওদিকে আঙিনায় গোপাল ললিতায় খেলা করে, ওরাও দুজনে পাথর পুতুল লইয়া ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেয়—গোপাল ললিতাকে ডাকে ব্যান।

ললিতা উত্তর দেয়—'কি গো ব্যাই।' দাওয়ার উপরে কাতু সইকে ঠেলিয়া দিয়া হাসিয়া লুটাইতে লুটাইতে কহে—'ওই শোন।' চিত্ত বেয়ানের ঠেলায় পড়িয়া গিয়া পড়িয়া পড়িয়াই হাসে, কাতু ছেলেকে শেখায়—'ব্যান্ বলতে নাই, বৌ, তোমার বৌ।' ললিতার মা ললিতার মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া কহে—'বর তোমার, মাথায় কাপড় দিয়ে লজ্জা করতে হয়।' ছোট্ট ললিতা ঘাড় নাড়িয়া কহে 'বেশ'।

ওদিকে হরিচরণ ছটফট করে; তাহার মনে ছিল বেয়ানের জমিটুকু

সত্ত সত্ত আত্মসাৎ করিয়া আপনার চাষ বাড়াইয়া ধানের গোলার পেট মোটা করে। বিধবার একটা পেট, আর ঐ এক ছটাক একটা মেয়ে, হাত তোলা কিছু দিলেই চলিবে। কিন্তু বেচারা কথাটা পাড়িতে পারে না। বেয়ানের কথাও মনে পড়ে কিন্তু সাহস হয় না, পত্নীর মোটা মোটা চোখের খরদৃষ্টি মনে পড়ে। এদিকে চাষের সময় আসিয়া গেল। আপন জল্পনা কল্পনা ব্যর্থ হয় দেখিয়া একদিন কাতুকে সে বলিল—'একটা কথা বলছিলাম—।'

কাতু বলিল—'বল কেন, আমি কি বারণ করেছি—না শুনবো না বলেছি।'

—'ব্যানকে বল, ভাগ জোতের জমিটা ছাড়িয়ে নিলে হয় না? ভাগ জোতদারের ভাগটা তো বেরিয়ে যায়, আমাদের হালে চষলে সেটা ঘরেই থাকবে।' কাতু কথা কয় না, সে সাত-পাঁচ ভাবে।

মোড়ল বলিল—'কি বলছ?'

কাতু বেশ গম্ভীরভাবে বলিল—'কাজ কি বাপ, ব্যান কুটুম বেশ আছি, আবার জমি নিয়ে ধান নিয়ে গোলমালে কাজ কি? তোমার ফলবে হয়ত পাঁচ মণ, লোকে বলবে দশ মণ বিশ মণ, বলবে মোড়ল ব্যানকে ফাঁকি দিলে। কুটুমের সঙ্গে বিষয় ব্যাপার ভাল নয়, জান তো! ঝকমারি—কুটুমের সঙ্গে বিষয় ব্যাপার!'

মোড়ল বলিল—'তা লোকসানটা বোঝ—।'

—'আমার লাভ লোকসানে কাজ নাই বাপু, ও করো না।'

—'তুমি একবার বলেই দেখ না।'

কাতু চুপ করিয়া থাকিল, কথা কহিল না—বেয়ানকেও কিছু বলিল না। মোড়ল কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সে সুযোগ বুঝিয়া বেয়ানের বাড়ি আনাগোনা শুরু করিয়া দিল। কিন্তু বেয়াই আসিলে কি হয়, বেয়ান যে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বেয়াইকে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রাখিয়া দেয়। বেয়াই কথা পাড়ে—'এখন একটা কথা বলছিলাম ব্যান'। বেয়ান কথার উত্তর দেয় না। আর মোড়লের অগ্রসর হইতে সাহস হয় না, সে ফিরিয়া যায়।

একদিন সে মরিয়া হইয়া মাঝখানে পুত্রবধূকে খাড়া করিয়া কথা পাড়িবার চেষ্টায় কয়টা রসিকতা করিয়া ফেলিল; ললিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া মোড়ল বেশ উচ্চকণ্ঠে কহিল—'তোমার মাকে বলত—মা, বাবা এসেছে।' ললিতা শিক্ষামত তাই বলিল। ঘরের মধ্যে ললিতার মা মরমে মরিয়া গেল। বাহিরে মোড়ল হি হি করিয়া হাসিতে থাকিল। দীর্ঘ নীরবতায় সে আবার বলিল—'বল, বল বাবাকে দেখে লজ্জা করতে নাই।' বলিয়া সশব্দে হাসে, ভাবে অনেকটা অগ্রসর হওয়া গিয়াছে, পিছানো হইবে না।

এবার কিন্তু ভিতর হইতে উত্তর আসে—ললিতার মারফতে। ললিতা বলে—'মা বলছে, সইকে বলে দোব।' মোড়লের হাসির তাল কাটিয়া গেল। পরক্ষণেই আবার হাসিতে হাসিতে দরজা পর্যন্ত আগাইয়া গিয়া বাজু দুইটি ধরিয়া ভিতরে মাথা গলাইয়া বলিল—'তোমার সই-এর ভয়ে ত আমি—'

মোড়লের বলিবার উদ্দেশ্য ছিল—তোমার সই-এর ভয়ে ত আমি মরিয়া ভূত হইয়া আছি। কিন্তু ঐ আমি পর্যন্ত বলিয়া তাহার আর বলা হইল না! কি একটা শব্দে মুখ ফিরাইয়া ভয়ে সে না মরিলেও যে ভূত হইয়া গেল তাহাতে সন্দেহ নাই। হাসি বন্ধ হইয়া গেল, কথা বন্ধ, মুখ চোখ বিকৃত হইয়া গেল।

মোড়ল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল বাহির দরজায় কাতু সশরীরে বিরাজমানা। তাহার অন্তর আকণ্ঠ শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল, তামাকের ধোঁয়া পর্যন্ত বাহির হইতেছিল না। তবু মনে মনে মধুসূদন স্মরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পা দুইটা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপে যে! যাই হোক কম্পিতপদে সে বাহিরে পালাইবার চেষ্টায় কাত্যায়নীর পাশ দিয়া যাইতে যাইতে অযাচিত কৈফিয়ত দিয়া গেল—'সেই কথাটা ব্যানের সঙ্গে,—তা—তা—না হল—নাই হল, ব্যানকে শুধোও কেন—ঈশ্বরের দিব্যি তা—তা—'

কাতু দেখিল, স্বামী বাহির হইয়া আসিল চিত্তর ঘর হইতে। সে কোন কথা কহিল না, শুধু পলায়নপর স্বামীর দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বেয়ানের ঘরে ঢুকিল। গম্ভীর থমথমে মুখ, বুকের ভিতর ঝড়ের বাত্যা বহিতেছিল।

কাতুর জ্বলন্ত দৃষ্টি ব্যর্থ হয় নাই, পথে মোড়ল উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বার দুই হোঁচট খাইয়া সোজা শস্যশূন্য জনহীন মাঠে অকারণে গিয়া আঘাত-প্রাপ্ত আঙুলগুলি টিপিতে টিপিতে কৈফিয়তের পর কৈফিয়ত সৃষ্টি করিতেছিল, কিন্তু তাহার কোনটাই মনোমত হইল না। শেষে অতি বিরক্তিভরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল,—'কি বিপদেই পড়লাম আমি, হা ভগবান!'

এদিকে ললিতা কাত্যায়নীকে দেখিয়া গৃহবর্তিনী মাকে কহিল—'মা মোড়ল পালিয়েছে, শাশুড়ী এসেছে।'

ললিতার মা কন্যার সম্বন্ধ-জ্ঞানের পরিচয়ে আর বেয়ানের ভয়ে বেয়াই-এর পলায়নের কৌতুকে একগাল হাসি লইয়া বাহিরে আসিল, কিন্তু বেয়ানের আষাঢ়ে মেঘের মত থমথমে মুখ দেখিয়া তাহার হাসি শুকাইয়া গেল, তাহার বুকের ভিতর কেমন গুরগুর করিয়া উঠিল, বেয়ান ভাবিয়াছে কি?

গম্ভীরভাবে কাতু বলিল—'গোপাল আসে নাই?' যতখানি কৃতার্থ-হওয়া হাসি হাসা চলে ততখানি হাসি হাসিয়া চিত্ত বেয়ানকে কহিল—কৈ না ভাই, তা এস, বস। ললিতা মা, আসন এনে দাও তো শাশুড়ীকে।'

সেই সুরেই কাতু বলিল—'না, বসবো না, ঢের কাজ আছে; সেই মুখপোড়া ছেলের সন্ধানে এসেছিলাম—তা বড় অসময়ে এসে পড়েছি ব্যান, কিছু মনে করো না।' শীতের দিনে জল ছিটানো, আর মিথ্যা অপবাদ নাকি বড় গায়ে বাজে, চিত্তরও বাজিল। কয়েক মুহূর্ত সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল, পরে বেশ শান্ত কঠিন স্বরে কহিল—'না, বড় সুসময়েই এসেছ ব্যান, নইলে আজ হয় ত আমাকে অপমান করে বেয়াইকে তাড়াতে হত। তা ভালই হল, নিজেই দেখে গেলে, ব্যাইকে একটু সাবধান করে দিও; আর যদি কোন কাজই থাকে, যদি আসতেই হয় তবে তোমাকে যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসে;—ব্যাই-এর

রীত কারণ বেশ ভাল নয় ; আজ কদিন থেকেই ব্যাই আমাকে এমনি করে জ্বালাচ্ছে।' কথাটা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য এটা কাতুই সব চেয়ে বেশী জানিত, কিন্তু তবু স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের আকারে কথাটা তাহার সহ্য হইল না, সে প্রতিবাদ করিয়া কহিল—'তোমার ঘর তোমার দোর, অবিশ্যি যাকে মন বলতে পার, আমার দোর তুমি মাড়িয়ো না, মাড়ালে ঝাঁটা মারতে পার, গলায় হাত দিয়ে দূরও করতে পার, কিন্তু ব্যাই ব্যানের বাড়িতে ব্যাই ব্যান আসে, দুটো তামাসাও করে তা তোমার কোমল অঙ্গে যখন ফোস্কাই পড়ে তখন আর কেউ আসবে না। আমি তো আসতে দেবোই না, যদি নেহাত লুকিয়ে আসে তুমি লোক ঠিক করে রেখো, যেন পা দুটো ঠ্যাঙার ঘায়ে ভেঙ্গে দেয়।'

চিত্ত আর কূল পাইল না। এতখানি বিষ মানুষের জিভে থাকে তাহা তাহার ধারণাই ছিল না, সে স্তম্ভিতের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; কাতু উত্তরের প্রত্যাশায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যাইবার সময় আর একটা দংশন করিয়া গেল। বিষ তাহার ঠোঁটের আগায় তুফান তুলিতেছিল, সেই বিষ উদ্গার করিয়া কহিল—'এতই যদি পবিত্তা কাজ কি রূপের আদিখ্যেতা। বলি ঠেঙাই বা চাই কেন, লোককে মানাই বা করতে হবে কেন—নিজে রূপ কমালেই পার। বিধবা মানুষ চুলের পাঁজা না আঁচড়ে কেটে ফেল্লেই পারো, ঠোঁটের আগায় পান দোক্তার পিচ না কাটলেই পারো। লোককে দোষা কেন, বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকে না, না ঢাকলে যে মান থাকে না—সেই বিত্তান্ত।'

এত তীব্র বিষ চিত্তর সহ্য হইল না, বিশ্বসংসার তাহার চোখের সামনে যেন ছায়াবাজির মত নাচিতে লাগিল; আশ্রয়ের জন্য দুয়ারের বাজুটা ধরিতে গিয়া বেচারী ওই বাজুর উপরেই কপাল ঠুকিয়া পড়িয়া গেল। কপাল ফাটিয়া ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিল, ললিতা আর্তস্বরে—'মা,—মাগো' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে ক্রন্দনে ছুটিয়া আসিল গোপাল, সে পাশেই ওত পাতিয়া ছিল, মা ও শাশুড়ীর কথা কাটাকাটি

দেখিয়া ভিতরে ঢুকিতে সাহস করে নাই। দশ বছরের গোপালের চোখে মুখে জল দিবার অভিজ্ঞতা ছিল, না বিধাতা যোগাইয়া দিলেন কে জানে; সে শাশুড়ীর চোখে মুখে জল দিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। ললিতার মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিয়া গোপালকে বুকে লইয়া খুব খানিকটা কাঁদিয়া আপনার পোড়া অদৃষ্টকে বহু ধন্যবাদ দিয়া মনে মনে কহিল,—'আমি কিসের কাঙালিনী, আমি বৃন্দাবনের পরাণধন কানুর জননী।'

কাত্যায়নী ফিরিয়া যেন কেমন হইয়া গেল, কেমন উদাস মন স্বামীকে পর্যন্ত কিছু বলিল না। কথাটা লইয়া যে গোল করা চলে না, তাহাতে শুধু ত স্বামীর বা বেয়ানের কলঙ্ক প্রচার হইবে না, তাহার ভাগ্যের কলঙ্ক, নারী ভাগ্যের অতি বড় দৈন্যের কথাও প্রকাশ হইয়া পড়িবে যে! ভাগ্যের মর্যাদা লোকচক্ষে বজায় রাখিতে হতভাগিনীর মত বুকে রাবণের চিতা জ্বালাইয়া সে বসিয়া রহিল। কিন্তু সেই অবরুদ্ধ আগুনের সমস্ত শিখা বেয়ানকে দগ্ধ করিতে একমুখী হইয়া ধাবিত হইল। সে বলিল—'ছেলের আমি ফের বিয়ে দেবো।' মোড়ল মিটিমিটি করিয়া চাহিয়া সায় পুরিয়া সহানুভূতি পাইবার আশায় সোৎসাহে কহিল—'সেই দেওয়াই উচিত, বলত কালই আমি।' কাতু ঝড়ের মত আত্মহারা হইয়া বলিল—'তুমি কথা কয়ো না বলছি, আমি গলায় দড়ি দেবো—।' মোড়ল এবার কূল হারাইল; সে নীরবে কাতুর রোষসমুদ্রে গা ভাসাইয়া দিয়া পড়িয়া থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করিল। কাজ করে, খায়, আর সময়ে অসময়ে কাতুর অভিমান-তরঙ্গে হাবুডুবু খায়। এইভাবে ধীরে ধীরে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর একরূপ আপস হইল বটে কিন্তু বেয়ানের সঙ্গে বিরোধ ধীরে ধীরে বাড়িয়াই চলিল।

সম্মুখে জামাইষষ্ঠী, ললিতার মা ষষ্ঠী বাঁটার তত্ত্ব করিল, জামাইকে আনিতে চাহিল। কাতু দ্রব্য-সম্ভারের ডালা বাঁ হাতে ঠেলিয়া দিয়া কহিল—'মা গো, এই কি তত্ত্ব নাকি, এ যে মুটে মজুরেরও অধম, তারাও যে এর চেয়ে ভাল দেয়। আর ছেলে কোথা তার ঠিক নাই, আজ থেকে শ্বশুরবাড়ি কিসের?' মা গোপালকে পাঠাইল না বটে

কিন্তু গোপাল না গিয়া ছাড়িল না। মা তাহাকে সাজাইয়া গুছাইয়া ষষ্ঠীতলা লইয়া গিয়াছিল, সে বাড়ি ফিরিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে সুট করিয়া এক সুযোগে ললিতাদের বাড়ি গিয়া হাজির।

এমনি করিয়া দিন চলিতেছিল। বেয়ানে বেয়ানে ঝগড়া বাড়িয়া চলিলেও গোপাল ফাঁকে ফাঁকে শ্বশুর বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরিত। সুযোগ বুঝিলেই সুট করিয়া ঢুকিয়া শাশুড়ীর আদর যত্ন লইত, ললিতার সঙ্গে দু'দশটা কথা কহিয়া আসিত, ললিতা যখন মাঠে ঘাস কাটিতে যাইত তখন সে সন্ধানী বেড়ালের মত সেখানে গিয়া হাজির হইয়া ঘাস কাটিয়া দিত, মায়া যত্ন করিত—রোদের দিন গাছের ছায়ায় তাহাকে বসাইয়া নিজে ঘাস কাটিতে কাটিতে কহিত—'আহা ফরসা রং, রোদে তেতে যেন সিঁদুর বন্ন হয়েছে।' ললিতাও ন'বছরের মেয়েটি, বর কি বস্তু না বুঝিলেও সে যে লজ্জার লোক তাহা সে বুঝিয়াছে, সে রাঙা মুখ আরও রাঙা করিয়া বলিত—'যাঃ—।'

সেদিন হরি মোড়লের আর চাষ করা হইল না, তাহার শত উপদেশ, শিক্ষা, অগ্রাহ্য করিয়া রক্ষকহীন গরুগুলো ওই নিজের জমির বীজ ধানেই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া পড়িল; নিষেধও শুনে না, ধমকেরও তোয়াক্কা রাখে না, মানে শুধু এক পাঁচনী লাঠি। কিন্তু দেড় হাত লাঠিখানি দিয়া সে হেলে বলদ ঠেঙাইয়া চাষ করে, না গরু ফিরাইয়া বীজ বাঁচায়?

অগত্যা বেচারী আপনার গালিগালাজের ভাণ্ডার নিঃশেষে হতভাগা ছেলের উদ্দেশে বর্ষণ করিতে করিতে হাল খুলিয়া সেদিনের মত গরুর পাল লইয়া ঘরে ফিরিল।

ফিরিতেছিল গালিগুলা চর্বিতচর্বণ করিতে করিতে—'হারামজাদা বেটা-শালা-বেটা'। রাগের দাপে সম্বন্ধ-বিচার পর্যন্ত ছিল না।

সহসা পিছন হইতে কে হাঁকিল—'মোড়ল, ও মোড়ল।' মোড়ল অতি বিরক্তিভরেই আপন মনে ভ্যাংচাইয়া কহিল—'মোড়-ল, নো-ড়ল, কেরে আমার রোজগেরে পুত, আভাঙ্গা বর্ষার মাঠের মধ্যে ক্যাঁচর,

ক্যাচর মোড়ল মোড়ল—ই-দিকে মোড়লের কি হচ্ছে তার ঠিক নাই।'

পিছন হইতে আবার হাঁক আসিল—'মোড়ল, ও হরি মোড়-ল।'

অতি বিরক্তিভরে মোড়ল ফিরিয়া দেখে—দূরে জমির মাথায় দাঁড়াইয়া জমিদারের লগ্দী, চৌকিদার, আরও দুইজন লোক—একজন বোধহয় ঢুলি। মোড়লের আর ফেরা হইল না, সে গরু কয়টার হেফাজতে ভগবানকে নিযুক্ত করিয়া ফিরিল। যাইতে যাইতে বলিল—হে ঠাকুর, দেখো গরু কটা যেন খোয়াড়ে না যায়; কারু জমিতে লাগে ত সে যেন না দেখে—হে ভগবান!

সে লোক কয়টির কাছে যাইতেই লগ্দী বলিল—'আচ্ছা ভোগান ভোগালে মোড়ল, গোমস্তামশাই আদালতের পিয়াদাকে সঙ্গে দিয়ে বল্লে, যা মোড়লের বাঁশগাড়িটা সেরে দিয়ে আয়; নিজে আপনার ঘরে বসে বেশ হুঁকো টানছে; আর আমি তোমার বাড়ি গেলাম ত তোমার ছেলের পাত্তা পেলাম না, তারপর ই-মাঠ উ-মাঠ—এবার বাপু পাঁচসিকে—'

মোড়ল পাঁচসিকের গোড়া মারিয়া কহিল—'সে কথা আর বল কেন ভাই, এই দেখ না জমিতে হাল খুলে দিতে হল। হারামজাদা ছেলে গরুর পাল মাঠে ছেড়ে দিয়ে কোথা যে গেল। আজ যা মার দেবো—'

আদালতের পিয়াদা বলিল—'চল, চল—জমি দেখাবে চল, জলে বাতাসে জমে হিম হয়ে গেলাম।'

লগ্দী আপন কথাটা বলিয়া লইল—'বল্লাম যে—যা দাও তাতে এবার হবে না—'

মোড়ল পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল, কথার উত্তর দিল না। কিছু বলিয়া আবদ্ধ হইবার পাত্র সে নয়; যাইতে যাইতে লগ্দী আবার বলিল—'গোমস্তাকে ঘুষ দিয়ে এত করে বল্লাম—আহা, গরীব বিধবার জমিটুকু নিয়ে কি হল বল দেখি? জমি তো তোমার ঘরেই আসতো। তোমার ছেলেই পেতো।'

মোড়ল এবারও কথা কয় না। পেটে খাইতে পাইলে পিঠে সহিত

কিনা জানি না, কিন্তু কানে তাহার সব সহ্য হইত। বেয়ানের সহিত মনান্তরের সুযোগ লইয়া সে তাহার জমিটুকু গ্রাসের ব্যবস্থা করিয়াছিল ; কাত্যায়নী কোন কথা কহে নাই। গোমস্তা হরি মোড়লের বন্ধু। তাহাকে দিয়া নালিশ করাইয়া নীলামে সে ডাকিয়াছে,—আজ তাহার পূর্ণাহুতি, জমি দখলের দিন।

লগ্দীটাই আবার বলে—'তা বেশ হল, যে ক'বছর আগে এল তাই লাভ।'

মোড়ল নীরব, কিন্তু আদালতের পেয়াদা বলে—'আর নিজে বেটা জমিদারের লগ্দী যুধিষ্ঠিরের ধর্মবেটা।'

বাঁকের মুখে বাগানটা পার হইয়া বেয়ানের কয়খানা ক্ষেত ; ঐ বাঁকটা সদলে ঘুরিয়া জমিতে নিশান দিতে গিয়া মোড়লের আর কথা ফুটিল না ; সেখানে তখন মিলনের ধ্বজা উড়িতেছে। গোপাল ঘাসের বোঝাটা তখন ললিতার মাথায় তুলিয়া দিতেছে। লগ্দীটা হাসিয়াই আকুল, সে বলিল, 'আর বাঁশগাড়ির দরকার নাই মোড়ল, বাঁশগাড়ি তোমার ছেলেই গেড়েছে ;— যাও, বউ বেটা ঘরে তোল গিয়ে, কিন্তু ডিগ্রী তোমার বেয়ানের।'

বরকে দেখিয়া লজ্জা করিতে হয়, একথা চার বছর হইতে ললিতা শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। আজ এই নিভৃত মিলন, তার উপর স্বামীকে দিয়া ঘাস কাটানো—এই দারুণ লজ্জায় ন' বছরের বধূটি ঘাসের বোঝাটি স্বামীর মুখের উপরেই ফেলিয়া দিয়া ঘোমটা দীর্ঘ করিতে করিতে ছুটিল।

গোপালও কনের পিছু ধরিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল গোপাল ঠিক পিছু ধরে নাই, ললিতাকে পিছু ফেলিয়া ছুটিতেছে। আদালতের পিয়াদা কহে—'বাজা রে ঢোল বাজা—।'

ললিতা মাকে গিয়া বলিল—'আজ শ্বশুর লগ্দী চৌকিদার আর সব লোক সঙ্গে ধরতে এসেছিল, আমি সব ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছি—'

কথাটা চিত্তর বোধগম্য হইল না, সে প্রশ্ন করিল,—'ধরতে এসেছিল—কিরে, কাকে ?'

—'আমাদিগে।'

আরও বিস্মিত হইয়া চিত্ত বলিল—'আমাদিগে, কাকে—'

ললিতা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—'জানি না—যা—ঘাস কেটে দিচ্ছিল যে—'

আতঙ্কের মধ্যেও মায়ের মুখে পুলকিত হাসি ফুটিয়া উঠিল, হাসিয়া মা বলিল—'কে, গোপাল ?'

ললিতা আবার মুখ ঘুরাইয়া বলিল—'জানি না—যা, কতবার বলব ?'

বলিয়া সে লজ্জায় পলাইয়া গেল—গেল গোয়ালঘরে গোবর ফেলিতে; কিন্তু ফেলা তাহার হইল না, মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে পলাইয়া আসিল। মা তাহার জিজ্ঞাসা করিল—'কি-রে, কি ?'

মেয়ে মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়াই সারা—মা হাসির কারণ না পাইয়া বিরক্তিভরে বলিল—'মর্, হাসির মুখে আগুন, কথা নাই বার্তা নাই, হেসেই খুন ?'

মেয়ে এবার বহু কষ্টে হাসি সামলাইয়া গোয়ালঘরের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—'ওই গোয়ালঘরে।' সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি! মা এবার ধমক দিয়া বলিল—'আবার হাসি, নোড়া দিয়ে দাঁত ভেঙে দেবো। বল্, গোয়াল ঘরে কি ?'

মেয়ে এবার ঘরের বাহির হইয়া পলাইয়া গেল, যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—'নিজে গিয়ে দেখ না, আমি জানি না।'

ললিতার মা সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দেখিল, গোয়ালঘরের এক-কোণে বসিয়া গোপাল। সে আসিয়া শ্বশুরবাড়ির গোয়ালঘরে ঢুকিয়াছিল; বাড়ি যাইতেও সাহস হয় নাই, আর বাপের ব্যাপার দেখিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিতে লজ্জা করিয়াছিল; পিতার হৃদয়ের কুটিলতা তার বুকে বাসা না গাড়িলেও কুট পিতার পুত্র কুটিলতার অর্থ

কতক বুঝিতে পারিত ; বিশেষ আদালতের পিয়াদা, জমিদারের লগ্দী, চৌকিদার, আর লগির মাথায় লাল পতাকা দিয়া বাঁশগাড়ি সে বাপের কল্যাণে কতবার দেখিয়াছে। ললিতার মা অতি স্নেহে বেচারীর হাত ধরিয়া বলিল—'গোয়ালঘরে কেন বাবা, তুমি আমার সাত রাজার ধন মাণিক, ঘরদোর সবই যে তোমার ;—আ মরে যাই আমি, জলে মাথা টস্ টস্ করছে, কাপড় ভিজে, এস এস, কাপড় ছাড়বে এস।'

বলিয়া অঞ্চল্ দিয়া পরম স্নেহে গোপালের মাথা মুছিয়া দিল ; গোপাল কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিল—বাপের লজ্জায়, শাশুড়ীর ভাবী দুঃখে। চিত্ত ভাবিল বাপের চোখে আজ ধরা পড়িয়াছে বুঝি, তাই ভয়ে সে কাঁদিতেছে : সে বলিল—'ভয় কি, আমি তোমায় লুকিয়ে রাখবো, তোমার বাবা খুজেই পাবে না ;—না হয় নিজে গিয়ে ব্যাই-ব্যানের পায়ে ধরে ঘাট মেনে নোব।'

গোপাল এবার বলিল—'বাবা যে তোমার জমি দখল করে নিলে।'

বিধবার মাথার ভিতর যেন গোলমাল হইয়া গেল।

ওদিকে বাহির হইতে হাঁক আসিল—'মুনিব গো'—

ললিতা বলিল—'মা, ছবিলাল এসেছে।'

ছবিলাল ললিতাদের জমি ভাগে চষে, পুরানো অনুগত লোক। ছবিলাল ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া বলিল—'হরি মোড়ল কি কম ঝানু, তখুনি বলেছিলাম—ওগো মুনিব ঠাকরুন, এ কাজ করো না, কাঁটা গাছে কোল দিয়ো না, হরি মোড়লের ঘরে বিয়ে দিও না, তা তখন শুনলেন না, গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে গো।'

ললিতার মার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না—সর্বস্ব-হারা বিধবা শক্তি হারাইয়া গোয়ালঘরের চালাতেই বসিয়া পড়িল। চোখ দিয়া কেবল জল পড়িতে লাগিল।

গোয়ালের বন্দী গোপালেরও কান্না আসিল ; বাপের নিন্দা, তাও বুকে কাঁটার মত বেঁধে, চোখে জল আসে, আর ওই সর্বহারা স্নেহময়ী বিধবার দুঃখ—সেও বুকে বাজে ; বেচারীর দম বন্ধ হইয়া আসিতে

লাগিল ; স্বস্তির আশায় এখান হইতে তাহার পলাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল কিন্তু ওই কর্কশভাষী ছবিলালকে ভয় করে। সিক্তদেহেও তার ঘাম ঝরিতে লাগিল। ছবিলাল আবার বলিল—'কাঁদলে আর কি হবে বল, মামলা-ফামলা কর, না হয় ব্যাই-ব্যানের হাতে পায়ে ধর, তাও যে সে শুনবে তা তো মনে লাগে না আমার। সে হরি মোড়ল—অজগর সাপ গিলতেই জানে, ওগ্‌লাতে জানে না।'

গোপাল আর থাকিতে পারে না, সে চুপি চুপি বাহিরে আসিয়া পলাইতে চাহিল, কিন্তু ছবিলালের নজর এড়াইতে পারিল না। তাহাকে দেখিয়া ছবিলাল তিক্তকণ্ঠে বলিল—'এই যে, ছেলেকে সব খবর নিতে পাঠিয়েছে ; জামাই বলে বিশ্বাস করো না মুনিব, ও সাপের বাচ্ছা সাপ।' গোপাল ফিরিয়া একবার শাশুড়ীর দিকে চাহিল ; ললিতার মা কেবল কাঁদে, কথা বলে না ; সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল— ছবিলালের কথাগুলো তার কানে গেল—কিন্তু মনে গেল না। গোপাল আর না দাঁড়াইয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

ওঘরের দাওয়ায় বসিয়া ললিতা কাঁদিতেছিল, কেন কাঁদিতেছিল সে-ই জানে। চিত্ত ভাবিল আমার কান্নায় কাঁদিতেছে। ছবিলালও ভাবিল তাই ; সে বলিল—'তুমি কাঁদছ কেন দিদি, তোমার লক্ষ্মী তোমারই আছে।' ললিতা বিরক্তিভরে বলিল -'বেশ, বেশ, তোমাকে আর কর্তাতি করতে হবে না, যাও।'

চিত্ত বলিল—'তাই এখন যাও ছবিলাল, বিহিত যা হয় করবো বৈকি, না হয় শক্ত লোককে বিনি পয়সায় লিখে দেবো। তা বলে কি ওই চামারকে ঠকিয়ে খেতে দেবো ?'

ছবিলাল উঠিয়া গেল।

মা চোখ মুছিয়া, মেয়েকে বুকে টানিয়া লইয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল —'তা তুই কাঁদছিস কেন মা, আমার হাড় কখানা থাকতে তোর কষ্ট—'

মেয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া অভিমানভরে বলিল—'ছবিদাদা ওকে কেন বকলে—তাড়িয়ে দিলে ? ও কি করবে !'

মায়ের বুকও বেদনায় টন্‌টন্‌ করে, মনে পড়ে গোপালের চোখের সেই স্নেহ-ভিক্ষু কাতর দৃষ্টি ; চিত্ত বলিল—'কাল সকালেই গোপালকে ডেকে আনবি। বেশ—আমি ছবিলালকে বকবো।' ডাকিয়া আনার প্রস্তাবে ললিতা চোখ মুছিতে মুছিতে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল—'বেশ।'

চিত্ত মেয়েকে বুকে করিয়া সজল মেঘম্লান আকাশের দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিল, তাহার কোন অর্থ নাই, কোন ধারা নাই, ওই কুণ্ডলী-আকৃতি মেঘমালার মতই এলোমেলো।

সহসা একটা ঝড় আসিয়া ঐ মেঘমালাকে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। সন্ধ্যার মুখে গোপালের মা ঝড়ের মত আসিয়া বলিল—'বের কর বলছি—আমার ছেলে বের কর।' ললিতার মা কিছু বুঝিতে পারিল না, বিহ্বলের মত তাহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল। কাত্যায়নী বলিল—'চেয়ে আছে দেখ, যেন কিছুই জানে না।'

কাতুর সঙ্গে সঙ্গে মোড়লও আসিয়াছিল, সে বলিল—'কেন একটা হ্যাঙ্গামা করবে ব্যান, থানা পুলিশ—সে অনেক হ্যাঙ্গাম, তার চেয়ে দাও, গোপালকে ফিরিয়ে দাও।'

কাতু কত কথাই বলিয়া গেল—'ও আমার ছেলেকে গুণ করেছে ; বলি লজ্জা করে না, শাশুড়ী হয়ে জামাইকে গুণ করতে ?'

মোড়ল আপন মনেই বিনা অনুমতিতে সমস্ত ঘর খানাতল্লাস করিয়া বেড়াইল, শেষে বিফল হইয়া বলিল—'ব্যান, সত্যি কথা বল, আমার গোপালকে কিছু কর নাই ত ?'

কাত্যায়নী কাঁদিয়া উঠিল—'ওরে গোপাল রে—গোপালকে আমার খুন করেছে রে।'

ললিতার মা এবার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বেশ ধীরভাবেই বলিল—'নিজে মা হয়ে, সন্তানের মাকে যে অপবাদ তুমি দিলে, তা যদি সত্যি হয়, তবে ভগবান যেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত করেন ; আমার ওই একমাত্র মেয়ে—তারও মাথায় করেন। তোমার ছেলে আমার বাড়িতে এসেছিল, সে দুপুর বেলাতেই চলে গিয়েছে, আমি

তাকে জানি না, জানি না, জানি না। এতেও না মান, ললিতার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করছি, আমি জানি না। তাও না মান, যা খুশি হয় তোমাদের কর গিয়ে। থানা, পুলিশ যা ইচ্ছে—কিন্তু আমার ঘরে দাঁড়িয়ে নয়—যাও, আপনার বাড়ি গিয়ে—

মোড়ল বলিল—'ব্যান, জোতের সামিল বাড়ি, তোমার জোতের সঙ্গে নিলেম হয়ে গিয়েছে, আমি ডেকেছি, বাড়ি এখন আমার।'

ললিতার মা এক মুহূর্তে ললিতার হাত ধরিয়া দুয়ারের দিকে পথ ধরিয়া বলিল—'তোমার বাড়ি তোমাদের থাক, আমার গোপাল ভোগ করবে। আমি চল্লাম।'

অন্ধকার রাত্রি, অন্ধকার পথ।

ললিতা কাঁদিয়া উঠিল, চিত্ত অভয় দিয়া বলিল—'ভয় কি মা, মা বসুমতী আছেন বুক পেতে, মাথার উপরে আছেন ভগবান্।'

কাতু হাঁকিয়া কহিল—'আমার গোপাল কোথায় আছে বলে যা।'

চিত্ত বাহির হইতেই বলিল—'খোঁজ কর পাবে, আমি জানি না। তবে সে ভালই আছে, আমার মন বলছে সে ভালই আছে।'

মোড়ল বলিল—'কিন্তু সম্বন্ধের এই শেষ, তোমার মেয়ের ভাতের আশা তুমি ত্যাগ কর।'

দরজার মুখে দাঁড়াইয়া অন্ধকারের মধ্যেই ললিতার মা হাসিল। সে হাসি সমস্ত না হারাইলে মানুষ হাসিতে পারে না, হাসিয়া বলিল—'ভাতের ভয় দেখিয়ো না মোড়ল, আমার গোবিন্দ আছেন, তাঁরই পায়ে মেয়েকে ফেলে দিয়ে যাবো।'

শ্রাবণের বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রি, পিচ্ছিল পথ, বিদ্যুতের ঘন লেলিহান প্রকাশ, বজ্রের গর্জন—তাহারই মধ্যে স্থান মান হারাইয়া নিঃসম্বল বিধবা কন্যার হাত ধরিয়া 'গোবিন্দ' বলিয়া কোথায় যাত্রা করিল।

ললিতার মার কথাই সত্য হইল, গোপালকে পাওয়া গেল, সে প্রায় মাস দেড়েক পর। সাত আট ক্রোশ দক্ষিণে চন্দনকাঠি গ্রামের নাম-করা কীর্তনীয়া প্রেমসুন্দর বাবাজীর কীর্তনের দলে ভর্তি হইয়া সে

গান গাহিয়া ফিরিতেছিল। বাবাজীকে বলিয়াছিল—সে অনাথ। বাবাজী দয়া করিয়া তাহাকে বাড়িতেই রাখিয়াছিল, গান শিখাইত; আসরে গানের সময় বাবাজীর আদেশমত দু'একখানা তালিম দেওয়া গান সে একাই গাহিত।

কৈশোরের সতেজ মধুর কণ্ঠ, উচ্চতর গ্রামে কণ্ঠের স্বভাব-সুন্দর হিল্লোলিত কম্পন, আর কিশোর নায়ক-নায়িকার আবেদন নিবেদন—অলকা তিলকা পরা একটি শ্যাম কিশোরের মুখে—লোকের বড় ভাল লাগিত।

গ্রামের একজন কুটুম্ব-বাড়িতে প্রেমসুন্দর বাবাজীর কীর্তন শুনিতে গিয়া গোপালের সন্ধান আনিয়া দিল। হরি মোড়ল তাঁহার সহিত দেখা করিলে প্রেমসুন্দর বাবাজী হরিচরণকে বলিল—'তোমার সন্তান নিয়ে যাও ভাই। নিয়ে যাবে বৈকি, গোপাল নইলে আঙিনা মানাবে কেন? তবে তোমার ছেলেকে দল ছাড়িয়ো না, ওর মূলধন আছে, ওর হবে।'

মোড়ল বিচক্ষণ ব্যক্তি; সে তাক বুঝিয়া বেশ বিনয় করিয়া বলিল—'দেখুন দেখি, আপনার আশ্রয়ে থাকবে, সে ত ওর ভাগ্যের কথা। তবে কি জানেন, গরীব লোক আমরা, দুটো বাছুর আছে, আমরা কি মান্দের রেখে—হেঁ হেঁ।'

বাবাজী ব্যস্ত হইয়া বলিল—'সে আমি তোমায় পুষিয়ে দেবো—তা না দিলে হবে কেন? যেদিন গাওনা হবে প্রত্যেক দিন আমি এক টাকা করে দেবো, আর আসরে নিজে গান গেয়ে যা পাবে তারও পাবে বারো আনা, দলে নোব চার আনা। ছ আনা দশ আনা ভাগ নিয়ম।'

বাপের সঙ্গে গোপাল ফিরিয়া আসিল, কপালে তিলক, গলায় মালা, স্বভাবেরও কত পরিবর্তন, মৃদু ধীর, মুখে মিষ্টি হাসি।

ঘরে পা দিতেই মা কোলে করিয়া বলিল—'একটি কথা সত্যি করে বলবি বাবা?'

গোপাল বলিল—'কি?'

'তোর শাশুড়ী তোকে পালিয়ে যেতে বলেছিল, নয়?'

—'না।'

—তবে গেলি কেন?'

গোপাল চুপ করিয়া থাকিল—উত্তর দিল না। মা বলিল—'শাশুড়ী বলেছিল—নয়?' গোপাল আর উত্তর দেয় না—কাতুর সন্দেহ গাঢ়তর হইয়া উঠে, আক্রোশ বাড়ে। সে বলে—'এই আঘনেই তোর বিয়ে দেবো আমি।' গোপাল চুপ করিয়া থাকে। মা ছেলের মনের কথা বোঝে, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া মুখ মুছাইয়া বলে—'ললিতার চেয়ে ঢের ভাল সুন্দর দেখে বিয়ে দেবো; শ্বশুর, শাশুড়ী দেখবি কত আদর যত্ন করবে। আর কাটির মত শুকনো এককড়ি মেয়ে তার তরে আবার দুঃখ কিসের? বলে—বেঁচে থাকুক চূড়া বাঁশী—রাই হেন কত মিলবে দাসী?'

কিন্তু বাঁশী যে রাধা ছাড়া আর কিছুই জানে না, বলে না; গোপাল সন্ধ্যার মুখে ললিতাদের বাড়ি গিয়া হাজির হইল।

শূন্য পুরী, দুয়ারগুলো কে ছাড়াইয়া লইয়াছে, দ্বারহীন দ্বারপথে দেখা যায় শুধু পুঞ্জিত অন্ধকার। দীর্ঘশ্বাসের মত বাতাস হা হা করিয়া ফিরিতেছে।

গোপাল কিছু বুঝিতে পারিল না। সে এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া ফিরিল, কেহ কোথাও নাই; মানুষের বসবাসের কোন চিহ্ন নাই; শুধু বড় ঘরের দাওয়ায় একটা বিপর্যস্ত খেলাঘর, ভাঙা খোলা, বালির ভাত, শুকনো ঘাসের তরকারি, একপাশে ইঁট দিয়া ঘেরা খেলার শয়নঘরে কাপড়ের টুকরা দিয়া সাজানো দুইটি পুতুল—গোপালের মেয়ে, ললিতার ছেলে। গোপাল বসিয়া সে দুইটি নাড়িল চাড়িল, শেষে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া আসিল। বাহির হইবার সময় কয়েক ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়া পড়িল।

কাত্যায়নী ছেলের বিবাহ দিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। কিন্তু সম্বন্ধ আসিলেই ছেলের বাপে মায়ে বিরোধ বাঁধিয়া যায়।

বাপ বলে—'আমার জোতজমা, ধানচাল, তেজারতি, রোজগেরে ছেলে, আমি সম্মান নেবো না?'

কাত্যায়নী বলে—'আমার অভাব কিসের? কারু ধারি না, বরং লোকে দশ টাকা ধারে, আমার পাঁচ মরাই ধান—তিরিশ বিঘে জমি, ছেলে রোজগার করে, আমার টাকার দরকার কি? আমি চাই লাল টুকটুকে মেয়ে, এতটুকু বড় সড়। ছেলে আমার মুখ নামিয়ে থাকবে, সে হবে না। মেয়ে আমি নিজে দেখব, তবে বিয়ে দোব।'

মা, চায় রূপ, বাপ চায় রৌপ্য; অথচ দুটার সমন্বয় কোন ক্ষেত্রেই হয় না। কাজেই পাত্রীপক্ষ ফিরিয়া যায়। কোনটা ফিরায় বাপ, বেশীর ভাগ ফিরায় মা। যদি কোথাও রূপ রৌপ্য দুই মেলে তবে গোপালের মার পাত্রী কিছুতেই পছন্দ হয় না—কোন মেয়েকেই ললিতার চেয়ে সুন্দর বলিয়া তাহার মনে হয় না।

এদিকে কার্তিক মাস পড়িতেই গোপাল চলিয়া গেল কীর্তনের দলের সঙ্গে। সংসারে প্রথম প্রবেশমুখে প্রেমেন্দ্রসুন্দর বাবাজী স্ত্রী, দুটি সন্তান সব একদিনের কলেরায় হারাইয়াছিল। আজ এই সর্ববন্ধনশূন্য প্রিয়দর্শন কিশোরটিকে কাছে পাইয়া বৈরাগীর ক্ষুধাতুর অন্তর যেন কৃতার্থ হইয়া গেল; আজীবন সঞ্চিত স্নেহধারা নিঃশেষে ঢালিয়া দিল। সে গোপালকে সন্তানের মত স্নেহ করে, শিষ্যের মত শিক্ষা দেয়, এক সেঙ্গখায়, কাছে লইয়া শোয়, মায়ের মত মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, বাতাস করে। সরল পল্লীবাসী বৃদ্ধ অন্তরের প্রেমভক্তি ঢালিয়া ব্রজের কথা, ব্রজের গাথা, ব্রজের কাহিনী বলে, সে গাথা গোপালের বুক চিরিয়া বসে, বলিতে বলিতে বক্তাও কাঁদে, শ্রোতাও কাঁদে—সেই ভাবাবেশের মধ্যে বাবাজী গোপালকে গান শিক্ষা দেয়; ভাবরুদ্ধ কিশোর-কণ্ঠে গান কাঁদিয়া ফেরে—'এ মাহ ভাদর—এ ভরা বাদর, শূন্য মন্দির মোর।'

মানুষ ভাবে এক কিন্তু বিধাতার বিদ্রূপে হয় আর এক। কাতুর সাধ ছিল ছেলের বিবাহ দিয়া বৌ লইয়া ঘর করিবে, সাধ মিটাইবে, লোকের কাছে তার যে বৌ-কাঁটকী অপবাদ রটিয়াছে, তার পাল্টা জবাব সে দিবে, সাধ আহ্লাদ মিটাইবে!

কিন্তু বিধাতা বিরূপ! সাত দিনের প্রবল জ্বরে কাতুকে সুখের সংসার ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতে হইল। হরি মোড়ল হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া কাতুর রোগ-শীর্ণ মুখখানি ভাসাইয়া দিল। কাতু বলিল—'ছিঃ, বেটাছেলে তুমি কেঁদো না, আমার দুঃখ কি—তোমার আশীর্বাদে আমার মত যেতে পারে কজন? কিন্তু দেখো, যেন আর বিয়ে করো না! তুমি আমার, তাতে পরের ভাগ—এ যে আমি ভাবতেও পারি না গো।'

হরি মোড়ল কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—'কখনো আমায় বিশ্বাস করনি, আজ আমায় বিশ্বাস কর!'

কাতুও চোখের জল ফেলিয়া বলিল—'ছিঃ, তুমি ঠাট্টাও বোঝ না, যাবার সময় দুটো ঠাট্টা করে যাই!' কাতুর এমন পূর্ণ সন্তোষ, এত শান্ত, এত স্নিগ্ধ চাহনি মোড়ল কখনও দেখে নাই। সজল চোখে মোড়ল কাতুর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। থাকিতে থাকিতে কাতু বলিল—'গোপালের আমার ভাল দেখে বিয়ে দিয়ো। তার সঙ্গে দেখা হল না—আঃ।' সব নীরব—মোড়ল শুধু কাঁদিতেছিল।

সহসা কাতুর চিৎকার—'ওগো তোমাকে যে দেখতে পাচ্ছি না—গো।' ক্ষীণ অন্তর্ভেদী আর্তনাদ।

কাতুর মৃত্যুতে যে আঘাতটি হরিচরণের বুকে বাজিল তাহাতে বিচক্ষণ বিষয়ী লোকটি আর একটি মানুষ হইয়া গেল। তাহার মধ্যে কোন্ উদাসীন যেন ঘুমাইয়া ছিল—সে জাগিয়া উঠিল। সে চাষ ছাড়িল, জোতজমা ভাগে দিল, খাতককে সুদ ছাড়িল, নীলাম সম্পত্তি ডাকা ছাড়িল, তুলসীর মালা ধরিল, সন্ধ্যায় গোপালকে কাছে বসাইয়া বলিত—'বাবা, একখানা গান গাও।'

গোপাল গাহিত, গান শেষ করিলে প্রায়ই সে বলিত—সেই গানখানি বেশ, 'সুখের লাগিয়া'। গোপাল আবার গাহিত 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।' মোড়লের চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িত, সে চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিত—'হ্যাঁ, গান বটে বাপু, চোখের জল টেনে বার করে।'

গ্রামের গোমস্তা মোড়লের সুখের লোক, সে একদিন মোড়লকে

ডাকিয়া কহিল—'মোড়ল, একটা নিলাম আছে ভাল, জলের দামে হবে বুঝেছ?'

হরি মোড়ল হাসিয়া বলিল—'না দাদা, আর দরকার নেই, চোখের জলের দাম বুঝেছি।' হরি চলিয়া গেলে গোমস্তা অপর সকলকে বলিল—'মোড়ল আর বেশী দিন নয়।'

লগদীরা বলিল—'আজ্ঞে না, এখনও ডাঁটো কেমন, আর বয়েসই বা কি?' গোমস্তা বলিল,—'ওরে বেটা, মা গঙ্গা মড়া আনে কখন জানিস, যখন শেয়াল কুকুরে হেঁটে পার হয়। মোড়লের যখন বিষয়ে অরুচি তখন আর বেশী দিন নয়।'

গোমস্তার কথাটাই ফলিয়া গেল, ছয় মাসের মধ্যে চল্লিশ বছরের জোয়ান, গায়ে অসুরের শক্তি, পাথরের মত চওড়া বুক, সে হইয়া গেল ষাট বৎসরের বৃদ্ধ। শুভ্র কেশ, রেখাঙ্কিত মুখ, হাড় মোটা ভারী দেহখানা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—যেন দেহভার আর বহিতে পারে না। যেন হঠাৎ ভূমিকম্পে ফাট-ধরা বিরাট দেউল।

লোকে বলে—'আহা, পরিবারের শোকটা বড় লেগেছে।'

বন্ধুরা বলে—'কে জানে বাবা, এত ভালবাসা? ইদিকে নজরও বেশ খর ছিল।' সত্যই হরিচরণ জানিত না সে কাতুকে এত ভালবাসিত; কাতুও হয়তো জানিত না। এই জীর্ণ দেহে আট মাসের মধ্যে মোড়ল চলিয়া গেল। গোপাল রুগ্ন পিতার শয্যাপার্শ্বে অবিরাম বসিয়া সেবা করিত, ওষুধ মাড়িয়া বলিত—'বাবা, ওষুধ।'

—'আঃ, আর ওষুধ নয় বাবা, এখন দুটো নাম শোনাও—তোমার মিষ্টি গলার নাম—'

গোপাল কাঁদিতেছে দেখিয়া মোড়ল তাহার দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহে—'কাঁদছ, তবে দাও ওষুধ।' কতদিন আবার সান্ত্বনা দিয়া বলিল—'ওরে ক্ষেপা ছেলে, তোকে পরখ করছিলাম, দেখছিলাম তুই আমাকে কত ভালবাসিস। দে, দে, ওষুধ দে।' সহসা একদিন অসুখ বাড়িয়া উঠিল। সে যেন বিভ্রান্ত, গোপালের দিকে চায় নাই, গোবিন্দের নাম করে নাই, সে নাম শুনিতেও চায় নাই; শুধু বুলি ধরিয়াছিল—'এলে এলে, কাতু এলে? যাই—যাই কাতু—কাতু।' শুধু ঐ 'কাতু' 'কাতু' 'কাতু' করিতে করিতেই মোড়ল চলিয়া গেল।

চৌদ্দ বছরের গোপাল সর্ব-আশ্রয়চ্যুত হইয়া বিধাতার দেওয়া ওই পরম আত্মীয়টি, ওই প্রেমসুন্দর বাবাজীকেই আঁকড়াইয়া ধরিল। বাবাজীও পরম স্নেহে তাহাকে বুকে টানিয়া লইল ; শুধু টানিয়া লইল না, মৃগ-মায়াচ্ছন্ন ভরতের মত বৈরাগী গোপালের মায়ায় বিষয়-বিষের নেশায় বিভোর হইয়া উঠিল।

বাবাজী এখন গোপালের ঘরে আসিয়া গোপালের দেনা পাওনা দেখে, ধানের হিসাব করে—নানা রকম বে-হিসাবী কষাকষি করে ; কৃষাণ আসিয়া কাস্তের দাম চাহে—'ধান কাটতে কাস্তে চাই, ছআনা করে দাম চাই।'

বাবাজী রাগিয়া আগুন—'বটে, ধান কাটবি তোরা, আর দাম দেবো আমি ? বটে রে, আমাকে ঠকিয়ে নেবার মতলব।'

কৃষাণ বেচারী কিছুতেই বুঝাইতে না পারিয়া মধ্যস্থ মানে ; মধ্যস্থ বলিল—'হ্যাঁ বাবাজী তাই নিয়ম, তোমাকেই কাস্তের দাম দিতে হবে।'

বাবাজী বলিল—'ও অন্যায় নিয়ম, ধান কাটবে ও, আর দাম দেবো আমি ? বাঃ, ঘোল খাবেন শম্ভুনাথ আর কড়ি গুণবেন কেষ্ট দাস।'

নিজেও এখন কাহাকে কখন টাকা দেয়, তাহা আর দেওয়ালের গায়ে খোলায় দাগ লেখা থাকে না—একটি লাল খেরুয়া কাপড়ের মলাট দেওয়া পাকা খাতায় কালির আখরে লেখা হয়—তবে জমা-খরচের ঘরে গোলমাল হয়, ডাইনে জমা—বাঁয়ে খরচ হইয়া যায়।

খাতক খাতা দেখিয়া বলে—'পাওনা যে আমারই বাবাজী।'

বাবাজী তাড়াতাড়ি খাতাখানা উল্টাইয়া বলে—'কেন, কেন—হিসেবে ভুল হয়েছে নাকি, তা তুমি ধর্ম চেয়ে বল কেন, ধর্ম চেয়ে বল কেন ?'

বাবাজী গোপনে ও-পাড়ার যোগী সরকারকে ডাকিয়া জমাখরচের ধারা শেখে। পাকা খাতাটারই এক জায়গায় লিখিয়া রাখে, বাঁয়ে জমা ডাইনে খরচ; সেটা মনে মনে মুখস্থ করে। রাত্রে প্রদীপ জ্বালিয়া সে জমা খরচ খাতায়, টাকার অঙ্কের পুষ্টি দেখিয়া তুষ্টি বাড়ে, মৃদু হাসিয়া ঘুমন্ত গোপালের কিশোর মুখখানির দিকে গভীর স্নেহে তাকাইয়া থাকে।

দেখিতে দেখিতে বছর কাটিয়া যায়, দলের পাঁচজনে বলে—'মূল

গায়েন, এবার গোপালের বিয়ে দেন।'

—'হ্যাঁ, বিয়ে দিতে হবে বৈকি। এই আর বছর খানেক যাক, দেখি যদি প্রথম বৌমার খোঁজ পাওয়া যায়, আর ততদিন হতে না হতে গলাখানাও দাঁড়িয়ে যাবে।'

রামপদ একটি সম্বন্ধ আনিয়াছিল, সে বলিল—'ওর মা তো আবার বিয়ে দিতেই বলে গিয়েছে, সে বৌকে ত একরকম ত্যাগই করে গিয়েছে তারা।'

বাবাজী জিব কাটিয়া বলিল—'রাধে, রাধে, তা কি হয়, রামপদ? গোপালের মায়ের যে নিষেধ সে হল অভিমান, সখীর উপর সখীর অভিমান—ওর অর্থ কি আমরা করতে পারি? ও অভিমানের অর্থ, এই অভিমানী দুটি জন ছাড়া কেউ করতে পারে না, রামপদ।'

গোপাল ঘরে বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, বহুদিন পরে আজ তাহার উজ্জ্বলভাবে ললিতাকে মনে পড়িল। বিপদে সম্পদে গানের মধ্যে দিন কাটিতে কাটিতে ললিতার সেই ছোট ছবিখানি সে ভুলিতেছিল; আজ বাবাজীর কথায় তাহাকে মনে পড়িয়া গেল। একটা অদৃশ্য ছবি কোথা হইতে কেমন করিয়া জাগে তাহার মনে কে জানে—তাহার মনে ফুটিয়া উঠিল যেন ললিতাদের সেই দ্বারশূন্য দ্বারদেশে অন্ধকার ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল ম্লানমুখী ললিতা!

রাত্রে বাবাজী গোপালকে জিজ্ঞাসা করিল—'গোপাল—'

—'বলুন।'

—'একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো বাবা, বেশ ভেবে চিন্তে উত্তর দিয়ো।' গোপাল চুপ করিয়া থাকে প্রশ্ন শুনিবার প্রত্যাশায়। বাবাজী বলিল—'তোমার মত না নিয়ে ত আমি কিছু করতে পারি না।'

—'কি বলুন।'

—'লোকে বলছে, ললিতা-মাকে গ্রহণ করতে নাকি তোমার মায়ের নিষেধ আছে।' বাবাজী উত্তরের অপেক্ষা করিয়া রহিল, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া বাবাজী আবার বলিল—'তোমার সংসার পাতবার সময় হয়েছে, এখন কি করবো আমি? নতুন সম্বন্ধ দেখব কি?'

এবারও কোন উত্তর আসিল না।

—'না ললিতা-মায়ের সন্ধান করবো বল।'

গোপাল যেন নড়িল চড়িল, কিন্তু উত্তর দিতে পারিল না; অগত্যাই বাবাজী কথাটা চাপা দিয়া আপন মনেই হিসাব করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—গোপালের অভিপ্রায় কি। বাবাজী ভাবিল—বালক-বালিকার বন্ধন, কোমল মালার ডোর, দীর্ঘ দিনে জীর্ণ হইয়া খুলিয়া গিয়াছে, খেলাঘরের স্মৃতি খেলাঘরের ধূলায় চাপা পড়িয়াছে, ক্ষুদ্র বালিকার ধূলি-ধূসর ছবি আজ আর ঐ কিশোরকে ভুলাইবে কি দিয়া? তবে তাহাই হোক। কিন্তু সে বালিকা—আহা! ও দিকে গোপালের ঘুমন্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল, জড়িতকণ্ঠে কি বলিল বুঝা গেল না, সদ্য-মনে-পড়া ললিতা আজ স্বপ্নেও দেখা দিয়া গেল। বাবাজী ডাকিল, 'গোপাল! গোপাল!'

গোপাল উঠিয়া বসিল, বাবাজী প্রশ্ন করিল—'স্বপ্ন দেখছিলে?' গোপাল স্বপ্নের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া লজ্জায় ললিতার কথা বলিতে পারিল না, চুপ করিয়া থাকিল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া গোপাল বাবাজীর অপেক্ষায় সম্মুখের আঙিনায় আসিয়া আপন মনে মাটিতে কাঠি দিয়া দাগ কাটিতেছিল। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বাবাজী ফিরিয়া আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—'আজ একবার বাড়ি যাব।'

বাবাজী তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল—'বাড়ি যাবে?—এই বর্ষায়—'

—'বাড়ি যেতে মন হচ্ছে, আর চাষ আবাদের সময় একবার যাই।'

—'যাও, তবে বেশী দিন থেকো না।'

'দিন পাঁচ ছয় হবে' বলিয়া গোপাল চলিতে আরম্ভ করে; বাবাজী বলে—'দাঁড়াও, যাবে সেখানে, টাকাকড়ি কিছু নিয়ে যাও।' চারিটি টাকা আনিয়া বাবাজী গোপালের হাতে দিল, সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়িল গোপালের কাপড়ের পোঁটলাটা মস্ত বড় হইয়া পড়িয়াছে, হাত বাড়াইয়া বাবাজী বলিল—'দাও, কাপড়গুলো গুছিয়ে বেঁধে দি। এ যে একটা বস্তা হয়ে পড়েছে।'

গোপালের হাত হইতে পোঁটলাটা লইয়া খুলিয়া দেখিল, না, গুছাইয়া দিবার কিছুই নাই, তবে কাপড়ের সংখ্যাধিক্যে আকার বড় হইয়া পড়িয়াছে। ভাল জামাটি, মিহি ধুতি, আয়না, চিরুনি, সাবান—

গরদের চাদরখানি পর্যন্ত, তাছাড়া আটপৌরে কাপড় কখানা।

গোপাল চলিয়া গেল, বাবাজী মাটির পানে চাহিয়া ভাবিল: কত কি;—হয়ত আর আসিবে না, হয়ত রাগ করিয়াছে, অকস্মাৎ অন্যমনস্ক চোখের দৃষ্টিতে ভাসিয়া গেল গোপালের আঁকা কত রেখা, লেখা, কত কি—তাহারই মাঝে লেখা—কয়েকবার সযত্নে লেখা, ললিতা, ললিতা। বাবাজীর চিন্তা ঘুচিয়া গেল; সহসা সে আপন মনে গুনগুন করিয়া গান ধরে—

'পিরীতি বলিয়া তিনটি আখর ভুবনে সৃজিল কে।'

গোপাল গেল ললিতার সন্ধানে ললিতার মামার বাড়ি। ললিতার মামা কহিল—'হ্যাঁ, তা এসেছিল বটে, তা সেই দিনই তো চলে গিয়েছে; তারপরে সেইদিন রাত্রে না বলে কয়ে কোথা যে গেল, কি করে জানবো বল? তা বসে জল খাও।'

গোপাল হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল—বড় আশা করিয়া সে আসিয়াছিল।

বাড়ির ভিতর গিয়া মামাশ্বশুর বলিল—'ওগো শুনছ, ভাগিন জামাই —ললিতের বর গো, এসেছে—এদের খোঁজে, তা জল খেতে দাও দেখি।'

ললিতার মামী বলিল—নারীকণ্ঠ হইলে কি হয়, সরমে নরম কি নিম্ন নয়, বেশ সতেজ সুস্পষ্ট—'কে?—কে এসেছে? সেই চামারের বাচ্চা? কেন? কি মনে করে, তার ত কিছু নাই আর—আবার খোঁজ কেন? এবার ধরে জেলে দেবে না কি?'

ললিতার মামা মামীর মত এত তেজস্বী নয়, তাহার একটু লজ্জা হইল, সে চাপা গলায় বলিল—'চুপ কর, চুপ কর, হাজার হোক কুটুম্বের ছেলে।' উত্তরে ঝঙ্কার উঠিল—'কুটুম তা হয়েছে কি? মাথা কিনে রেখেছে না কি? খাতির কিসের, আমি বলে গুরুর খাতির করি না, ষোল আনা বলে যাই—তা কুটুম কুটুম আছে, আপনার ঘরে আছে।'

—'নিজের ঘরের মানুষ কি কুটুম্ব হয়, পরের ঘরের মানুষই কুটুম্ব হয়।'

—'যাও যাও—বকো না বেশি, যাও দু পয়সার বাতাসা কিনে আন—যাও, এই দুয়ারে যাও।'

বাহিরে বসিয়া গোপাল সবই শুনিল। মামী শ্বাশুড়ীর কথায় তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

সে আর বাতাসার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে পারিল না, বেচারী জুতা জোড়াটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল।

তাই বলিয়া ওইখানেই ললিতার সন্ধান সে শেষ করিল না, কোথায় ললিতার মাসীর বাড়ি, কোথায় পিসির বাড়ি, এমন কি ললিতার মায়ের মামার বাড়ি পর্যন্ত খোঁজ করিল, কিন্তু ললিতার সন্ধান মিলিল না। শেষে মাস দেড়েক পরে ম্লানমুখে একদিন আসিয়া বাবাজীর সদা-প্রসারিত উদার স্নেহময় বক্ষে ফিরিয়া ক্লান্তি ও হতাশায় এলাইয়া পড়িল।

বাবাজী সব সন্ধান রাখিত। ইহারই মধ্যে সে কয়বার লোক মারফৎ গোপালকে টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে, তাহার কুশলবার্তা লইয়াছে, আজ সে গোপালকে বুকে লইয়া সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—'দুঃখ করো না; এই মাসেই তোমার আবার বিয়ে দেবো আমি।'

আজ আর গোপালের মুখ লজ্জায় বন্ধ রহিল না, সে বলিল—না, বিয়ে আর করবো না আমি।'

সে স্বর লজ্জায় দুর্বল নয়, অভিমানে উচ্ছ্বসিত নয়, রোষে দীপ্ত নয় — সহজ সরল, সবল দৃঢ়; বাবাজী তাহার মুখপানে চাহিয়া পরম স্নেহে সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিল কোন প্রতিবাদ করিল না। তাহার চোখ সজল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যায় নিজে খোল ধরিয়া কহিল—'গাও তো বাবা,—বঁধু কি আর কহিব আমি।'

গোপাল গাহিল—'জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণ-বঁধু হয়ো তুমি।' গানে সে ডুবিয়া গেল, শুধু সেই দিন সন্ধ্যার সময় নয়— তারপর হইতে বরাবর।

দীর্ঘ চারি বৎসর পর—

গোপালের অদৃষ্টে স্নেহের নীড় স্থায়ী হয় না, একটা আকস্মিক ঝড়ে উড়িয়া যায়। বাবাজীও ইহার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। আপনার যথাসর্বস্ব, মায় দলটি পর্যন্ত গোপালকে দিয়া সমাধিলাভ করিয়াছে। গোপাল এখন দল চালায়, বাবাজীর ডাহিনের দোহার কেষ্টদাস

তাহাকে চালাইয়া লয়। বাবাজী তাহাকে বলিয়াছিল—কেষ্টদাস, গোপালকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, তুমি ওকে দেখ। সে কথা সে রাখিয়াছে।

এমনি সময়ে একদিন ললিতার সন্ধান মিলিল,—মিলিল নয়, সন্ধান আসিল ; ললিতার মা নিজে সন্ধান করিয়াছেন। মৃত্যুশয্যায় শুইয়া চিত্তকালী গোপালকে স্মরণ করিয়াছে। লিখিয়াছে—

'বড় মনস্তাপে ঘর-সংসার সব হারাইয়া কলিকাতায় এক বড়-লোকের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করিয়া এতদিন গিয়াছে। আজ আমি রোগশয্যায় পড়িয়া, বোধহয় দিন আর নাই ; তোমাকে লিখিতেছি, এখন তুমি ললিতার ভার গ্রহণ কর। যদি তাহাতে তোমার বাপ-মায়ের আপত্তি থাকে তবুও একবার আসিও। ভয় নাই, জোর করিয়া মেয়ে আমি গছাইয়া দিব না, কেবল তোমাকে একবার দেখিবার সাধ, তাই মিটাইব ; তুমি তো আমার ললিতা হইতে ভিন্ন নও।'

পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিল। কেহ বলিল—'একেবারে খাস কোলকাতায়, ও বাবা খাঁটী নাম লিখিয়েছে, তুমি দেখে রেখো।'

কেহ বলিল—না হে না, কোলকাতায় সব গুপ্ত বেবসা করে, বুঝেছ। 'দিনে করে দাসীবিত্তি, রাত্রে—কি যে বলে হে—দিনেতে অশ্বিনী রাত্রিতে রমণী—' বলিয়া আপন রসিকতায় আপনি হাসিয়া সারা হইল।

আর একজন বলিল—'ঠিক বলেছ তুমি, আমি চাকরী করতে গিয়েছিলাম একবার কোলকাতা, দেখেছি সব খোলার ঘরে থাকে—দিনে ঝি আর রেতে—চুলটুল বেঁধে বুঝেছ, পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি যাদের বাড়িতে চাকর ছিলাম বুঝেছ, তাদেরই বাড়িতে একটা ঝি ছিল ঐরকম—বাবা, দিনে যদি একটা হেসে কথা বলেছি তো এই মারে তো ঐ মারে। আর শালা সেই দিনই সন্ধ্যা রাত্রে তার বিবি মুত্তি নজরে পড়ল। বললাম ভাই আমি দুকথা—তা ঠোঁট উল্টে বললে কি জান, বললে—যাঃ, যাঃ, বকিসনে। দিলাম ভাই এক চাঁদির জুতো মেরে মুখে, আর অমনি হাসি রস দেখে কে।'

অমনি আর একজন তার রসের কাহিনী বলে, তারপর আর একজন—যার সত্য কিছু না আছে সে বানাইয়াও বলে। যাই হোক, ললিতার মা কয়দিনে আলোচ্য বস্তু হইয়া পড়িল।

গোপাল কিন্তু কাহারও কথা শুনিল না—পাঁচজনের কথায় তার কিছু যায় আসে না, সে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

ভবানীপুরে প্রাসাদতুল্য বাড়ি, সম্মুখে খানিকটা বাগান; সামনে রেলিং দিয়া ঘেরা ফটক—গোপালের বাড়িতে ঢুকিতে সাহস হইল না। রাস্তায় দাঁড়াইয়া সাতপাঁচ ভাবিল; বাড়ির একটা কেহ বাহিরেও আসে না যে সন্ধান জিজ্ঞাসা করে।

বাগানের মধ্যে সহসা একটি ছোক রাকে দেখা যায়, বেশ বাগানে চুল, পরনে মিহি ধুতি, গায়ে জালি গেঞ্জি। ছোকরা ছুটিয়া আসে, তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসে একটি মেয়ে, কপাল ঢাকিয়া বিন্যাস-করা এক পিঠ চুল, অর্ধেকটা তার আবৃত, উজ্জ্বল মাজা রং, নিটোল স্বাস্থ্য-ভরা দেহ, উজ্জ্বল চঞ্চল চোখ; মোট কথা, মেয়েটির রূপ আছে, ত্বরিতগমনে সে নিটোল দীঘল দেহ হেলিয়া দুলিয়া উঠে। যেন একটা হিল্লোল বয়, রূপ যেন জ্বল জ্বল করিয়া উঠে।

পাড়াগাঁয়ে সে ভাব দেখিলে বলে—'যেন ধর ধর ভাব—' গোপাল মুগ্ধ হইয়া দেখিতে চাহিল, কিন্তু লজ্জায় পারিল না। ছোকরাটি বাহিরে আসিল, মেয়েটি ভিতর হইতে বলিল—'ভাল হবে না বলছি, ভাল হবে না।'

ছোকরাটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

মেয়েটি বলিল—'মাইরি বলছি, এই শেষ তা হলে।'

ছোকরাটি এবার কাছে গিয়া বলিল—'কি বলছিস বল—'

—'কমলা চারটে, নাসপাতি, আঙ্গুর, আর সেই এক শিশি, লক্ষ্মীটি এনো—বেশ!'

—'সেই কি?'

—'স্নো।'

—'টাকা?'

—'তুমি দিও, না হয় আমাকে দিলে।' বলিয়া হাসিয়া মেয়েটি আঁচল হইতে খুলিয়া দুটি টাকা দেয়; ছোকরাটি বলিল—'এত সব কি হবে? তোর বর আসবে বুঝি?'

ছেলেমানুষের মত মেয়েটি আবদার করিয়া বলিল—'এই দেখ, এইবার ঢেলা ছুঁড়ে মারবো বলছি।'

—'আসবে ত একটা চাষা মানুষ--তার জন্যে আবার—'

মেয়েটি তাহাকে কিল উঠাইয়া সহসা বলিল—'ওমা এ কে গো, এ মুখপোড়ার দেখো দেখি'—বলিয়া গোপালকে দেখিয়া সে সরিয়া যায়, যাইতে যাইতে বলিয়া যায়---'কপালে তেলক কাটার ছটায় ছিরি হয়েছে দেখ—আ মরি মরি!'

ছোকরা আপনার পথ ধরে, গোপাল বলিল—'মশায় এইটি কি ৬৪ নং বাড়ি?'

—'হ্যাঁ, কেন?'

—'এ বাড়িতে তারাচী গাঁয়ের চিত্তকালী বলে একটি মেয়ে থাকে—ঝি?'

—'থাকে, তার ত অসুখ—।'

—'হ্যাঁ, সেই খপর পেয়েই আমি তাকে দেখতে এসেছি—'

ছোকরাটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—'তোমার কোথা বাড়ি?'

—'আমার বাড়িও ঐ তারাচী গ্রামেই—'

—'ও!' বলিয়া ছোকরাটি পিছন ফিরিয়া চলিয়া যায়, যাইতে যাইতে বলিয়া যায়—'ভেতরে যাও, দেখা হবে।'

ছোকরা যেন হাসে, গোপালের গা-টা জ্বলিয়া যায়।

সন্ধান করিয়া শাশুড়ীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দেখিল চিত্তর রোগশীর্ণ দেহখানা শয্যার সহিত যেন মিলাইয়া গিয়াছে; আর মাথার শিয়রে বসিয়া সেই মেয়েটি। সে তাহাকে দেখিয়া মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া দিয়া উঠিয়া গেল। এই ললিতা—?

গোপালের মনে পড়িল ক্ষণপূর্বের ছবিটা, তাহার বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তন্দ্রাচ্ছন্ন চিত্ত কিছু জানিতেও পারিল না। বাহিরে বারান্দার ওপাশে গিয়াছে, এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল—'শোন!'

গোপাল ফিরিয়া দেখিল সেই মেয়েটি, এবার সে সাহস করিয়া তাহাকে দেখিল। তাহার চোখ আর ফেরে না। তাহার মনে পড়িল গাঁয়ের মেয়েরা বলিত—'না, ললিতে আমাদের বেশ মেয়ে, খাসা ডগডগে মেয়ে হবে।'

কিন্তু এত বেশ ! এত ডগডগে ! এত সুন্দর !

মনের দাহ তাহার এ মোহ ভাঙিয়া দিল, সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'তুমি—ললিতা ?'

—'হ্যাঁ, তা চলে যাচ্ছ যে কাপড় চোপড় নিয়ে ?' সে যেন কৈফিয়ত চায়; গোপালের এ সুরটি বেশ লাগিল কিন্তু সে কথা কহিতে পারিল না। ললিতা আবার মুখটি টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—মুখ-পোড়া বলেছি, তেলকের নিন্দে করেছি বলে রাগ হচ্ছে বুঝি ?' বলিয়া কাপড়ের বোঁচকাটা ধরিয়া টান দিল। কিন্তু গোপাল সেটা শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল—'না থাক।'

ললিতা সেটা ছাড়িয়া দিল, গোপাল আবার যাইতে আরম্ভ করিল—কিন্তু মনের দাহ আর সে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সহসা ফিরিয়া সে তপ্তকণ্ঠে বলিল—'ও ছোকরা কে—?'

ললিতার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে গম্ভীরভাবে বলিল—'এ বাড়ির চাকর, আমার মায়ের ধর্মবেটা।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া গোপাল যেন কতকটা আরাম পাইল, সে বলিল—'তোমার ভাই ?'

'—হ্যাঁ, আমার ধর্মভাই। আমরা এখানে এতটুকু থেকে আছি।' লজ্জায় গোপালের মাথাটা নুইয়া পড়িল, মনে তাহার গ্লানির সীমা রহিল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। ললিতাও এমন মেয়ে যে আর ফিরিয়া ডাকে না। কতক্ষণ পর ললিতা বলিল—'চলে যাবে নাকি ? আমাকে নেবে না ?'

গোপাল মুখ তুলিয়া চাহিল, সে মুখ দেখিয়া মুখরা চঞ্চলা ললিতারও একটা মোহ আসিল, সে মৃদুকণ্ঠে বলিল—'এস।'

চিত্তর শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া গিয়া গোপাল ডাকিল—'মা—'। চিত্ত গোপালকে দেখিয়া কাঁদিল, সে ধীরে ধীরে গোপালের কথা শুনিল, আপনার অদৃষ্টের কথা বলিল—'তা বলে ভেবো না বাবা, আমি ব্যাই ব্যানকে অভিসম্পাত করেছি, কি দোষ দিইছি। আমার অদৃষ্টের দোষ। মনে বড় ধিক্কার হয়েছিল। অন্ধকার রাত্রে ভাই-এর বাড়ি গেলাম, ভাজ অকথা কুকথা বলে খেতে দিলে, চোখের জলে মুখের গ্রাস নষ্ট হয়ে গেল, সেই রেতে উঠে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে এই

বাবুদের আশ্রয়ে এসে দাসীবিত্তি করেও সুখে দিন কটা পার করেছি, এখন বাবা তোমার গচ্ছিত ধন তুমি নাও—আমায় খালাস দাও।'

ওদিকে মাথার শিয়র হইতে গচ্ছিত ধন উঠিয়া পলায়ন করিল। গোপাল মুগ্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া দেখিল। ত্বরিতগমনে দেহখানি স্বভাবসুন্দর ললিত ভঙ্গীতে হেলিয়া দুলিয়া উঠিল, দেহ হিল্লোলের সিঙ্গে সঙ্গে অঞ্চলাবৃত চুলের রাশি ফুলিয়া উঠিতেছে, চকিত দৃষ্টি নক্ষেপের মধ্যে তাহার রাঙা মুখখানি গোপালকে স্তব্ধ করিয়া দিল।

এদিকে গোপালের নীরবতায় বিধবা উদ্‌গ্রীব হইয়া গোপালের দিকে চাহিল। চিত্ত আবার বলিল—'আমায় নিশ্চিত কর বাবা। তুমি বুঝি দেখনি হতভাগীর রূপ, কই গেল কোথা মুখপুড়ী, ললিতে।' ললিতা ও-ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া গোপালকে ইশারায় কি বলিল, গোপাল সেদিকে চাহিয়া শাশুড়ীর কথার উত্তর দিতে ভুলিয়া গেল।

শাশুড়ী আবার বলিল,—'তুমি কি আবার বিয়ে—'

সে কথা চিত্ত শেষ করিতে পারিল না। গোপাল এবার বলিল —'না।'

চিত্ত অতি আনন্দে বলিল—'জানি বাবা, ললিতেকে তুমি ভুলতে পারবে না। পোড়ারমুখীই কি তোমাকে ভুলেছে একদিন? এখন ত বড় হয়েছে, তোমার কথা বলতে লজ্জা করে। প্রথম প্রথম বসে বসে কাঁদত, জিজ্ঞাসা করতাম—কিরে, গোপালের জন্যে তোর মন কেমন করচে? ও বলত—হুঁ! তাও এ বাড়ির চাকরের ছেলে, সে ওর সমবয়েসী, আমার ধর্মবেটা হয়। তাকে পেয়ে তবু মন তার মানে।'

গোপালের মুখ আবার গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে বলিল—'তবে উঠি এখন, মুখ হাত ধুই।'

চিত্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল—'মরণ হোক আমার, রোগে পড়ে আমার ভীমরতি ধরেচে। এখনও বাবার আমার হাত মুখ ধোয়া হয়নি, জল খাওয়া হয়নি। আর সেই হতভাগা মেয়ে, কালকণ্টক আমার, কোন আক্কেল যদি থাকে এত বড় ধাড়ী মেয়ের। ললিতে, ললিতে!'

ললিতাকে আর দেখা গেল না।

গোপাল বলিল—'থাক, বাইরেই যাই, মুখ হাত ধুয়ে আসি।' বলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতর হইতে শোনা গেল মেয়ে

ঝঙ্কার দিতেছে—'বলি, কালকণ্টক করবে কি? ঘরে কিছু ছিল না, ভোলা দাদা বাজার থেকে আনলে তবে ত।'

মা বলে—'আগে থেকে আনিয়ে রাখতে নাই?'

—'তুমি ত এখনও মর নাই, আনিয়ে রাখলেও পারতে।'

তারপর সব কিছুক্ষণ নীরব। মেয়ে আবার বলিল—জানিস মা, তোর-জামাইএর যা রাগ—ফিরে যাচ্ছিল।'

মা ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল—'কেন রে?'

—'আমি ভোলা দাদাকে বললাম ফল আনতে, তা টাকা না নিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল; আমি পেছনে ছুটে গিয়ে ফটকের ধারে টাকা দিলাম, তা দেখি চিতে বাঘের মত ফোঁটা কেটে, ভ্যাবা গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে। আমি চিনতে পারিনি, বললাম, কে রে মুখপোড়া, মুখের ছিরি দেখ'—বলিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল। মা গম্ভীরস্বরে বলিল—'ভোলার সঙ্গে হাসি-তামাসা হচ্ছিল বুঝি।'

মেয়ের এবার উত্তর শোনা গেল না।

মা আবার বলিল—'কতবার বলবো তোকে, পনের বছরের বুড়ো মেয়ে, ঘর করলে দুটো ছেলে হতো, আক্কেল তোর কবে হবে? গোপাল দেখেছে তো? তাই সে ভাল করে কথার জবাব দিলে না। মর—মর, এখনই মর।'

দৃষ্টি আছে, তাই জগতে রূপের সৃষ্টি সার্থক। গোপালের দৃষ্টি ছিল, ললিতার রূপ ব্যর্থ হইল না—সৌন্দর্যের মোহ সন্দেহকে স্থান দিল না। চিত্তর মৃত্যুর অন্তে ললিতাকে ঘরে আনিয়া সে সংসার পাতিল।

সে সংসার পাতা যেমন তেমন নয়, লক্ষ্মীর সিংহাসন উজাড় করিয়া গোপাল ললিতাকে বসাইল; সুরের উপচারে, সুন্দরের উপাসক তরুণ কীর্তনীয়া সুন্দরীর উপাসনায় তাহার সুখের বিধানে—সঞ্চয়ের থলি উজাড় করিয়া দিল।

চঞ্চলা মুখরা ললিতা বাড়িতে পা দিয়াই বলিল—'মা গো—একি উঠোন মেঝে, এ যে সব মাটি। তাইতেই তোমাদের কাপড় এত ময়লা হয়। না বাপু, রোজ সকালে উঠে যে ঘর নিকানো—'

গোপাল ব্যস্ত হইয়া বলিল—'মেঝে উঠোন অনেকদিন থেকেই

বাঁধাবো বাঁধাবো মনে করছিলাম তা এইবার—'

'হ্যাঁ, তাই বাঁধাও, নইলে রোজ সকালে উঠে যে সেই গোবর জলে মাটিতে মাখা—মাগো, আমার গা ঘিনঘিন করছে—ও হরি, এ যে চারিদিকে গাছের বেড়া। পাঁচিল কই?'

ললিতার মার পত্র আসিতেই গ্রামের পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিয়াছিল, গোপালের তাহাতে কিছু আসে যায় নাই! কিন্তু ললিতাকে সঙ্গে করিয়া ফিরিবার সময় সে বুঝিয়াছিল, পাঁচজনে এইবার দশ কথা কহিবে, আর সে বাণগুলো বিঁধিবে গিয়া ললিতাকেই। তাই ললিতাকে বাঁচাইতে সে গ্রাম ছাড়িয়া বৈরাগীর ঘরে আসিয়া সংসারী হইতে চলিয়াছিল। বাবাজীর অন্দরের প্রয়োজন ছিল না তাই বাহিরের সহিত অন্দর করিয়া চারিদিকে প্রাচীরের ঘেরা উঠে নাই।

গোপাল ললিতার কথার জবাব দিল—'এটা তো বাড়ি নয়, এটা আখড়া।'

ললিতা একটু বাঁকা ভাবে কহে—'কেনে, তুমি কি বৈরাগী নাকি যে লক্ষ্মীছাড়ার মত—'

গোপাল এবার হাসিয়া জবাব দিল—'লক্ষ্মীছাড়া ঠিক নয়, তবে লক্ষ্মীহারা হয়ে বাবাজীর ঘরে এসে সংসার পেতেছিলাম। আখড়ায় আজ যখন লক্ষ্মী ফিরে এসেছে, তখন আবার সব হবে?

হইলও তাই। গাছ কাটিয়া চারিদিকে উঁচু পাকা প্রাচীর উঠিল, আঙিনা হইতে ঘরের মেঝে পর্যন্ত পাকা শুধু নয়, সিমেন্ট দিয়া মাজা হইল, রাঙা মাটি দিয়া পরিপাটি করিয়া নিকানো দেওয়ালগুলি কলি চূণে শুভ্র হইয়া উঠিল, বৈরাগীর ছায়ানিবিড় গেরুয়া রঙের শান্ত কুঞ্জটি হইয়া উঠে অমল ধবল শ্রীমন্দির।

ললিতার ঝঙ্কার মোটেই ললিত নয়, নীরস ঝঙ্কারে সে প্রথম রাত্রিতেই বলিল—'মাগো, এ কি বিছানা গো, এ যে কাপড়ের কাঁথা, এতে কি মানুষ শুতে পারে? ছি ছি ছি, এ যে চিমটি কাটলে ময়লা উঠে আসছে। এতে শুতে পারবো না বাপু আমি, তুমি শোও, আমি আঁচল পেতে শোব।'

গোপাল তাড়াতাড়ি বকের পাখার মত ধোয়া, তাহার কীর্তনের

আসরের ব্যবহার-করা একখানা কাপড় বিছাইয়া দিয়া বলিল—'আজ এতে শোও, কাল বাজারে গিয়ে কিনে আনবো সব।'

ললিতা অসন্তুষ্ট চিত্তেই আসিয়া বিছানায় বসিয়া বালিশে হাত দিয়া সেটাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া কহিল—'এ যে শক্ত ইট, এতে মাথা দিলে মাথা ধরবে যে—'

গোপাল আপন হাতখানা প্রসারিত করিয়া দিয়া কহিল—'আমার হাতে মাথা রেখে শোও—'

ললিতা ব্যস্ত হইয়া বলিল—'যাঃ, দিলে ত খোঁপাটা নষ্ট করে।'

উঠিয়া বসিয়া সে খোঁপা ঠিক করিতে লাগিল।

গোপাল তাহার মুখপানে চাহিয়া পাগল হইয়া যায়; সে ধীরে ধীরে মুখ বাড়ায়, ললিতা হাসিয়া, তাহার মুখটা ঠেলিয়া দিয়া কহে—'দূর, ক্যাঙলার মত, যাঃ।'

গোপাল আরও মাতাল হইয়া উঠে, অতি সন্তর্পণে ললিতাকে বুকের কাছে টানিয়া লয়, কিন্তু অঙ্গস্পর্শ হইতেই ললিতা বলিল—'ছাড় ছাড়, কি ঘামের গন্ধ তোমার গায়ে!' গোপাল ছাড়িয়া দেয়। অভিমানে তাহার বুক ভরিয়া উঠে, ললিতা তাহাতে এতটুকুও বিচলিত হয় না। সে সমান সুরে বলিয়া চলে—'যাই বল বাপু, রেগো না, বড় নোংরা তুমি; এত ঘাম, তার উপর তেল মেখে গা চটচটে করা কেন, সাবান দিয়ে একটু পাউডার বুলোলেই হয়!'

গোপালের চোখে জল আসে।

ললিতা বলিয়াই যায়—'যেমন চুলকাটার ছিরি, কদম ফুলের মত মাথা, তার উপর হাত দেড়েক টিকি; আবার কপালে বুকে মাটির ছাপ, যেন চিতে বাঘ; না বাপু বলবো না, একবার যে রাগ!' বলিয়া সে হাসে। গোপাল ভিন্ন শয্যা করে।

ললিতা বলিল—'রাগ হল বুঝি? তা হল ত হল, আচ্ছা আমিও আর ডাকবো না তোমাকে, বুঝে থেকো; দেখবে!'

পরদিনই শহর হইতে বিছানা আসিল, সুন্দর পুষ্পলতার চারু-ছবিতে রঙীন ছিটের বিছানা, বালিশ, চাদর, ললিতার জন্য রঙীন কাপড়, সাবান, তেল আরও কত কি!

ললিতা পরমানন্দে কহে—'বেশ হয়েছে, এই নইলে বিছানা, কিন্তু

ছিট পছন্দ ভাল হয়নি ; এই যে চুলও কেটেছ দেখছি, কই টিকি দেখি, কত বড় রেখেছ ? নাঃ, আরও খানিকটা ছাঁটলে হত ।—দেব খাঁতি দিয়ে কেটে !'

গোপাল ছুই হাতে টিকি ঢাকিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল—'না, না, থাক, থাক, কেত্তন করতে হয়, বোষ্টম মানুষ ।'

ললিতা খিলখিল করিয়া হাসিতে হাসিতে জিনিসগুলি ঘরে তুলিল , কিছুক্ষণ পরেই সে আবার ঝঙ্কার দিল—তেলের শিশিটা তুলিয়া কহিল—'ওকি তেল এনেছ ? এ যে বাজারের ওঁছা তেল, বাইরের ছবিখানি দেখে ভুলে এসেছ বুঝি ? মাগো, কি পাড়াগেঁয়ে ভূত তুমি—ছি ছি ছি ।'

গোপাল ভাবে এ বুঝি বিরূপ মনের স্বরূপ—তাহার মুখ কাল হইয়া উঠে । পরের দিন সে আবার তেল কিনিয়া আনে । ললিতা হাসে, আপন মনেই হাসে, তাহার চটুল চঞ্চল গতিতে ঘরখানি হাসাইয়া রাখে । দেখিয়া গোপালের বুকটা বেদনায় ভরিয়া উঠে—ললিতাকে যে ও পায় না ।

আজও তাহাদের শয্যা পৃথক, ললিতা আজও ডাকে নাই ; গোপালও নত হয় নাই । মাঝে মাঝে ছুজনে একটু কাছাইয়া আসে । যখন ললিতা বলে—'গান কত আর শুনবো, একটা ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প বল না ।' সে গল্প বলে ।

বাহির হইতে কেষ্টদাস হাঁকে—'গোপাল, গোপাল হে, গোপাল হে ।' গোপাল বলে, 'শুনে আসি—'

ললিতা বলে—'না যেতে পাবে না, গল্পটি শেষ কর ।'

গোপাল যথাসাধ্য কাতরভাব করিয়া উত্তর দেয়—'শরীরটা আজ ভাল নেই দাদা ।' ততক্ষণে ললিতা তাগিদ দেয়—'তারপর ?'

গোপাল কাহিনী শেষ করিয়া বলিল—'মজুরী দাও আমার ।'

ললিতা মুখখানি আগাইয়া দেয়, তাহার মদিরস্পর্শে গোপাল পাগল হইয়া উঠে । কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে সাহস হয় না ।

এতক্ষণে গোপাল যায় কেষ্টদাসের সহিত দেখা করিতে, তাহার বাড়ি ; গুনগুন করিয়া গান করিতে করিতে ঢোকে—'সুধা ছানিয়া কিবা অধর রচিল গো—চাঁদ নিঙাড়ি মুখ চাঁদ ।'

গোপাল কোন রকমে কথা সারিয়া বাড়ি ফেরে। আহারের আসনে বসিয়া গোপাল,—ললিতা যখন নত হইয়া আহারের থালা নামাইয়া দেয়, তখন গোপনে আপনার মুখখানি ললিতার মুখের কাছে আগাইয়া লইয়া যায়,—কিন্তু চকিতে চপলা ললিতা তাহার তরকারি-মাখা হাতটা গোপালের মুখে লেপিয়া দিয়া কহে—'চোর।'

কিন্তু সে কয়টা দিন মাত্র। যেখানে দাতা বদ্ধহস্ত—সেখানে দস্যুতায় বরং মেলে কিন্তু ভিক্ষা নিষ্ফল, প্রত্যাখ্যানের বেদনাই সেখানে সার হয়। কিন্তু দস্যুতা গোপালের সাধ্যাতীত। দেখিতে দেখিতে সুখের ঘরে দুঃখ আসিয়া বাসা বাঁধিল ; অসন্তোষে দুইজনেই পরস্পরে কাছ হইতে সরিয়া গেল। আরও এক স্থানে দুজনের গভীর গরমিল ছিল। গোপাল ছিল দেবদ্বিজে ভক্তিমান, আর ললিতা ছিল বিলাসিনী, সে বলিত—'চোখ বুজে ঢং দেখ। বলি এত যে কর—কিছু পেলে ?'

—'একদিনেই কি পাওয়া যায় ? তবে শান্তি কিছু আসে, তুমি করে দেখ না।'

—'হ্যাঁ ; বাবুদের সঙ্গে কাশী গিয়ে বিশ্বনাথই দেখিনি, তা আবার চোখ মুদে পূজা করবো। আমাদের খোকাবাবু কি বলতো জান—ঈশ্বর ফিশ্বর ওসব মিছে কথা। কত সব বুঝিয়ে বলতো—সে ত মনে নেই, তবে মনে বেশ বুঝে নিয়েছি।'

গোপাল বিরক্ত হইয়া বলিল,—'থাক। তুমি যা বুঝেছ তোমার থাক, আমি যা বুঝেছি আমার থাক।'

ললিতা হাসিয়া বলিল—'সে আমারও পক্ষে ভাল। তোমার চোখে জল ফেলা অভ্যেস না থাকলে কেত্তন জমবে না ; দক্ষিণেও বাড়বে না, প্যালাও দেবে না।'

গোপাল উঠিয়া গেল।

ললিতা বলিল—'রাগ হল বুঝি ? তা সত্যি বলবো—রাগ তো রাগ, আমার কিছু বয়ে যাবে না !'

কোন দিন গোপাল আসিয়া কাছে বসে, ললিতা বলে—'কি মনে করে ?' গোপাল কথা কয় না। স্ত্রীর কথার সুরে মনের বিষ ফেনাইয়া উঠে।

ললিতা বলিল—'দিনরাত ভালও তো লাগে তোমার, মেয়ে-

মানুষদের কাছে ঘুরঘুর করতে ?'

গোপাল তিরস্কার করে—'ভাল লাগে না দিনরাত তোমার ও ধর ধর ভাব।' ললিতা চুপ করে।

সেদিন আপন অঙ্গের পানে তাকাইয়া ললিতা কহে—'মাগো নিজেরই ঘেন্না করছে, রং হয়েছে দেখ দেখি, যেন পোড়াকাঠ।'

গোপাল পরদিনই খুব দামী সাবান কিনিয়া আনিল ; ললিতা বলিল—'আবার সাবান কেন, সাবান দিয়ে কি হবে ?'

—'এতে রং ফরসা হয়। তোমার রং ময়লা হয়েচে সত্যি—তাই।' ললিতা পিচ কাটিয়া বলিল—'তোমার দেশের পোড়া মাটিকে মাখাও গিয়ে। এদেশে চুন মেখে থাকলেও দুদিন পরে পোড়াকাঠ হবে।'

গোপাল দূরে সাবানটা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ললিতা সেটা ফেলিয়া দিল নর্দমায়।

এমনি করিয়া দুটি নরনারীর বিপরীত গতিতে জীবন-মন্থনে বিষ ফেনাইয়া উঠে ; সে বিষ চরমে উঠিল, যেদিন গোপাল দেখিল তাহার উপাসনা ঘরের ঠাকুরের আসন, ছোট চৌকিখানির উপর প্রসাধনের সামগ্রী রাখিয়া ললিতা প্রসাধনে বসিয়াছে। গোপাল কঠোর দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চাহিল।

ললিতা বলিল—'লাল চোখ দেখাচ্ছ যে, মারবে নাকি ?'

'তোমার কি সত্যসত্যই ভগবানকে ভয় নাই ?'

চুলের গোড়ায় দড়ি দিতে দিতে ললিতা বলিল—'না—'

গোপালের মুখে আর কথা ফুটিল না, একটা দুর্জয় ক্ষোভের মধ্যে বুকটা গর্জন করিয়া উঠিল। ললিতা একদিকের দড়িটা চিবুকে ও বুকের চাপে ধরিয়া আবার বলিল—'ভোলা দাদা ঠিক বলে, ওসব ভণ্ডামি। খাবে দাবে খেলবে, দিন কেটে যাবে, তা আবার ভগবানকে কি দরকার ?'

ওই ভোলা দাদার নামেই গোপালের রুদ্ধ আক্রোশ ফাটিয়া পড়ে ; সে বিষ উদগার করিয়া কহে—'ঠিক ত, ভগবান মানলে দাদা বলে তার সঙ্গে ভালবাসা কি করে হয় ?'

ললিতার চিবুকের চাপে চাপিয়া রাখা দড়ি খসিয়া পড়িল, সবে

আরম্ভ-করা বেণীর ছাঁদ খুলিয়া গেল, সে মুখ তুলিয়া বলিল—'কি বললে ?'

—'যা সত্যি তাই বলেছি।'

—তাই যদি তোমার মনে হয়েছিল, তবে আমায় নিয়েছিলে কেন ?

—'নিয়েছিলাম তোমার মায়ের সাধাসাধিতে, আর তোমার ওই বিবিয়ানার চটকে ভুলেছিলাম।'

—'খবরদার বলছি, আমাকে যা বলছ বল, আমার মাকে কিছু বলো না। অতি ছোটলোক তুমি।'—বলিয়া সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

অশ্রুমুখী ললিতা আবার দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—'আমায় পাঠিয়ে দাও তুমি।'

গোপাল ব্যঙ্গভরে বলিল—'কোথায়, কোন্ চুলোয় ?'

—'কেন, লোক নাই নাকি আমার ?'

—'সেই ভোলা দাদা ত ? ধর্মভাই ?'

ললিতা আবার কাঁদিয়া ঘরে ঢুকিল।

গোপাল ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল, অশান্ত মন লইয়া সে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। গ্রামের প্রান্তে নদীর ধারে গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, শান্তস্বভাব লোকটির ধীরে ধীরে রাগ পড়িয়া আসিল, সে আপন মনে ছি ছি করিয়া মরিল, মনের গ্লানির সীমা রহিল না। মনে পড়িতে লাগিল ললিতার বিষণ্ণ মুখ, অশ্রুভরা দুটি চোখ, বিলাসিনীর বিলাসে উপেক্ষা!

লজ্জায় সে আর বাড়ি ফিরিতে পারিল না, সে ওই পথে পথে আপনার গ্রামে চলিয়া গেল। পথে একটা লোককে বলিয়া গেল—আমাদের বাড়ি বলে দিয়ো ত, আমি তারাচী যাচ্ছি, দিন চার পরে ফিরবো। স্থানান্তরে গিয়াও সে শান্তি পাইল না, কত উদ্ভট চিন্তা আসিয়া জুটিল—ললিতা যদি গলায় দড়ি দেয়, যদি জলে ডুবিয়া মরে!

কোন রকমে রাতটা কাটাইয়া গোপাল বাড়ি ফিরিয়া দেখিল ললিতা জলে ডোবে নাই, গলায় দড়িও দেয় নাই, তবে চলিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে মোটা মোটা করিয়া লেখা—'চল্লাম, ভোলার কাছেই যাব।' গোপাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বসিয়া

ভাবিল অর্থহীন ভাবনা। আজ মনে মনে সে দোষ খতাইয়া দেখিল, আজ সব দোষ নিজের দিকেই চাপিল।

সে কলিকাতায় যাইবে স্থির করিল। বাক্স খুলিয়া দেখিল ললিতা শুধু চলিয়া যায় নাই—তাহার নিজের অলঙ্কার, গোপালের সঞ্চয় সবই নিঃশেষ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

তবুও সে কলিকাতায় গেল, দেখিল, ভোলা বিবাহ করিয়া সংসারী, বাবুদের বাড়িতেই থাকে, ললিতা সেখানে নাই। লোকে বলিল—তবে সে বাজারে দোকান খুলে বসেছে খাঁটি। গোপাল ফিরিয়া তাহার বড় সাধের পাতানো ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল—স্বর্ণের জন্য নয়, রৌপ্যের জন্য নয়, রূপের পসরা ললিতার জন্য!

কেষ্টদাস বলিল—'ভায়া মন শক্ত কর!'

গোপাল ম্লান হাসিয়া বলিল—'ও বিধাতার ঘা দাদা, সইতেই হবে, সয়েছি যখন তখন শক্ত হতেই বা বাকী কি?'

—'হ্যাঁ, মন খারাপ করো না, আর কার জন্যে মন খারাপ করবে কুলটা নারী।'

গোপাল বাধা দিয়া বলে—'থাক দাদা, কু-কথা বলো না, তার দোষ নেই!'

—'দোষ নেই?'

'না; রাধারাণীর জাত ওরা অভিমানেই সারা, অভিমান বশে কি যে করে বসে ওরা—সে ভগবানও বুঝি বুঝতে পারেন না।'

—'আচ্ছা, না হয় মানলাম মানময়ীর মানই হয়েছিল, তা গলায় দড়ি দিলে না কেন—'

—'এ মরার বাড়া দাদা, এ তোমার জ্যান্তে পোড়া।'

—'যাক, মরুগ গে ওকথা, এখন আমার কথা শোন। আবার সংসার পাত, ভাল বংশের সুন্দরী দেখে—'

—'না দাদা আর না, সুন্দরীর উপাসনা আর আমার সহ্য হবে না, আমার সুন্দরই ভাল; শ্যামই ভাল, আর কটাই বা দিন!'

—'দিন এখনও অনেক, এইত মোটে উনিশ বিশ বয়েস, তা একটা মেয়ের রূপে ভুলে—।'

—'রূপ তো তুচ্ছ নয় দাদা, রূপের জন্যেই তোমার মহাদেবের কপালে চাঁদের ফালি।'

—'ওসব শাস্তর ফাস্তর রাখ বাপু, বলি স্ত্রী মলে কি কেউ বিয়ে করে না?'

গোপালের মুখে সেই হাসি, সে বলে—'করে, আবার কেউ করে না।'

কেষ্টদাস বলে—'আচ্ছা, আমিও মরবো না, দেখব, আর দুদিন যাক।

দুদিন গেল, দশ দিন গেল, মাস বৎসর চলিয়া গেল, গোপাল কিন্তু গোপালই রহিয়া গেল, নারীর সহিত আর সে সম্বন্ধ পাতাইল না। সুরের উপচারে সুন্দরের উপাসনায় সে মজিয়া গেল।

ভক্ত বলিয়া দশে পূজা করিল, সুরসাধনায় খ্যাতি রটিল। বিরহের গানে নাকি তাহার অসাধারণ ক্ষমতা, চক্ষু কাহারও শুষ্ক থাকে না, সে যখন গায় 'শ্যাম শুক পাখী, সুন্দর নিরখি, ধরিনু নয়ন, ফাঁদে': লোকে বলে—'ও পেয়েছে, নিশ্চয় পেয়েছে।'

তিন বৎসর পর নবদ্বীপের নিমন্ত্রণে সকল কীর্তনীয়া আসিয়াছে, গানের নৈবেদ্যে নবদ্বীপচন্দ্রের পূজা দিতে। বৈষ্ণবমণ্ডলী আসর ও বিষয় বিভাগ করিয়া দিবেন।

কয়জন কীর্তনীয়া এবার ধরিল—গোপাল দাসের বিরহটিই শুধু জানা আছে, সাধা আছে, বিরহ গেয়ে ফি ফি বছরই ওই মালা পাচ্ছে, এবার ওকে মিলন গাইতে বলা হোক।

বৈষ্ণবসম্প্রদায় সেকথা বলিতে গোপাল কহিল—'কথা সত্য, বিরহ গানে আমার প্রাণ সাড়া দেয়, আর ওই গানই আমি আলোচনা করেছি বেশী। আর দেবতাকে মানুষ তার প্রিয়-দ্রব্যই দিয়ে থাকে, সুতরাং আমাকে অন্য অনুমতি দেবেন না। না হয় মালার বিচারে আমায় বাদ দেবেন।'

সেকথায় কেহ কান দিল না, বলিল—'না, এবার তোমার মুখে মিলন গান শোনা নবদ্বীপচন্দ্রের অভিপ্রায়।' আর কোন কথা বলা চলে না।

কেষ্টদাস কহিল—'ভাল করলে না ভায়া।'

গোপাল কহিল—'গোবিন্দ ভরসা দাদা।'

গোপাল বাসায় বসিয়া আড্ডাই দেয়, মিলনের গান কেমন ফিকা হইয়া যায়।

গোপাল বলিল—'এ যে আসচে না দাদা, তুমি গাও, আমি বরং দোহারি করি।' কেষ্টদাস হাত জোড় করে—'বড় ভাই হয়ে হাত জোড় করছি ভাই।' দলের লোক কহে—'গাইব না আমরা।'

ওদিকে গৌরাঙ্গ মন্দিরে বিরাট আসর পড়িয়াছে—দলের পর দল পর্যায়ের পর পর্যায়ে ব্রজলীলা গাহিয়া চলিয়াছে। নিপুণ গায়কের সুরে, প্রাণের আবেগে সে লীলা যেন চোখের উপর ভাসিয়া চলিয়াছে।

সন্ধ্যার মুখে বিরহের গান চলিতেছিল, শতবর্ষব্যাপী বিরহ; নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,—সমস্ত ব্রজে কি যেন একটা কালিমা মাখা, শুক-সারী আর ডাকে না, রাধাশ্যাম লইয়া তাহারা আর দ্বন্দ্ব করে না, কাঁদে। কোকিল-কোকিলা মূক, ময়ুর-ময়ুরী ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা দেখিয়া আর নাচে না, শ্যাম লাবণ্য মনে করিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়, ধেনুপাল বেণু-রবের অপেক্ষায় মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, মূক পশুর চক্ষে অজস্র ধারা। তরুলতায় আর ফুল ফোটে না, কদম্বতরু পত্রহীন, যমুনার কলকল্লোলে ক্রন্দনের সুর, অভিমানিনী রাধার আজ আর অভিমান নাই। শীর্ণ তনু, প্রাণ আর থাকে না। তবু চিন্তা—'কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাবো।' শ্যামকে যে তার মত ভালবাসিতে আর কেহ নাই।

সখীবৃন্দের প্রতি মর্মান্তিক অনুরোধ—প্রিয়তমের জন্য তাঁহার দেহখানি যেন রাখা হয়, আর রাখা হয় যেন কৃষ্ণবরণ তমালের ডালে।

গায়ক গায়,—

'না পোড়ায়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরই ডালে॥'

মানুষের বুক হাহাকার করে, আসরে অশ্রুবন্যা বহিয়া যায়, লোকে বলে—এর উপর গাইতে গোপাল দাসকে আর হয় না।

—হ্যাঁ, এবার মালা গোপাল দাসের ভাগ্যে নাই।

কেহ কেহ বলে, বিরহ গানই এমনি, যে গাইবে, সেই শ্রেষ্ঠ হবে, মাঝখান থেকে গোপাল দাসের নাম হয়ে গিয়েছে।

গোপাল বাসায় বসিয়া মনে মনে গোবিন্দের শরণ ভিক্ষা করিল,

কিন্তু চিত্ত কিছুতেই স্থির হইল না, মনে বল পাইল না।

দীর্ঘ বিরহের পর বিরহী দুটি প্রাণীর মিলন সে যে কল্পনাও করিতে পারে না। বিগ্রহ-মূর্তি মনে আনিল। পাষাণ মূক বিগ্রহ অচল অবিচলই থাকিয়া যায়। সে মূর্তি সজীব করিতে গেলে সম্মুখে দাঁড়ায় চঞ্চলা অভিমানদৃপ্তা রোদন-রক্ত-আঁখি, স্ফুরিত-অধরা ললিতা। ললিতা।

বিভ্রান্তচিত্তে, সন্ধ্যার মুখে সে গঙ্গাতীর দিয়া চলিল; কেষ্টদাস কহিল—'খবর দিয়েছে সন্ধ্যার পরই এদের আসর ভাঙবে। তুমি যাবে কোথা?'

—আসি দাদা গঙ্গার ধার থেকে, ততক্ষণে তোমরা গিয়ে আসর পাতবে।

পথে একটা মঠে নারীদের সংকীর্তন হইতেছে, অনাথা পতিতাদের আশ্রম, সংকীর্তনে গাহিতেছিল মূল গায়িকা—

'বড় দুঃখ দিয়েছি হে ধরায়েছি পায়—
ক্ষমা কর পায়ে রাখ দুখিনী রাধায়।'

গোপাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল, এই সুর, এই গান চাই। সে ধীরে ধীরে মঠের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিগ্রহের সম্মুখে কীর্তন হয়, নারীদের হাতে সব একগাছি মালা, আরতির পরে বিগ্রহের চরণে উপহার দিবে। গোপাল দাস বিগ্রহ প্রণাম করিতে গিয়া স্থাণুর মত অচল হইয়া গেল যেন; কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। বিগ্রহকে সে প্রণাম করিল না, দেবমূর্তির পানে পিছন ফিরিয়া সে গিয়া গায়িকার হাত ধরিয়া বলিল—'ললিতা!'

আরতির দীপ তখন জ্বলিয়াছে।

গান বন্ধ হইয়া গেল—নির্বাক ললিতা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। গোপাল বলিল—'ফিরে এস।'

গোপালের কথার উত্তরে ললিতা কি কহিতে গেল, কিন্তু শুধু ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া গেল, কথা ফুটিল না। গোপাল আবার কহিল—'আমি যে তোমার জন্যে শূন্য ঘর নিয়ে বসে আছি।'

পিছন হইতে একটা সজোর আকর্ষণে দারোয়ানটা গোপালকে টানিয়া লইয়া লাঠি উঠাইল; ললিতা ত্বরিতগতিতে গিয়া গোপালকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—'আমার স্বামী।'

ললিতা নিজ হাতে বিগ্রহের জন্য গাঁথা মালা গোপালের গলায় পরাইয়া দিল, চন্দন দিয়া ললাট চর্চিত করিয়া দিয়া কহিল--'আজ সত্যিই সার্থক মালা গেঁথেছিলাম।'

গোপাল বলিল—'আচ্ছা, আমিও মালা আনছি।'

ললিতা গোপালকে সাজাইতে সাজাইতে বলিল—'যা লিখে এসে-ছিলাম তা মনে কত্তেও ঘেন্না হয় নিজের উপর। ভগবান অনাথার আশ্রয়। তিনি নিয়ে গেলেন হাত ধরে মাসীর বাড়ী। মাসী এল এখানে, এসে মল। আমি মঠে এসে ঠাকুরের পায়েই পড়লাম।'

গোপাল বলিল—'তবু আমায়—'

ললিতা বাধা দিয়া বলিল—'বটে, সেধে যাবো আমি, তার চেয়ে মরণ ভাল আমার।'

গোপাল ললিতাকে বুকে টানিয়া লইতে গেল কিন্তু বাহির হইতে দলের একজন ডাকিল--'মূল গায়েন-- '

ললিতা লজ্জায় আপনাকে ছাড়াইতে চাহিয়া বলিল—'ছাড় ছাড়, এসে পড়বে।'

আজ দস্যুর মত লুণ্ঠন করিয়া লইল গোপাল।

কীর্তন গাহিয়া ফিরিয়া গোপাল হাসিমুখে গৌরগলার প্রসাদী মালা ললিতার গলায় পরাইয়া দিল। ললিতা সে মালা মাথায় তুলিয়া গোপালকে প্রণাম করিয়া বলিল—'ছি, দেবতার প্রসাদী মালা, মাথায় দাও।' গোপাল তাহার কথায় উত্তর দিল না, সযত্নে তাহাকে তুলিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া গুনগুন করিয়া গান ধরিল—

'বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে—
দেখা না হইত পরাণ গেলে।'

ললিতা তাহার বুকে মাথা রাখিয়া বলিল—'তা হলে মরবার সময় আর দেবতার নাম করত না।'